University of Rajshahi **Rajshahi-6205** **Bangladesh.**

RUCL Institutional Repository **http://rulrepository.ru.ac.bd**

Department of Urdu PhD Thesis

2021-06

Contribution of Non-Muslims in Urdu Literature

Khatun, Mst. Josna

University of Rajshahi

http://rulrepository.ru.ac.bd/handle/123456789/1045

Copyright to the University of Rajshahi. All rights reserved. Downloaded from RUCL Institutional Repository.

পিএইচ.ডি থিসিস

উর্দু সাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান

মোসাঃ জোসনা খাতুন

উর্দু বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

জুন, ২০২১

উর্দু সাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান

(CONTRIBUTION OF NON-MUSLIMS IN URDU LITERATURE)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোসাঃ জোসনা খাতুন
রোল নংঃ ১৩০২৩
সেশনঃ ২০১৩-২০১৪

উর্দু বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী, বাংলাদেশ

জুন, ২০২১

উর্দু সাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান

(CONTRIBUTION OF NON-MUSLIMS IN URDU LITERATURE)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মোসাঃ জোসনা খাতুন
রোল নং: ১৩০২৩
সেশন: ২০১৩-২০১৪

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ড. মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
প্রফেসর
উর্দু বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী

উর্দু বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী, বাংলাদেশ

প্রত্যয়ন পত্র

আমি এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের শিক্ষার্থী মোসাঃ জোসনা খাতুন কর্তৃক পিএইচ. ডি ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত ***উর্দু সাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম ।

আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষায় এ শিরোনামে পিএইচ. ডি ডিগ্রীর উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি । আমি গবেষণা নিবন্ধের চূড়ান্ত কপিটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছি । অত্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি পিএইচ. ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করার জন্য অনুমতি প্রদান করছি ।

ড. মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম

প্রফেসর
উর্দু বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, ***উর্দু সাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানা মতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি এবং এটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

মোসাঃ জোসনা খাতুন
উর্দু বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু, যিনি সকল জ্ঞানের অধিকারী। যাঁর ইচ্ছা ও অনুগ্রহে আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। লাখো কোটি দরূদ ও সালাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও মানুষের পথ প্রদর্শক এবং মানবজাতির শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি, যিনি মানবজাতিকে অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর সন্ধান দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম আমি অন্তরের অন্তরস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এ অভিসন্দর্ভের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক এবং আমার প্রাণপ্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ড. মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, প্রফেসর উর্দু বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রতি। যিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সহিত আমার গবেষণাকর্মটি সম্বন্ধে পরামর্শ, সংশোধন, পরিমার্জন ও সংযোজন করেছেন এবং বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে আমাকে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিষয়বস্তু সুবিন্যাস্ত করণে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ পরামর্শ সত্যিই প্রশংসনীয়। তার নিকট আমি চিরঋণী।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের প্রফেসর ড. মো. নাসির উদ্দীন স্যারের প্রতি, যিনি অধ্যায় বিন্যাসে সুচিন্তিত মতামত, ব্যক্তিগত বই ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ফারসি বিভাগের প্রফেসর ড. এম. শামীম খান এবং ড. মো. কামাল উদ্দিন স্যারের প্রতি যারা আমাকে গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামত, পরামর্শ এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. অনীক মাহমুদ স্যারকে যার অনুপ্রেরণা এবং বাংলা বানানের ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা আমার গবেষণা কাজকে তথ্য সমৃদ্ধ ও সহজ করার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছে। আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলীর প্রতি, যাদের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে আমার গবেষণাকর্মটি ত্বরান্বিত হয়েছে।

গবেষণাকর্মটি সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থা বিভিন্নভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং উর্দু বিভাগের সেমিনারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং কর্মকর্তাবৃন্দের নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গভীর ভালোবাসার সাথে স্মরণ করছি আমার স্বামী কাওসার আহমেদকে, যিনি এককভাবে সংসারের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে সীমাহীন কষ্ট সহ্য করে দুই সন্তানকে আগলে রেখে আমার গবেষণাকাজে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। তার অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতা আমার গবেষণাকর্ম সম্পাদনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি আমার অত্যন্ত স্নেহের ও ভালোবাসার সন্তান ইসতিয়াক আহমেদ অনিককে। সে আমাকে গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে বিভিন্নভাবে সার্বিক সহযোগিতা করেছে। সে রাতদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আমাকে ঋণী করেছে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই এবং তার মঙ্গল কামনা করি।

আমার অভিসন্দর্ভটির পাণ্ডুলিপি যত্নসহকারে কম্পিউটার কম্পোজ ও গবেষণাপত্রটি প্রস্তুত করণের জন্য হাফিয মাওলানা আনোয়ার হোসাইনকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোসা. জোসনা খাতুন

শব্দ সংক্ষেপ

হি.	= হিজরী
খ্রি.	= খ্রিস্টাব্দ
বাং	= বাংলা
তা. বি.	= তারিখ বিহীন
রা.	= রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু
সা.	= সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
দ্র.	= দ্রষ্টব্য
মৃ	= মৃত/মৃত্যু
ড.	= ডক্টর
পৃ.	= পৃষ্ঠা
p.	= page
Co.	= Company
Ltd.	= Limited
Vol.	= Volume

সূচিপত্র

ভূমিকা **১**

প্রথম অধ্যায় : উর্দু সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ **৪**

১.১ উর্দু সাহিত্যের প্রাথমিক যুগ ৪

১.২ উর্দু সাহিত্যের মধ্যযুগ ৫

১.৩ উর্দু সাহিত্যের আধুনিক যুগ ৬

দ্বিতীয় অধ্যায় : উর্দু কাব্যসাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান **৮**

২.১ গজল ৮

২.২ নজম ২৫

২.৩ মছনবী ৪৮

২.৪ মারছিয়া ৭০

তৃতীয় অধ্যায় : উর্দু গদ্যসাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান **৯১**

৩.১ উপন্যাস ৯১

৩.২ নাটক ১৫৭

৩.৩ ছোটগল্প ১৬৭

৩.৪ প্রবন্ধ ২৩৪

৩.৫ সাংবাদিকতা ২৩৬

চতুর্থ অধ্যায় : অমুসলিম সাহিত্যিকদের সাহিত্যে বিধৃত সমাজচিত্র **২৬০**

৪.১ কাব্যসাহিত্যে বিধৃত সমাজচিত্র ২৬০

৪.২ গদ্যসাহিত্যে বিধৃত সমাজচিত্র ২৬৩

উপসংহার **২৭১**

গ্রন্থপঞ্জি **২৭৩**

ভূমিকা

উর্দু একটি জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত ভাষা। তবে অনেকে মনে করেন উর্দু কেবল মুসলমানদের ভাষা। আসলে তা সত্য নয়, ভাষার কোন ধর্ম নেই। সব ভাষায় সকল ধর্মের মানুষ কথা বলতে, লিখতে ও জ্ঞান চর্চা করতে পারে। যেমন আরবি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মাতৃভাষা হতে পারে না। সংস্কৃত বিশ্বজুড়ে হিন্দুদের ভাষা হতে পারে না। কোন ভাষার উপর কোন ধর্মের একচেটিয়া কোন অধিকার নাই। কোন ভাষার উন্নতি হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো তার সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা। উর্দু সাহিত্যে মুসলমানরা যেমন অবদান রেখেছেন অমুসলিমরা তেমনি অবদান রাখার চেষ্টা করেছেন। উর্দু কবিতা হোক বা গদ্য, সমালোচনা বা গবেষণা, রসিকতা সাহিত্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে অমুসলিম লেখকরা জড়িত রয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশাপাশি উর্দু সাহিত্যের উন্নতি, বিকাশ, অগ্রগতি এবং প্রচারে হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেরাও বিশেষ অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতার আগে উর্দু ছিল অমুসলিমদের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা ও মনের ভাব প্রকাশের সৃজনশীল মাধ্যম। কবিতা বা গদ্যই হোক, সমস্ত অমুসলিম লেখকদের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। যাদের সৃজনশীল প্রচেষ্টা উপেক্ষা করা যায় না। তারা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেছেন।

গবেষণার শিরোনাম নির্বাচন

মানবিক মূল্যবোধ ও মানব জীবনকে সামনে রেখে যতগুলো ললিতকলার জন্ম হয়েছে সাহিত্য তাদের মধ্যে অন্যতম। সাহিত্য বলতে যথা সম্ভব কোন লিখিত বিষয়বস্তুকে বুঝায়। মানুষের আবেগ অনুভূতি চিন্তা কল্পনাকে লেখক ভাষার মাধূর্য দিয়ে যা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেন তার নাম সাহিত্য। উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উর্দু সাহিত্যের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিম কবি সাহিত্যিকরাও অসামান্য অবদান রেখেছেন। প্রেমচাঁদ, কৃষণচন্দ্র, পণ্ডিত রতন নাথ সরশার, রাজেন্দ্র সিং বেদী, সুদর্শন, ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত, তিলোক চাঁদ মাহরুম, নেহাল চাঁদ লাহোরী, আনন্দ নারায়ণ মোল্লা, ফেরাক গোরাখপুরী, জগন্নাথ আজাদ প্রমুখ অমুসলিম কবি সাহিত্যিক তাদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে উর্দু সাহিত্যকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। এসব অমুসলিম কবি সাহিত্যিক ছাড়াও আরো অনেক কবি সাহিত্যিক রয়েছেন যারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন। অথচ

তাদের সম্পর্কে এখন পর্যন্ত অথ্যসমৃদ্ধ কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। তাই এই গবেষণাকর্মের শিরোনাম **"উর্দু সাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান"** নির্বাচন করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি মূলত কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে নতুন তথ্য উদঘাটন ও সত্যে উপনীত হওয়ার মাধ্যম। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক (Primary) এবং গৌণ (Secondary) উভয় ধরনের উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের উপর ভিত্তি করেই গবেষণাকর্মটি সম্পাদিত হয়েছে।

অমুসলিম কবি সাহিত্যিকদের কাব্য ও গ্রন্থাবলী এ গবেষণাকর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে গৃহীত হয়েছে। তাদের জীবনী ও সাহিত্যকর্ম এবং সংশ্লিষ্ট যুগের সমকালীন অবস্থা সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী এ গসেষণাকর্মের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উর্দু, ইংরেজি এবং বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী থেকেও তথ্য ও উপাত্ত আহরণে সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সংগৃহীত উপাত্ত ও তথাবলী সংযোজনের ক্ষেত্রে প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

থিসিসের অধ্যায় ভিত্তিক পর্যালোচনা

এ গবেষণাকর্মকে ভূমিকা ও উপসংহার ব্যতীত চারটি অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়গুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

প্রথম অধ্যায় : উর্দু সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ। এই অধ্যায়ে উর্দু সাহিত্যের উৎপত্তির ইতিহাসসহ উর্দু সাহিত্যের বিকাশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : উর্দু কাব্যসাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান। এই অধ্যায়ে গজল, নজম, মছনবী ও মারছিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সংজ্ঞা এবং কাব্যের এই শাখাগুলোতে অমুসলিম কবিদের পরিচয় এবং উর্দু কাব্য সাহিত্যে তাদের অবদান সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : উর্দু গদ্যসাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান। এই অধ্যায়ে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং সাংবাদিকতার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং বিভিন্ন সমালোচক ও সাহিত্যিকদের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে। গদ্যের এই শাখাগুলোতে যে অমুসলিম সাহিত্যিগণ অবদান রেখেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : অমুসলিম কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্যে বিধৃত সমাজচিত্র। এ পর্যায়ে উর্দু কাব্য সাহিত্যে কবিগণের কবিতায় সমাজের বিভিন্ন যে দিকগুলো চিত্রায়ন করেছেন, তারা তাদের কাব্য

সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন যে সকল সমস্যার সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, উর্দু গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে সাহিত্যিকগণ সমাজের যে সুক্ষ্ম দিকগুলো তুলে ধরেছেন এবং তারা তাদের গদ্য সাহিত্যের দ্বারা সামাজিক সমস্যাবলী প্রতিকার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা এই অধ্যায়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

উপসংহার: গবেষণার শেষে উপসংহার সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

এই গবেষণাকর্মের সর্বশেষে লেখকের নাম গ্রন্থের নাম, প্রকাশনা ও প্রকাশকাল সম্বলিত একটি গ্রন্থপঞ্জি এবং ইন্টারনেট থেকে লিংক সংযোজন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

উর্দু সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক ভাষাভাষী লোকের সংমিশ্রণে এই ভাষার উৎপত্তি হয়। কিন্তু এই ভাষা উৎপত্তির জন্য দু'চার বছর যথেষ্ট ছিল না, বরং শত শত বছরের প্রয়োজন হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনে আরবি, ফারসি, তুর্কি এবং স্থানীয় ভাষাভাষীদের সংমিশ্রণে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়।

১.১ উর্দু সাহিত্যের প্রাথমিক যুগ

ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, উর্দু ভাষার প্রথম কবি ছিলেন শাহ মোহাম্মদ আলী ওলী (১৬৬০-১৭২০ খ্রি.)।[১] তিনি দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত কবি ছিলেন। উর্দু কবিতায় ওলী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাকে উর্দু কবিতার আদি পিতা বলা হয়।[২] তার কবিতার ভাষা ছিল সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল। তার কবিতা পাঠ করলে পাঠকমনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তার কবিতায় সহজ-সরল ভাষা ব্যবহার করলেও কবিতায় নিয়মের অভাব ছিল না। নমুনা হিসেবে তার একটি পংক্তি তুলে ধরা হলো-

شغل بہتر ہے عشق بازی کا
کیا حقیقی و کیا مجازی کا۔[৩]

আলোচ্য যুগে কবি মীর তক্বী মীর (১৭২২-১৮১০) খ্রি.) উর্দু সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধন করেন। মীরের কবিতা তার স্বীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি। তার কবিতায় নৈরাশ্য ও উদ্বেগ, ব্যথা ও বেদনা এবং দুঃখ যন্ত্রণার ছাপ উপস্থাপিত হয়। তার ভাষা সহজ, সরল, গীতিময় ও মাধুর্যপূর্ণ। তাকে উর্দু গজলের সম্রাট বলা হয়।[৪] মীর তক্বী মীরের সমসাময়িক আর একজন বিখ্যাত কবি হলেন মীর সওদা (১৭১২-১৭৮১ খ্রি.)। উর্দু ভাষায় কাসিদা লিখে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাকে উর্দু কাসিদার বাদশাহ বলা হয়।[৫] আলোচ্য যুগে উর্দু কাব্য সাহিত্যে আরো যারা বিশেষ অবদান রাখেন তাদের মধ্যে মীর হাসান, মীর দরদ, মীর সুয, কায়েম চাঁদপুরী, ইনশাল্লাহ খান ইনশা, মাসহাফী, নজীর প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উর্দু কাব্য সাহিত্যের ন্যায় উর্দু গদ্য সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। উর্দু গদ্য সাহিত্যের যে সমস্ত প্রাচীন নমুনা উৎঘাটন করা হয়েছে তার অধিকাংশ দক্ষিণ ভারতের লিখিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ। মোল্লা ওয়াজহীর سب رس (সবরছ) এবং মৌলবী আব্দুল্লাহ-এর احکام الصلوۃ (আহকামুস সালাত) এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এ যুগে মাওলানা ফযল আলী ফযলী সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ উর্দু গ্রন্থ রচনা করেন।

তার গ্রন্থের নাম دہ مجلس (দাহ মাজলিশ) (১৭৩২ খ্রি.)। এরপর মীর আতা হুসাইন তাহাসিন نوطرز مرصع (নোও তরযে মুরাস্‌সা) ১৭৮৯ খ্রি.) লিখে উত্তর ভারতে উর্দু গদ্য সাহিত্য চর্চার ধারা অব্যাহত রাখেন।

১.২ উর্দু সাহিত্যের মধ্যযুগ

উর্দু সাহিত্যের মধ্যযুগকে স্বর্ণ যুগও বলা হয়। উর্দু কাব্য সাহিত্যের সমৃদ্ধিতে এ যুগের বিখ্যাত কবি ইব্রাহীম জোক, আসাদুল্লাহ খান গালিব এবং মু'মিন খান মু'মিন বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। এই যুগে তাদের মাধ্যমে উর্দু কাব্য সাহিত্য বিকশিত হয়। ইব্রাহীম জোক (১৭৮৯-১৮৫৪ খ্রি.) সে সময়ে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি কাসিদায় যেমন দক্ষ ছিলেন তেমনি গজলেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এই যুগের আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি হলেন- মু'মিন খাঁ মু'মিন (১৮০০-১৮৫২ খ্রি.)। তিনি সৌন্দর্যপ্রিয় ও নন্দিত কবি হিসেবে অধিক পরিচিত ছিলেন। যদিও তিনি কাসিদা, মছনবী ইত্যাদি রচনা করেছেন তথাপি তার মূল কাব্য রচনার ক্ষেত্র ছিল গজল। গজলে তিনি প্রেমঘটিত বিষয়াবলী অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তার এক গজলে প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا
جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔[৬]

এই পংক্তিটি শুনে মির্যা গালিব এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি এর বিনিময়ে তার দীওয়ানটি মু'মিনকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।[৭] এছাড়া আলোচ্য যুগে আরও যারা উর্দু ভাষায় কাব্যচর্চা করেন তাদের মধ্যে বাহাদুর শাহ জাফর, শাহ নাসির, নওয়াব মোস্তফা খান শিফতা, আনিস, দবীর প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই যুগে উর্দু গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি রচিত হয়েছিল কলকাতায় ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ (১৮০০ খ্রি.) প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে। ইংরেজ অফিসারদেরকে ভারতীয় ভাষায় (উর্দু) শিক্ষাদান এবং ভারতীয় ভাষায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৮] এ কলেজে ভারতীয় অতিপুরাতন ও দুষ্পাপ্য গ্রন্থগুলো ইংরেজ অফিসারদেরকে পড়ানোর উদ্দেশ্যে সহজ সরল উর্দু ভাষায় অনুবাদ করা হতো। ফলে উর্দু গদ্য সাহিত্য খুব দ্রুত ও চমৎকারভাবে সমৃদ্ধি লাভ করে। এ কলেজে উর্দু গদ্য সাহিত্যের উন্নতির জন্য যারা বিশেষভাবে ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে ড. জন গিলক্রিষ্ট অন্যতম। এছাড়া মীর আম্মান দেহলবী, লাল্লু লালজী, বেইনী নারায়ণ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পরে দিল্লী কলেজ উর্দু গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশে বিশেষ

ভূমিকা পালন করে। এ কলেজটি একটি মাদ্রাসা হিসেবে ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজরা ভারতীয়দেরকে ইংরেজি শিখানোর উদ্দেশ্যে এই মাদ্রাসাকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।[৯] এ কলেজে একটি অনুবাদ শাখাও ছিল। এ শাখায় বিভিন্ন বিষয়ে দেশীয় (উর্দু) ভাষায় রচিত প্রায় দেড়শ ইংরেজি পুস্তকের অনুবাদ করা হয়।

১.৩ উর্দু সাহিত্যের আধুনিক যুগ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে আধুনিক উর্দু কাব্য সাহিত্যের সূচনা হয়।[১০] এই যুগের বিখ্যাত কবি হলেন- খাজা আলতাফ হুসাইন হালী (১৮৩৭-১৯১৪ খ্রি.) ও মুহাম্মদ হুসাইন আজাদ (১৮৬০-১৯১০ খ্রি.)। তাদের মাধ্যমে আধুনিক উর্দু কাব্য সাহিত্যের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হয়েছিল। উর্দু সাহিত্যের প্রাথমিক ও মধ্যযুগে উর্দু কাব্য রচিত হতো শুধু আধ্যাত্মিক ও প্রেম-ভালোবাসা বিষয়ক। প্রকৃতি ও বাস্তব জীবন সংক্রান্ত কোন বিষয়ে উর্দু কাব্য রচনা করা হতো না। স্যার সৈয়দ আহমদ খান ছিলেন আধুনিক যুগের লেখক। তার অনুপ্রেরণায় হালী ও আজাদ সর্বপ্রথম আধুনিক উর্দু কাব্য চর্চা শুরু করেন। এখানে হালীর কবিতার একটি পংক্তি তুলে ধরা হলো-

آتی نہیں ہے شرم تجھے اے خدا پرست
دل میں کہیں نشاں نہیں تیرے یقین کا۔[১১]

আজাদ ও হালী ছাড়া আধুনিক যুগের কবিদের মধ্যে আল্লামা ইকবাল, জিগর মুবাদাবাদী, জোশ মালিহাবাদী, ইসমাঈল মেরীঠী, ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত, ফেরাক গোরাখপুরী, আনন্দ নারায়ণ মোল্লা, সুরজ নারায়ণ মেহের প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক উর্দু গদ্য সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপনকারী ছিলেন মির্যা আসাদুল্লাহ খান গালিব (১৭৯৭-১৮৬৯ খ্রি.)। সর্বপ্রথম তিনি উর্দু ভাষায় পত্র লিখে আধুনিক উর্দু গদ্য সাহিত্যে একটি নতুন মাত্রার সংযোজন করেন। তার পত্র সংকলন اردوئے معلی (উর্দুয়ে মুয়াল্লা), عود ہندی (উদে হিন্দি), مکاتب غالب (মাকাতীবে গালিব) ও نادرات غالب (নাদরাতে গালিব) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থগুলোতে তার সর্বমোট ৮৭৭টি উর্দু পত্র স্থান পেয়েছে। তার পত্রের ভাষা অত্যন্ত সাবলীল, প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক। গালিবের পত্রাবলীতে উর্দু গদ্যের যে সূচনা হয়েছিল মোহাম্মদ হুসাইন আজাদ তাকেই সমৃদ্ধ করেন। আজাদের সবচাইতে সার্থক রচনা ابِ حیات (আবে হায়াত), نیرنگ خیال (নৈরাঙ্গে খেয়াল) এবং دربار اکبری (দরবারে আকবরী) ইত্যাদি।

এছাড়া আলোচ্য যুগের অন্যান্য সাহিত্যিকদের মধ্যে- স্যার সৈয়দ আহমদ খা, নজীর আহমদ, জাকাউল্লাহ, আল্লামা শিবলী নোমানী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১ ড. খুশহাল যাইদী, *মুরাসসায়ে* (নয়াদিল্লীঃ ইদারায়ে বখশে খিযরে রাহ, তা.বি.), পৃ. ২০১।

২ নুরুল ইসলাম নাকবী, *তারিখে আদবে উর্দু* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ৭৪।

৩ *ইন্তেখাবে মাঞ্জুমাত*, ২য় খণ্ড (লক্ষ্ণৌঃ উত্তর প্রেস উর্দু একাডেমি, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৮।

৪ এ. বশীর, *সহীফায়ে আদব* (আলীগড়ঃ আনোয়ার বুক ডিপো, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৯।

৫ ড. মোঃ নাসির উদ্দীন, *আলতাফ হুসাইন হালীঃ উর্দু সাহিত্যে তার অবদান*, পি-এইচ-ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ২৫।

৬ *ইন্তেখাবে মাঞ্জুমাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

৭ ড. মোঃ নাসির উদ্দীন, *আলতাফ হুসাইন হালীঃ উর্দু সাহিত্যে তার অবদান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।

৮ আবিদা বেগম, *ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কী আদবী খেদমাত* (লক্ষ্ণৌঃ নিসরাত পাবলিকেশন, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৯।

৯ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কী তারিখ* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২০৩।

১০ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু* (দিল্লীঃ উর্দু কতাবঘর, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ১০৯।

১১ মাওলানা আলতাফ হুসাইন হালী, *দীওয়ানে হালী* (দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৩১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উর্দু কাব্যসাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান

কাব্য হচ্ছে শব্দ প্রয়োগের ছান্দনিক কিংবা অনিবার্য ভাবার্থের বাক্য বিন্যাস যা একজন কবির আবেগ অনুভূতি, উপলব্ধি ও চিন্তার সংক্ষিপ্ত রূপ তা উপমা ও চিত্রকল্পের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। উর্দু কাব্যসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। যেমন: গজল, নজম, কাসিদা, মছনবী, মারছিয়া, রুবাঈ, কেতআ, হামদ, না'ত, মুসাদ্দাস, মুনাজাত, মুনকাবাত ইত্যাদি। উর্দু কাব্যসাহিত্যের এই শাখাগুলোতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি অবদান রেখেছেন। যদিও উর্দু কাব্যসাহিত্যে মুসলিম কবিদের অবদান অনেক বেশি, কিন্তু অমুসলিম কবিদের অবদানও কম নয়। উর্দু কাব্যসাহিত্যে গজল, নজম, মছনবী ও মারছিয়ায় অমুসলিম কবিগণের অবদান বেশি বিধায় এখানে উল্লিখিত বিষয়ে অমুসলিম কবিদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

২.১ গজল

গজল আরবি ভাষা থেকে উৎপত্তি হলেও ফারসি ভাষায় এটি বিশেষ বিকাশ লাভ করে। পরবর্তীতে উর্দু ভাষায় এটি অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। গজলের অর্থ নারীদের সাথে কথা বলা। কাব্যের এ শাখায় মেয়েদের প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ড. মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ কাতীল বলেছেন-

"غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنے، ان کے ساتھ خوش طبعی سے پیش آنے اور عاشقی کرنے کے ہیں۔"[১]

গজলের সংজ্ঞা বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সমালোচক বিভিন্নভাবে দিয়েছেন, তবে আজিমুল হক জুনায়দীর গজলের সংজ্ঞাটি যুক্তিযুক্ত। আজিমুল হক জুনায়দী বলেছেন-

"غزل اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حسن و عشق، تصوف، اخلاق، فلسفہ وغیرہ سے متعلق مضامین ہوں اور ہر شعر کا مضمون الگ ہو۔"[২]

প্রতিটি গজলের বিষয়বস্তু ও অর্থ আলাদা। গজল আমাদের সভ্যতার একটি অংশ হয়ে গেছে। এ কারণে আমাদের সমাজে প্রত্যেক জায়গায় গজল জনপ্রিয় হয়েছে। প্রফেসর রশিদ আহমেদ সিদ্দিকী গজলকে উর্দু কবিতার 'আবরু' বলেছেন।[৩] গজল উর্দু কাব্যসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। এই শাখায় যে অমুসলিম কবি বিশেষ অবদান রেখেছেন তিনি হলেন- ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত।

ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্তঃ তিনি উর্দু কাব্যসাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি। তিনি জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য গজল রচনা করেছেন। উর্দু কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে চাকবাস্তের নাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ১৯ শে জানুয়ারি ফয়েজাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।[৪] তিনি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ১২ই

ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।[৫] তার পিতার নাম ছিল উদিত নারায়ণ চাকবাস্ত। তার পিতা একজন কবি ছিলেন। তার পাঁচ বছর বয়সেই তার পিতা মৃত্যুবরণ করেন।[৬] তিনি ঘরে বসেই উর্দু, ফারসি পড়া শিখেছেন। তারপর তিনি সরকারি হাই স্কুলে ভর্তি হন, সেখান থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন এবং ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে এফ এ পরীক্ষায় পাস করেন। তারপর তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বিএ ভর্তি হন এবং ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এল. এল. বি ডিগ্রী অর্জন করেন।[৭] ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ওকালতি জীবনে পদার্পণ করেন এবং ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ১৮ বছর ওকালতি করেন।[৮] তারপর তিনি চাকরি ছেড়ে গজলে ঝুঁকে পড়েন। তার গজল পড়লে তা সহজে বোধগম্য হয়।

فکر دنیاداری ہے دشمن سخن۔اس کشمکش میں غزل کہنا ہمارا کام ہے[৯]

তিনি উর্দু কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একজন জাতীয় কবি। তিনি উর্দু গজলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম গজল রচনা শুরু করেন যা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১০] তারপর থেকে তিনি একটানা বহু উৎকৃষ্ট গজল রচনা করেন। তার গজলের বিষয়বস্তু ছিল বেশির ভাগই দেশপ্রেম। তিনি দেশকে ছাড়া কোন কিছুই ভাবতে পারতেন না। দেশের মাটি ও মানুষ সবই তার কাছে আপনজন। সে কারণে তিনি দেশকে নিয়ে অনেক গজল রচনা করেছেন। এ সম্পর্কে তার গজলের একটি পংক্তি উদ্ধৃত হলো-

یہ وہ غم ہے کہ جس کی پرورش دل خوب کرتا ہے☆زباں تک لا نہیں سکتا میں شکوے بیوفائی کے[১১]

চাকবাস্ত দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়েও অনেক গজল লিখেছেন। তার গজলের মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। অনেক উর্দু কবি বিহারের সকালের দৃশ্যের বর্ণনা করেছেন; কিন্তু চাকবাস্ত তার গজলে রাতের দৃশ্য অঙ্কন করেছেন। কবি তার অনুভূতি ও আবেগ দিয়ে রাতের দৃশ্যকে এত সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন তা অকল্পনীয়। কবি বিহারের রাতের দৃশ্যকে এভাবে বর্ণনা করেছেন-

عکس گل رہتا ہے آب جوئے گلشن پر☆پھولوں کی جھولیوں میں ہیں موتی بھرے ہوئے
شبنم لٹا رہی ہے خزانہ بہار کا☆پھیلی ہو جیسے گور غریباں میں چاندنی۔[১২]

চাকবাস্তের গজল বেশিরভাগ রাজনৈতিক ইভেন্ট দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। এছাড়া তার আরো গজল রয়েছে যা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস বাড়ানোর চেষ্টা করে। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলন ও সমস্যা নিয়ে অনেক গজল লিখেছেন। তিনি জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমকে তার গজলের মূল বিষয়বস্তু

হিসেবে তৈরি করেছেন। চাকবাস্ত তার গজলে রাজনৈতিক মতাদর্শ খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন-

گردنیں خم ہیں ندامت سے دل آزاروں کی ☆ رہ گئی بات زمانہ میں وفاداروں کی
قید سے چھوٹ کے آئے ہیں وفا کے یوسف ☆ سر بازار ہے کیا بھیڑ خریداروں کی۔[১৩]

চাকবাস্তের কাছে মানবতা ধারণাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা প্রতিটি ধর্মে বিদ্যমান। তিনি একজন নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল জাতীয় কবি ছিলেন। তার কথাগুলো দেশপ্রেম এবং মানবতার এক নিখুঁত উদাহরণ। গজল তাকে আরো বেশি সম্মানিত ও বিশিষ্ট কবি হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। তিনি গজলের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তিনি কোন সম্প্রদায়িক কবি ছিলেন না। তার গজলে মানবতাবাদের উদাহরণস্বরূপ দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত হলো-

قوم کی شیزازہ بندی کا گلہ بیکار ہے ☆ طرز ہندو دیکھ کر رنگ مسلمان دیکھ کر
انتشار قوم سے جاتی رہی تسکین قلب ☆ نیند رخصت ہو گئی خواب پریشاں دیکھ کر[১৪]

চাকবাস্তের সবচেয়ে অন্যতম দিক হলো তিনি মানুষের জীবন সম্পর্কে একটি আদর্শ ধারণা তৈরি করতেন এবং তারপরে গজলে সেই ধারণা উপস্থাপন করতেন। বর্ণ, সমাজ ও জাতীয়তাবাদ সংস্কার ছাড়াও চাকবাস্তের গজলে প্রতিপাদ্য বিষয় অভূতপূর্ব শক্তির প্রতিচ্ছবি। তিনি জীবন ও দর্শন বিষয়ে অসংখ্য গজল লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ-

فنا کا ہوش آنا زندگی کا درد سر جانا ☆ اجل کیا ہے خمار بادۂ ہستی اتر جانا[১৫]

চাকবাস্ত ছিলেন একজন বড় মাপের কবি। তিনি সূফীদের জীবনী নিয়ে গজল লিখেছেন। সূফীরা তাদের নিজের জীবনকে ভুলে যান। তারা আত্মতৃপ্তিতে ব্যস্ত থাকেন। তিনি তার গজলে সূফীদের জীবনী খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। কবি বলেন-

نظر آتا ہے فقیری میں تماشائے جہاں ☆ ٹھیکرا بھیک کا جمشید کا پیمانہ ہے
کیسا ہوائے حرص میں برباد بشر ☆ سمجھا ہے زندگی کو یہ مشت غبار کیا[১৬]

চাকবাস্ত শুধু ভারতের গজলকার ছিলেন না, তিনি সারা বিশ্বের গজলকার ছিলেন। তিনি গজলে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। তার গজলের ভাষা ছিল খুবই সহজ-সরল এবং প্রাণবন্ত। তার গজলের ভাষা শুনলে মনে হয় এটা শুধু মানুষের জন্যই লেখা এবং দেশের জন্যই লেখা। তার গজলের লাইনগুলো পড়ে মানুষ আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

জগন্নাথ আজাদঃ জগন্নাথ আজাদ ছিলেন একজন ভারতীয় উর্দু কবি, লেখক এবং শিক্ষাবিদ। তিনি ৫ই ডিসেম্বর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারত পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।[১৭] তার পিতার নাম তিলোক চাঁদ মাহরুম। তার পিতাও একজন কবি ছিলেন। তার আসল নাম জগন্নাথ এবং উপাধি আজাদ।[১৮] তিনি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করার পরে দয়ানন্দ অনল বৈদিক কলেজ থেকে ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি পাঞ্জাবের লাহোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারসিতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন।[১৯] কলেজে প্রথম স্থান অর্জন করার জন্য তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই উপহার দেওয়া হয়। তিনি কলেজে প্রথম দিনগুলোতে 'পত্রিকা গর্ডিয়ান' এর সম্পাদক হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেন। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি তথ্য অফিসার পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন সরকারি পদে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরে জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। অবশেষে তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতি হন এবং একেবারে শেষ অবধি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ২৪ শে জুলাই নায়াদিল্লীতে ক্যান্সারে ৮৫ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন।[২০]

অধ্যাপক জগন্নাথ আজাদ অন্যতম সম্মানিত বিশেষজ্ঞ হলেও তিনি একজন সুপরিচিত গজলকার। জগন্নাথ আজাদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে গজলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। জগন্নাথ আজাদ যে সময়ে গজল লিখতে শুরু করেন, সে সময় শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল না সাহিত্যের অবস্থানও বর্তমান ছিল। ওই সময়ে কবিগণ সমাজের বাস্তব চিত্র ও দুঃখের বিষয়ে গজল রচনা করতেন। আজাদ এ বিষয়ে কিছু একমত ছিলেন; কিন্তু তার গজলে প্রেমের বিষয়টি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। আজাদের গজলে প্রথম দিকে প্রেমের অনুভূতি জাগ্রত হয়। তার প্রেমিকা কোন বস্তু নয়; বরং জীবন্ত মানুষ। তিনি তার গজলে প্রেমিকাকে উদ্দেশ্যে করে এভাবে বলেন-

دل ہر قدم پہ ترے سہارے کا منتظر ☆ دنیا تمام دل کا سہارا لئے ہوئے[২১]

প্রেমের জীবনে গুরুত্ব রয়েছে এটা কখনো অস্বীকার করা যায় না। এটির মাধ্যমে ইচ্ছার জন্ম হয়, যা জীবনকে রঙিন করে তোলে এবং মানুষ সেটির পেছনে দৌঁড়াতে থাকে। জগন্নাথ আজাদের বেশিরভাগ গজল প্রেম সংক্রান্ত, প্রেমের বিষয় সুস্পষ্ট। প্রতিটি যুগে প্রেমের সাথে দুঃখকে আলাদাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এটি হতাশা এবং ব্যর্থতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। জগন্নাথ আজাদ তার গজলে দুঃখকে এভাবে তুলে ধরেছেন-

میں ہر غم جہاں سے گزرتا چلا گیا ☆ اک ترے غم نے کتنا بڑا آسرا دیا[২২]

অনন্য সাফল্যের সাথে জগন্নাথ আজাদ তার জীবন অতিবাহিত করেছেন। প্রতিটি সাফল্য জীবনের তলদেশে যেখানে ব্যক্তিত্ব, ধার্মিকতা, কঠোর পরিশ্রম এবং জীবনের প্রতি আদর্শিকভাবে গুণাবলী নিজে অর্জন করে। সবারই জীবনের সামগ্রিক চিত্র পরিপূরক করতে, বিভিন্ন দুর্বলতা, পরীক্ষামূলক প্রতিক্রিয়া, মানসিক পক্ষপাত এবং উদ্বেগ রয়েছে। কবি যেহেতু অসাধারণ অনুভূতি ও আবেগের একজন ভাস্কর তাই কেউ তার মুক্তিলাভ থেকে বাধা দিতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে তার গজলে তিনি বলেন-

اے مجھے بھول کر بھی یاد نہ کرنے والے ☆ دن تو کیا ہجر میں راتیں بھی مری بیت گئیں
مری تقدیر کانٹے چن رہی ہے ☆ بہار بوستاں ہے اور میں ہوں [২৩]

জগন্নাথ আজাদ যখন তার জন্মভূমি পাকিস্তান সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং যখন তিনি এ দেশটি অপরিচিত ব্যক্তির মতো পরিদর্শন করেন, তখন তিনি রাজনীতির সংকীর্ণ বাস্তবতা নির্বিশেষে প্রেমের ক্ষমার অযোগ্য পরিবেশকে স্বাগত জানান। তাই তার হৃদয় থেকে এই অনুভূতি ফেটে যায়-

وطن نے تجھ کو بلایا تو کیا ہوا ازاد ☆ دیار غیر میں تو اپنے احترام کو دیکھ
کیا خبر کیا بات اس کے کفر میں پوشیدہ ہے ☆ ایک کافر کیوں حرم والوں کو یاد آیا بہت [২৪]

তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে কখনো আলাদা চোখে দেখতেন না। তিনি হিন্দু নন, মুসলমান নন, তিনি একজন সাধারণ মানুষ। তিনি শুধু একজন সাধারণ মানুষ নন, তিনি একজন কবি। তিনি একজন বড় কবি নন, তিনি একজন মানুষের কবি। এ প্রসঙ্গে হামিদা সুলতান আহমেদ বলেছেন-

"ازاد ہر دور میں انسانیت کے علمدار رہے۔ اس جھنڈے کو پریشانی کے دور میں بھی سرنگوں نہ ہونے دیا۔ سچ پوچھئے تو آزاد نہ ہندو ہیں نہ مسلمان، وہ ان تعصبات سے الگ ایک انسان ہیں محض انسان۔ اسی انسانیت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے وہ کوشاں ہیں"۔ [২৫]

তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রসঙ্গে অনেক গজল লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তার গজলে বলেন-

گرچہ انسان ہے زبوں حال مگر میں اے دوست ☆ درد مستقبل انسان سے نہیں ہوں مایوس [২৬]

জগন্নাথ আজাদের গজলের মধ্যে শুধু দেশপ্রেম এবং হিন্দু মুসলমান বিষয়ে দেখা যায় না। তিনি রাজনৈতিক বিষয়েও গজল লিখেছেন। তার গজলের মধ্যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দেখা যায়। এ বিষয়ে তার গজলের দু'টি পংক্তি তুলে ধরা হলো-

بس ایک نور جھلکتا ہوا نظر آیا ☆ پھر اس کے بعد نہ جانے چمن پہ کیا گزری
میں کاش تم کو بھی اہل وطن بتا سکتا ☆ وطن سے دور کسی ہے وطن پہ کیا گزری [২৭]

জগন্নাথ আজাদের গজলে প্রেম, দেশপ্রেম, রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে তার সাথে সাথে দৃশ্যের সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। দৃশ্যের সৌন্দর্যের বর্ণনা তার গজলে সচরাচর পাওয়া যায়। তার গজলে সৌন্দর্যের বর্ণনা তিনি এভাবে তুলে ধরেছেন-

غزل میں حُسن بیان بڑی شے ہے شک نہیں مجھ کو اس میں لیکن ☆ میں شوز جذبے کا دیکھتا ہوں غزل میں حُسن بیان سے پہلے [২৮]

আজাদের গজলের ভাষা গঙ্গায় অতিবাহিত সভ্যতার চেয়ে পাঞ্জাবের প্রভাব বেশি প্রস্ফুটিত হয়। তার গজলের ভাষা সহজ ও সরল এবং তার গজলে শান্তির ঘনঘটা পাওয়া যায়।

ফেরাক গোরাখপুরীঃ ফেরাক গোরাখপুরী উর্দু সাহিত্যে এক অনন্য সৃষ্টিশীল নাম। ফেরাক গোরাখপুরী **১৮৯৬** খ্রিস্টাব্দে একটি শিক্ষিত পরিবারে গোরাখপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম রঘুপতি সাহায়ে এবং ফেরাক তার উপাধি।[২৯] তার পিতার নাম ছিল মুন্সী গোরাখ প্রসাদ ইবরত। তিনি ছিলেন বিখ্যাত উকিল ও খুব সম্মানী কবি। ফেরাকের প্রাথমিক পড়াশুনা তার ঘরেই হয়েছিল। সাত বছর বয়সে তার পিতা তাকে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তিনি খুব মেধাবী ছিলেন। সে জন্য তিনি পড়াশুনায় অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন।[৩০] তিনি পড়াশুনার জন্য গোরাখপুর ছেড়ে এলাহাবাদ চলে আসেন এবং **১৯১৮** খ্রিস্টাব্দে তিনি এলাহাবাদে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।[৩১] পড়াশুনা শেষ করে তিনি ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরি পান। ডেপুটি কালেক্টর পদ পাওয়ার পূর্বে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই তাকে জেলে যেতে হয়েছিল।[৩২] তিনি সর্বদা কবিতার আকর্ষণ অনুভব করেছেন। তিনি সমসাময়িকদের মধ্যে যেমন আল্লামা ইকবাল, ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ, কাইফি আজমি এবং শাহির লুধিয়ানীর মতো বিখ্যাত উর্দু কবিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তবুও তিনি অল্প বয়সে উর্দু কবিতায় নিজের জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি **৩ই মার্চ ১৯৮৩** খ্রিস্টাব্দে ভারতের নয়াদিল্লীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[৩৩]

ফেরাক গোরাখপুরী সে সময়ের একজন সুপরিচিত কবি ছিলেন। তার গজলগুলো তার নিজস্ব একটি সমুদ্র। ফেরাকের গজলের একটি বিশেষ গুণ হলো তার কবিতায় বহু ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং তার গজলে সমস্ত প্রকারের সংমিশ্রণ রয়েছে। তার গজলের বিষয় হলো সৌন্দর্য এবং প্রেম, তবে তার গজলে মানবতার উজ্জ্বল নিদর্শন এবং মূল্যবোধ পাওয়া যায়। তার গজলে প্রেম, প্রেমের বিষয়গুলো, দেহ এবং লিঙ্গের ধারণা, সুন্দর ভারতীয় দেওয়ালি উপাদানগুলো মার্জিত ও নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ। তিনি ভারতীয় সভ্যতাটিকে গজলের অংশ হিসেবে তৈরি করেছেন। তিনি তার জীবনে অসংখ্য গজল সৃষ্টি করেছেন। তার গজলের সংখ্যা সম্বন্ধে শামীম হানফী সাহেব বলেছেন-

"۱۹۴۵ء میں فراق صاحب نے اپنی غزلوں کا ایک اشاریہ بنوایا تھا۔اس اشاریہ کے مطابق فراق صاحب نے کل چھ سو چوبیس غزلیں کہیں تھی، ۱۹۴۵ء کے بعد سے ۱۹۸۲ء یعنی فراق صاحب کے سال وفات تک اس تعداد میں کم سے کم سو غزلوں کا اور اضافہ کر لیجے یعنی تقریباً سوا سات سو غزلیں ان میں زیادہ سے زیادہ چالیس پچاس غزلیں ایسی ہو گی جنہیں فراق صاحب کے واسطے سے نئی حیثیت کا ترجمان قرار دیا جاسکے"۔[৩৪]

ফেরাক প্রকৃতপক্ষে গজলের কবি ছিলেন।[৩৫] তার গজলের অনন্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হলো, তার গজলে পূর্ব ও পাশ্চাত্য মেজাজের মিশ্রণ রয়েছে।[৩৬] তিনি যা দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন, সেগুলো তিনি তার গজলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তার গজলে সরলতা, বিচ্যুতি, আন্দোলনের প্রভাব এবং প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অনুভূতিও রয়েছে। ফেরাকের গজলে ঐতিহ্যের রং রয়েছে। আমরা যদি ফেরাকের গজলগুলো মনোযোগ সহকারে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অধ্যয়ন করি, তবে তার গজলে ঐতিহ্যের রং খুব বেশি চোখে পড়ে। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর আতিকুল্লাহ সাহেব বলেছেন-

"فراق کلاسیکی اور شاعری کا گہرا اثر رکھتے تھے۔ان کی دینی اور فنی تربیت میں کلاسیکیت کا بہت بڑا ہاتھ تھا"۔[৩৭]

এ প্রসঙ্গে আবুল কালাম কাসেমী সাহেব একটু আলাদা করে এভাবে বলেছেন-

"فراق کے شعر میں بلاشبہ میر کے شعر کی بازگشت بھی موجود ہے مگر میر کے شعر میں محبوب کو ساری خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ قبول کرنے پر اصرار ہے جبکے فراق محبوب کے منفرد اور آزاد وجود کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔"[৩৮]

ফেরাকের গজলগুলো জীবনের খুব কাছাকাছি ছিলো। তাই তিনি উর্দুতে গজলকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছেন।[৩৯] যদিও ফেরাকের গজলে মীরের কিছু কবিতার প্রতিধ্বনি রয়েছে তবুও ফেরাকের গজলের কথাগুলো বিশিষ্ট এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তার গজলগুলোর একটু আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ফেরাকের উপভাষা ও রূপকগুলো গজলের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং এটি আশ্চর্যজনক যে এর বর্ণ ও রূপকগুলো ভারতীয় রঙে পাওয়া যায়। যেমন-

"دلوں میں تیری تبسم کی یادیوں آئی ☆ کے جگمگا اٹھیں جس طرح مندروں میں چراغ۔"[৪০]

ফেরাকের গজলে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণ এবং বিভিন্ন উপাদান রয়েছে। তিনি রাতকে নিয়ে অনেক গজল লিখেছেন। যেমন-

"غزل کے ساز اٹھاؤ، بڑی اداس ہے رات ☆ نوائے میر سناؤ، بڑی اداس ہے رات۔"[৪১]

ফেরাকের গজলে শব্দ চয়নের ব্যাপারটি খুব দেখা যায়। তিনি তার অনুভূতি দিয়ে এমন শব্দ চয়ন করে গজল লিখেন, যেন তা দক্ষতার উর্ধ্বে চলে যায়। উদাহরণস্বরূপ-

"سفید پھول زمین پر برس پڑیں جیسے ☆ فضا میں کیف سحر ہے جدھر کو دیکھتے ہیں
تو ایک تھا میرے اشعار میں ہزار ہوا ☆ اس اک چراغ سے کتنے چراغ جل اٹھے۔"[৪২]

রোমান্টিক কবি ফেরাক ইংরেজি কবিদের কবিতাগুলো খুব অধ্যয়ন করতেন। ইংরেজি কবিতার রোমান্টিকতা ফেরাক তার গজলে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। ফেরাক ভারতীয় সভ্যতায় ইংরেজি কবিদের রোমান্টিকতার রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তার গজলে এক অনন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ-

"زندگی کیا ہے اس کو آج اے دوست ☆ سوچ لیں اور اداس ہو جائیں
مہربانی کو محبت نہیں کہتے اے دوست ☆ آہ اب مجھ سے تری رنجش بے جا بھی نہیں۔"[৪৩]

প্রেম ও প্রেমের বিষয়গুলো ফেরাকের গজলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ফেরাক গোরাখপুরীর গজলে তার প্রেমিকার কথা উল্লেখ রয়েছে। তিনি তার প্রেমিকাকে গজলে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেন, তার প্রেমিকার হৃদয় সহজ সরল এবং সে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী নারী। তিনি তার প্রেমিকার দৈহিক সৌন্দর্যের বর্ণনা তার গজলে খুব সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। প্রেমিকার সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

"تمام بادہ بہاری تمام خندۂ گل ☆ شمیم زلف کی ٹھنڈک بدن کی آنچ نہ پوچھ
قبا میں جسم ہے یا شعلہ زیر پردہ ساز ☆ بدن سے لپٹے ہوئے پیرہن کی آنچ نہ پوچھ۔"[৪৪]

ফেরাকের গজলে তিনি তার প্রেমিকার সৌন্দর্যের এবং দৈহিক অবয়বের বর্ণনা দিয়েছেন। তবে তিনি তার গজলে সুন্দর মনের প্রেমিকার প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। ফেরাকের গজল পড়লে মনে হয় যেন তার প্রেমিকা জীবন্ত কোন মানবী। এ সম্বন্ধে কবি বলেন-

"پیکر یہ مہکتا ہے کہ گلزار ارم ہے ☆ یہ عضو چہکتا ہے کہ ہے صوت ہزاراں
زیر و بم سینہ میں وہ موسیقی بے صوت ☆ یہ پنکھڑی ہونٹوں کی ہے گلزار بداماں۔"[৪৫]

ফেরাক গোরাখপুরী প্রেমের একজন মূর্ত প্রতীক। তিনি প্রেমকে তার গজলে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যেন ভালোবাসা সবকিছুর উর্ধ্বে, ভালোবাসার রঙে তিনি সবকিছু রাঙ্গিয়ে দেন। তিনি মনে করেন প্রেম করা কোন গোনাহের কাজ নয় বরং এক ধরনের শক্তি। এতে রয়েছে মানব প্রশান্তি এবং মানুষকে ভালোবাসার অফুরন্ত সৌন্দর্য। কবি বলেন-

"کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں
عشق توفیق ہے گناہ نہیں

نفس پرستی پاک محبت بن جاتی ہے جب کوئی
وصل کی جسمانی لذت سے روحانی کیفیت سے۔"[৪৬]

ফেরাকের প্রেম একটি চরিত্র। তিনি এই চরিত্রটিকে তার গজলে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি এই চরিত্র এমনভাবে তার গজলে তুলে ধরেছেন যেন তার প্রেম অতি গভীর। তিনি তার প্রেমিকার একাকীত্ব দেখতে পারতেন না। আর সেই কারণেই তিনি গজলে এই পংক্তি তুলে ধরেছেন-

"کہاں کا وصل تنہائی نے شاید بھیں بدلا ہے ☆ ترے دم بھر کے مل جانے کو ہم بھی کیا سمجھتے ہیں۔"[৪৭]

ফেরাকের গজলে প্রেমিকার সৌন্দর্য, প্রেমিকার ভালোবাসা যেমন আছে তেমনি প্রেমিকার কাছে থেকে দূরে যাওয়ার পরে প্রেমিকের মনে যে ধ্যান-ধারণা বা চিন্তা-ভাবনা আসে, তার মনে যে কষ্ট আছে, তা তার গজলে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। যেমন-

"دل دکھ کے رہ گیا یہ الگ بات ہے مگر ☆ ہم بھی ترے خیال سے مسرور ہو گئے
ارے خود اپنا قریب نگاہ کیا کم ہے ☆ یہ کیا ضرور کہ اس کی نظر کے دھوکے کھاؤ۔"[৪৮]

প্রেমিকার কাছ থেকে দূরে যাওয়ার পরে প্রেমিকার কথা কবির বারবার মনে পড়ে এ কারণে কবি বলেছেন-

ترے پہلو میں کیوں ہوتا ہے محسوس ☆ کہ تجھ سے دور ہوتا جا رہا ہوں
ایسی راتیں بھی ہو پہ گزری ہیں ☆ تیرے پہلو میں تیری یاد آئی۔[৪৯]

ফেরাকের গজলে প্রেমের সাথে সাথে যৌনতার বিষয়টিও চলে আসে। তিনি তার গজলে যৌনতা সম্পর্কে যা তুলে ধরেছেন তা হলো-

لاجواب انداز سے طے کیا ہے
ایک مدتسے تری یاد بھی آئی نہ ہمیں
اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔[৫০]

ফেরাকের গজল পড়লে বোঝা যায় যে, তিনি শুধু প্রেমের বিষয়গুলোকে তার গজলে তুলে ধরেননি, শুধু একজন মানুষ তার প্রেমের বিষয় নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্যও তার প্রেমের বিষয়। তিনি প্রকৃতিপ্রেমী ছিলেন। তিনি প্রকৃতিকে খুব ভালোবাসতেন। তাই তিনি প্রকৃতি নিয়ে অনেক গজল লিখেছেন। প্রকৃতির দৃশ্য দেখাতে গিয়ে তিনি বলেন-

روک تھام ایسی ہے نکھرے جسم کے ہر لوچ میں ☆ جیسے اک دنیائے رنگ وبو ہو گہرے سوچ میں
لب نگار ہیں یا شعلہ نوائے بہار ☆ سکوت ناز ہے یا کوئی مطلب رنگیں۔[৫১]

ফেরাকের গজলে মানুষের জীবন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। তিনি মানুষকে অনেক মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেকটি মানুষকে মনে করতেন তার গজলের মুল অভিপ্রায়। তিনি মানুষকে গভীরভাবে অনুসন্ধান করতেন এবং তা তার গজলে তুলে ধরতেন। তার গজলে মানুষকে, মানুষের আবেগকে প্রাধান্য দিতেন। মানুষ আবেগের বসে অনেক কিছুই করে থাকে। তিনি তার গজলে মানুষ সম্বন্ধে লিখেছেন। যেমন-

ظلمت ونور میں کچھ نہ محبت کو ملا ☆ آج تک ایک دھندلکے کا سماں ہے کہ جو تھا
اسی عالم کے کچھ نقش ونگار اشعار ہیں میرے ☆ جو پیدا ہو رہا ہے حق وباطل کے تصادم سے۔[৫২]

ফেরাকের গজলে মানব প্রেমের সাথে সাথে দেশপ্রেমও ছিল। তিনি তার গজলে দেশের বিষয়ে খুব একটা বেশি লিখেননি, তবুও যতটুকু লিখেছেন তা তার দেশপ্রেমেরই বহিঃপ্রকাশ। দেশপ্রেম সম্বন্ধে তার গজলে তিনি বলেন-

کرد کچھ سرزمین ہند کی بات ☆ سنا ہے خاک اس کی سیمیار ہے
ارض جنت کے بھی بس میں نہیں حسن کا دنیا ☆ ہند کی خاک نے وہ سوز وطن مجھ کو دیا۔[৫৩]

ফেরাক গোরাখপুরী যদিও প্রেমিক কবি তবুও তিনি কিছু আন্দোলনের কথাও তার গজলে তুলে ধরেছেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতা পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী মানুষ। তিনি তার জীবনে অনেক যুদ্ধ এবং লড়াই করেছেন। তাই তিনি রাজনৈতিক বিষয়টিও তার গজলে তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে। তিনি বলেন-

اہل زنداں کی یہ محفل ہے ثبوت اس کا فراق ☆ کہ بکھر کر بھی یہ شیرازہ پریشاں نہ ہوا
آنے وہ وقت ہو گی بہار چمن کی بات ☆ اہل وطن ابھی نہ اٹھائیں وطن کی بات۔[৫৪]

তার গজলে অত্যন্ত বিস্ময়কর গুণ রয়েছে। গজলগুলো কবির কাছে অত্যন্ত আবেদনময়, তাই তার কথায়, শব্দের সংমিশ্রণে এবং প্রেমের নরম গুণাবলীর কথা ফেরাকের গজলে সুস্পষ্টভাবে শান্ত ও স্বাচ্ছন্দময় হিসেবে স্বীকৃত। তার গজলের মাধ্যমে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যেখানে প্রেমীদের অন্তনির্মিত কবিতা থেকে প্রেম এবং কবিতা ফুটে উঠেছে। তার গজলগুলো কেবল হৃদয়ের গভীরতায় পৌঁছেনা ব্যথা ও যন্ত্রণার সাথেও পরিচিত হয়।

তিলোকচাঁদ মাহরুম: তিলোকচাঁদ মাহরুম ছিলেন একজন বিখ্যাত উর্দু কবি। তার আসল নাম ছিল তিলোকচাঁদ এবং মাহরুম ছিল উপাধি।[৫৫] তিনি ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে মিয়ানওয়ালী জেলার তহসীল ঈসা খেল একটি ছোটগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৫৬] তার বাবার নাম ভগতরাম দয়াল। তার মাতৃভাষা ছিল পাঞ্জাবি।[৫৭] তিনি ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী এবং পরিশ্রমী ছিলেন। সে কারণে তিনি পঞ্চম এবং অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পেয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি যে জেলায় ছিলেন সেখানে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল না। তাই তাকে তাদের এলাকা থেকে সতের মাইল দূরে কাটুরিয়া জোবলী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। তিনি সেখান থেকে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর তিনি এফ. এ এবং বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেন।[৫৮] ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডেরা ইসমাঈল খান মিশন উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন।[৫৯] ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রথম বিয়ে করেন এবং বিবাহের পাঁচ বছর পরে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তার স্ত্রী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। তার পক্ষ থেকে এক ছেলে এবং তিন মেয়ে হয়। ছেলেটি হচ্ছে বিখ্যাত কবি জগন্নাথ আজাদ।[৬০] তিনি দিল্লীতে ৬ই জানুয়ারি ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৬১]

তিলোকচাঁদ মাহরুম যে সময়ে গজল লিখা শুরু করেছিলেন, সেই সময়ে ইকবাল এবং হালিও গজল লিখতেন। সেই সময়ে বেশিরভাগ গজলই প্রেম ও নারী বিষয়ক ছিল। কিন্তু আলতাফ হোসাইন হালি গজলে সংস্কার নিয়ে এসেছেন। সেই সংস্কারের ধারা মাহরুমও অনুসরণ করেন। তিনি শুধু প্রেমিকার বিষয়ে গজল লিখতেন তা নয়; তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর গজল লিখতেন। তার গজলে প্রেম ও ভালোবাসার সাথে সাথে সভ্যতা, দর্শন, মাজহাব, রাজনৈতিক ও দেশপ্রেমের বিষয় ছিল।[৬২] মাহরুমের গজলের সবচেয়ে ভালো দিক হলো তার গজলে পবিত্রতা রয়েছে। এই পবিত্রতা দিয়ে তিনি গজলকে রাঙ্গিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ তার গজলের দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত হলো-

سبک ہے یا گراں اے زندگی آخر ہے تو اپنی ☆ تجھے اپنائیں گے تجھ سے رہیں گے سر گراں کب تک
صلہ حسن عمل کا فون دل ہے اس زمانے میں ☆ مرے کام آئیگی رنگینی حسن بیاں کب تک۔[৬৩]

মাহরুমের গজলে ভালোবাসার বর্ণনা রয়েছে। তার ভালোবাসার গজলগুলো পড়লে পাঠকমনে ভালোবাসার গতি সঞ্চার হয়। যেমন-

گلشن میں جیسے پھول سے یاد صبا ملے ☆ بالائے بام تم ہو کہ ماہ تمام ہے
کیسی یہ زیر بام نمایاں ہے چاندنی ☆ مزے کی چیز ہے ترک تمنا اور ریاضت بھی
مگر کچھ کم نہیں ہے لذت درد محبت بھی۔[৬৪]

মাহরুমের জীবনের বেশিরভাগ সময় দুঃখ-কষ্টে কেটেছিল। একদিকে তার স্ত্রী ও বাচ্চাদের মৃত্যু এবং অন্যদিকে বন্ধু ও প্রিয়জনদের কাছ থেকে কষ্ট এবং সেই সময়ে দেশের রাজনৈতিক অবস্থা এই সবকিছুই তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে দিয়েছিল। এই কষ্ট থেকেই তিনি গজল লিখার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ-

اچھاہواکہ موت نے مجھ کو مٹادیا☆میں داغ ننگ تھا سر دامان زندگی
نغمے سمجھو رہاہے انھیں ناسخن شناس☆ مجموعہ مرثیوں کا ہے دیوان زندگی۔[৬৫]

মাহরুম একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি তার দেশের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। মাহরুম যে সময়ে গজল লিখেছেন সেই সময়ে দেশপ্রেমের উপর কোন গজল লিখা হতো না; কিন্তু মাহরুম এই বিষয়ের উপর সেই সময়ে গজল লিখে গজলের মান উন্নততর করে দিয়েছেন। মাতৃভূমি সবার কাছেই প্রিয়। কবি তার দেশকে জান্নাতের সাথে তুলনা করেছেন। দেশের জন্য সবার মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং দেশের স্মৃতি সবার মনের মধ্যে গেথে থাকে। তিনি বলেন-

ہوں وشت و کوہ یاچن اے مادرِ وطن ☆ جنت ہے تیراسایۂ دامن جہان ملے
دل ستم زدہ پر بجلیاں گراتی ہیں ☆ قفس میں یاد جو آتی ہے آشیانے کی۔[৬৬]

তিনি কলমের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন। তার গজলের মাধ্যমে তিনি বিপ্লবকে সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছি দিয়েছেন। যেমন-

بدل گئی ہے کچھ ایسی فضازمانے کی☆خوشی کسی کو نہیں فصل گل کے آنے کی
ابھی اندیشہ تاراج خزاں باقی ہے☆وقت ہنسنے کا نہیں اے گل شاداب بھی۔[৬৭]

আনন্দ নারায়ণ মোল্লাঃ উর্দু কাব্যসাহিত্যে আনন্দ নারায়ণ মোল্লা সাহেবের অবদান অবিস্মরণীয়। তার অনেক কবিতা চাকবাস্ত এবং ইকবালের কবিতার সঙ্গে মিল রয়েছে। তিনি নজম, কেতআ, রূবাঈ, মারছিয়া ইত্যাদি লিখে উর্দু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। আনন্দ নারায়ণ মোল্লা ২২ অক্টোবর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মৌতে নিজ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।[৬৮] তার বাবার নাম জগত নারায়ণ মোল্লা। তিনি মর্যাদাবান এবং বিখ্যাত অ্যাডভোকেট ছিলেন।[৬৯] আনন্দ নারায়ণ মোল্লার পড়াশোনা লক্ষ্মৌতে হয়েছিল। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে খুব মর্যাদার সাথে এম এ পরীক্ষায় পাস করেন। তারপরে তিনি এল. এল. বি কোর্সে ভর্তি হন এবং ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এল.এল.বি অনেক ভালো নাম্বার নিয়ে পাস করেন।[৭০] মোল্লা সাহেব ছাত্র অবস্থায় কবিতা বলা শুরু করেন। তিনি ইংরেজি কবিতা

থেকে প্রভাবিত হয়েই কবিতার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি অনেক চমৎকার কবিতা লিখতেন। ঐ সময় বিখ্যাত কবিদের মধ্যে জিগর মুরাদাবাদী তার কবিতা শুনে অনেক প্রশংসা করেছেন। কিন্তু তার বাবা চাইতেন যে তিনি উকিল পেশা গ্রহণ করুক। তাই মোল্লা সাহেব তার বাবার কথা মতো উকিল পেশার সাথে কবিতা লেখা চালিয়ে গেছেন। তিনি এক সময় ওকালতি পেশায় এত খ্যাতি অর্জন করেছেন যে, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি এলাহাবাদের হাই কোর্টের জজ হিসেবে নিযুক্ত হন।[৭১] আনন্দ নারায়ণ মোল্লা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে উর্দুতে কবিতা লিখা শুরু করেন।[৭২] আনন্দ নারায়ণ মোল্লা সাহেব জীবনের বেশিরভাগ সময় লক্ষ্মৌতে কাটিয়েছেন; কিন্তু তিনি লক্ষ্মৌতে বসবাসকারী কোন কবি দ্বারা প্রভাবিত হননি। তিনি গালিব এবং ইকবালের গজলের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

মোল্লা সাহেবের গজল সম্বন্ধে আজিমুল হক জুনায়দী বলেছেন-

ان کی غزلوں میں متانت اور سنجید گی ہے۔ ان کے اظہار عشق میں بھی ایک خاص قسم کا وقار ہوتا ہے۔ ان کی غزلوں کی معنویت اور طرز ادا کی متانت دل ودماغ دونوں کو متاثر کرتی ہے۔[৭৩]

আনন্দ নারায়ণ মোল্লা সাহেবের গজলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সৌন্দর্য এবং আবেগ। তিনি সৌদর্যকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তার গজলের মাধ্যমে বলেন-

آج اک غرور حسن بھی شامل ہے حسن میں ☆ شاید کسی نگاہ کا کچھ بھید پا گئے۔[৭৪]

আনন্দ নারায়ণ মোল্লা প্রেম বিষয়ক গজল লিখেছেন। তিনি তার প্রেমিকাকে অনেক সুন্দর মনে দেখতেন। তিনি বলতেন তুমি আমার কাছে আসো বা না আসো তুমি ভালো থেকো। তোমার আসার অপেক্ষায় আমি আছি। কবি বলেন-

نہیں میں پیار کے قابل، تو مجھ کو پیار نہ کر ☆ مگر نگاہ ترحم سے سرشار نہ کر
آئے ہو کیا تمہیں، مجھے آواز دو ذرا ☆ آنکھوں کا نور چھین لیا انتظار نے۔[৭৫]

মোল্লা সাহেবের মাজহাবের কোন প্রভাব ছিল না; কিন্তু গজলের কোন জায়গায় তিনি মাজহাবকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তার মাজহাবের নাম হচ্ছে মানবপ্রেম। প্রত্যেক কবি মানবপ্রেম সম্বন্ধে কবিতা বলেছেন বা লিখেছেন। কিন্তু মোল্লা সাহেব যেভাবে এ বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা গালিবের পরেই তার অবস্থান। মানবপ্রেম সম্বন্ধে তার গজলে তিনি বলেন-

بشر کو مشعل ایمان سے آگہی نہ ملی ☆ دھواں وہ تھا کہ نگاہوں کو روشنی نہ ملی
ابھی روے حقیقت پر پڑا ہے پڑہ ایمان ☆ ابھی انسان فقط ہندو مسلماں ہے جہاں میں۔[৭৬]

আনন্দ নারায়ণ মোল্লার ভাষা ছিল সহজ-সরল এবং সাবলীল। তিনি তার গজলে মহাবেরা[৭৭] এবং তাশবীহাত[৭৮] ব্যবহার করতেন এবং ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী তিনি গজল লিখতেন। উদাহরণস্বরূপ-

اس مے کو نہ پی قطرہ قطرہ کن کن کے نہ لے سانیسی اپنی ☆ جینا ہے تو جی جینے کی طرح، جینے کا فقط الزام نہ لے
رہروی سے نہ رہ نمائی ہے آج دور شکستہ پائی ہے۔[৭৯]

মোল্লা সাহেব গজল আবৃত্তি করতেন। তিনি গজলকে উর্দু সাহিত্যের প্রাণ মনে করতেন। তিনি মনে করেন উর্দু সাহিত্য থেকে গজল বাদ দিলে উর্দু ভাষার অস্তিত্ব থাকবে না। তিনি গজলকে সভ্যতা এবং সম্মানের নিদর্শন মনে করতেন।

মুন্সী সুরজ নারায়ণ মেহেরঃ মুন্সী সুরজ নারায়ণ মেহের দাগ এবং তার সম-সাময়িকদের মধ্যে অন্যতম। তবে তিনি যে কবিদের মধ্যে দাগকে অনুসরণ করেন তাদের মধ্যে তিনি অন্যতম। সেই সময়ে মেহের দাগের কবিতার রং অনুসরণ করার পরিবর্তে সাধারণ কাব্য রীতিতে প্রবাহিত না হয়ে সুফিবাদের রং গ্রহণ করেছেন এবং সত্য ও ধর্মতত্ত্বের বিষয়গুলোকে তার কবিতার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন। তার কবিতার কারণে তাকে "বেদ রতন"ও বলা হতো।[৮০] তার আসল নাম মুন্সী সুরজ নারায়ণ এবং মেহের তার উপাধি। তিনি ১৩ই নভেম্বর ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১২ই মে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের লাহোরে মৃত্যুবরণ করেন।[৮১] উর্দু কাব্যসাহিত্যে সুরজ নারায়ণ মেহের কবিতার প্রায় সব শাখায় বিচরণ করেছেন। যেমন গজল, মছনবী, নজম ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার গজলের ভাষা ছিল সহজ-সরল এবং পবিত্র। তার ভাষা হচ্ছে আত্মশুদ্ধির আয়নাস্বরূপ। তিনি তার জীবনে অনেক গজল লিখেছেন, যা উর্দু কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধির দ্বারে উন্নীত করেছে। তার গজলের সংগ্রহ হলো غزلیات مہر 'গজলিয়াতে মেহের'।

প্রকাশ নাথ পারভেজঃ প্রকাশ নাথ পারভেজ ২৫ শে অক্টোবর ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে কসবা রামদাস জেলা আমৃতসরে জন্মগ্রহণ করেন।[৮২] তার পিতার নাম লালারামজি দাস। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মেট্রিক পাস করেন এবং ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাজিল এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে এম. এ. পাস করেন। তিনি উর্দু ও ফারসি ভাষাও জানতেন। ছোটবেলা থেকেই তার কবিতা বলার খুব ইচ্ছা ছিল। তার প্রথম কবিতা ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন তার বয়স ছিল ১৪ বছর। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে হযরত আল্লামা ইব্রাহাসনী কানুয়ারীর কাছ থেকে কবিতার শিক্ষা অর্জন করেন। তার গজলের বই جادہ منزل (জাদায়ে মঞ্জিল) ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৮৩]

বেইতাব আলীপুরী রমানন্দঃ বেইতাব আলীপুরী রমানন্দ একজন প্রখ্যাত গজলকার ছিলেন। তিনি ১৭ই মার্চ ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে আলীপুর জেলা মুজাফফরগড় (পাকিস্তানে) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ডক্টর আসনন্দ আলীপুরী।[৮৪] দেশভাগ হওয়ার পরে তিনি পানিপথে বাস করতেন। তিনি বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ছোটবেলা থেকেই তার কবিতার শখ ছিল। প্রথমে তিনি হযরত জোশ মালিহাবাদী ও শাহেদ আলীপুরীর কাছে কবিতা শেখেন এবং এরপরে রামদাস ও গোলাম হুসাইন রইস নিয়াজীর সঙ্গে কবিতা লিখেন। কবিতার মধ্যে তিনি গজলে খুব পারদর্শী ছিলেন। তার গজলের غنچہ وگل (গুঞ্চা ও গুল), بیتابیاں اور سوغات (বেতাবীয়াঁ অওর সওগাত) একত্রিত বই।

খাজা চাঁদঃ খাজা চাঁদ উর্দু কাব্যসাহিত্যে এক বিশিষ্ট নাম। খাজা চাঁদ ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রামনগর জেলা জারাতুওয়ালা (পাকিস্তানে) জন্মগ্রহণ করেন। হযরত জোশ মালিহাবাদীর কাছ থেকে কবিতার শিক্ষা অর্জন করেছেন। তিনি পদ্য সাহিত্যে অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। তিনি গজলে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তবে গজলে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তার গজলের একত্রিত বইগুলো হলো- پھولوں کے چراغ (ফুলোঁ কে চেরাগ), شگوفے (শুকুনে), تنکے (তানকে)। তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৮৫]

গোপাল মিত্তলঃ গোপাল মিত্তল ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ৪জুন, পাঞ্জাবের মালির কৌটালায় জন্মগ্রহণ করেন।[৮৬] তিনি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই এপ্রিল দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার আসল নাম মদন গোপাল এবং সাহিত্যিক নাম গোপাল মিত্তল। তিনি মালির কৌটালা হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। তারপর সনাতন ধর্ম কলেজ লাহোর থেকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কাব্যসাহিত্যের গজলে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তার গজলের সংগ্রহ হলো- دوراہا (দোরাহা) এবং صحرا میں اذان (সেহরা মে আযান)।[৮৭]

জিয়া ফতেহ আবাদীঃ জিয়া ফতেহ আবাদী ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ৯ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে ১৯ আগস্ট দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার আসল নাম মেহেরলাল সোনী। তার পিতা সংগীতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ১৯২০ খ্রি. থেকে ১৯২৩ খ্রি. পর্যন্ত খানসা মিডল স্কুল পেশায়ার থেকে নেন। তারপর জয়পুর রাজস্থান মহারাজা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে মেট্রিক পাস করেন। তিনি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে চলে আসেন। তারপর ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ফারমন ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে ফারসিতে বি. এ পাস করেন এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজিতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কলেজ ম্যাগাজিনের উর্দু সম্পাদক ছিলেন। তিনি

ইংরেজি, ফারসি, উর্দু ও সংস্কৃত ভাষায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি গোলাম কাদির ফরখ অমৃতসরের শিষ্য ছিলেন। জিয়া ফতেহ আবাদী কাব্য ও গদ্য সাহিত্যে অসামান্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি গজল, নজম, রুবাঈ এবং কেতআ লিখেছেন। তবে গজলের প্রতি তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন। তার গজলের সংগ্রহ হলো- حسن غزل (হুসনে গজল) যা ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে আনবালায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৮৮]

পণ্ডিত রাঘুন্দর রাওঃ পণ্ডিত রাঘুন্দর রাও ২০ এপ্রিল ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে কর্ণাটকে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম পণ্ডিত রাম রাও। তিনি সফল উকিল ছিলেন। নগরের এক ব্রাহ্মণ নারী সিইতাবাঈ তাকে দত্তক নিয়েছে। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আলীমপুর থেকে হায়দ্রাবাদে চলে আসেন। তিনি মাওলানা আহমদ হুসেন সৌকত মিরঠীর কাছ থেকে কবিতার জন্য পরামর্শ নিতেন। তিনি গোলাম মোহাম্মদ আরফ এবং সৈয়দ নাজির হুসেনের কাছ থেকে কবিতার শিক্ষা অর্জন করেছেন। তিনি গজলও লিখেছেন। তার গজলের একত্রিত বই ساز غزل(সাজ গজল) ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়েছিল। তিনি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ২৮ শে ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।[৮৯]

জোশ বাদীউনী রাধা রমনঃ জোশ বাদীউনী রাধা রমন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ১৯ শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গঙ্গা রাম। পাঁচ বছর বয়সে তিনি পড়াশুনা শুরু করেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তার পিতার মৃত্যুর পরে তার পড়াশুনা থেমে যায়। তারপর তিনি আবার পড়াশুনা শুরু করেন ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মেট্রিক পাস করেন। তার একবছর পর তিনি কালেক্টর পদে চাকরি করেন। জোশ বাদীউনী ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে কবিতা লেখা শুরু করেন। প্রথমে কয়েক লাইন লিখে তিনি নারায়ণ জোহর বাদাউনীকে দেখিয়েছিলেন। তারপর থেকে তার কবিতার চর্চা শুরু হয়। তিনি না'ত ও গজল লিখেছেন। তার গজলের বই آتش خاموش (আতিশ খামুশ) প্রকাশিত হয়েছিল।[৯০]

***জোহর বাজনুরী* চন্দর প্রকাশঃ** *জোহর বাজনুরী* চন্দর প্রকাশ একজন বিখ্যাত গজলকার। উপাধি *জোহর* । জনাব চন্দর প্রকাশ ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে বাজনরের এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৯১] তার পিতার নাম পণ্ডিত রাম চাঁদ। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে চাকরির জন্য তাকে মীরাঠিতে চলে আসতে হয়। এখানে এসে তিনি সাহিত্য লেখায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এখানে তিনি জনাব এজাহার হুসাইন খান এর সঙ্গে থাকেন। তার সাহচর্যে এসে তিনি কবিতা বলতে শুরু করেন। কবিতার বিভিন্ন শাখায় তিনি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছেন; কিন্তু গজল তার খুব ভাল লাগতো। তার গজলের বই হচ্ছে- اوراق گل (আওরাকে গুল)।

তার গজলের বৈশিষ্ট্যে তুলে ধরতে গিয়ে জগন্নাথ আজাদ বলেছেন-

جوہر بجنوری کی غزل روایت کے احترام کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ لیکن روایت کا احترام اپنی حدوں میں رہا ہے اور یہی جوہر صاحب کی غزل کا حسن ہے۔[৯২]

জোহর বাজনুরী তার গজলে মানুষকে যে কোন পরিস্থিতিতে দুঃখ-কষ্ট নিয়ে বেঁচে থাকতে ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেন-

جس دور میں جینا کو آسان نہیں ہے ☆ اس دور سے جینا کا صلہ مانگ رہا ہوں
دل میں ہے مرے جذبۂ تعمیر محبت ☆ انسان ہوں انسان کا غم لے کہ اٹھا ہوں۔[৯৩]

সাহের হোসিয়ারপুরীঃ সাহের হোসিয়ারপুরী অওম প্রকাশ একজন অতি পরিচিত গজলকার। তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ৫ই মার্চ হোসিয়ারপুরের এক শিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহের হোসিয়ারপুরী নামে পরিচিত। তিনি প্রাথমিক লেখাপড়া হোসিয়ারপুরে করেন এবং লাহোরে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে এম. এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। দেশ ভাগের পরে তিনি কানপুরে বাস করতে থাকেন এবং কবিতা রচনা করতে থাকেন। তিনি গজলে অনেক বেশি বিখ্যাত ছিলেন। তার গজলের বই سحر غزل (সেহরে গজল) ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৯৪]

ছাবের আবু হরীঃ ছাবের আবু হরী ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ধরমপুর জেলা ফিরোজপুর ভারতে এক জমিদার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক লেখা-পড়া নিজের গৃহে হয় এবং পরে লাহোরে গিয়ে বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর তিনি ভারতে এসে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজাবাদে মৃত্যুবরণ করেন। ছাবের আবু হরী সেই সময়ে গালিব, হাফিজ, মাওলানা রুমী এবং ইংরেজি কবিতা পছন্দ করতেন। উর্দু ছাড়াও তিনি ফারসি, হিন্দি, ইংরেজি, সংস্কৃত এবং আরবি ভাষা জানতেন। জনাব ছাবের আবু হরীর দুইটি বই রয়েছে- نوائے یقین (তুআয়ে ইয়ুন) ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে এবং نوائے شوق (তুআয়ে শোক) ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে গজল, কেতআ এবং মানজুমাত।[৯৫]

জনাব বেনারসীঃ জনাব বেনারসী একজন বিখ্যাত গজলকার। তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কসবায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিতা শুরু করেন ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে। তিনি সরকারি কলেজ আলীগড়ে দশ বছর চাকরি করেন এবং দিল্লীতে বসবাস করেন। তিনি জোশ মালিহাবাদীর কাছ থেকে কবিতার

শিক্ষা নিয়েছেন। তিনি গজল লিখে উর্দু কাব্যসাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার গজলের বইয়ের নাম হচ্ছে- دل کی آواز (দিল কি আওয়াজ)।[৯৬]

কৃষণ লাল মোহনঃ কৃষণ লাল মোহন উর্দু কাব্যসাহিত্যে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। ক্রিশন লাল মোহন ২৮ শে নভেম্বর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন।[৯৭] তিনি ইংরেজিতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ফারসি ও আরবি জানতেন। তার গজলের বইগুলো হলো- دلِ نادان (দিলে নাদান), تماشائی (তামাশায়ী), شبنم شبنم (শবনম শনবম)। তিনি গজল লিখে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন।

নানক লক্ষ্মৌবীঃ নানক লক্ষ্মৌবী একজন সুপরিচিত গজলকার ছিলেন। নানক লক্ষ্মৌবী চকমহল্লা বাহুওন টোলাতে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম রাজা রাম। তিনি ২১ বছর বয়সে কবিতা লিখতে শুরু করেন।[৯৮] তিনি গালিব, জোক, মোমিন, আমীর প্রমুখ কবিদের এক হাজারেরও বেশি গজল মুখস্থ করেছিলেন; কিন্তু এখন তার নিজের গজলের কথা রয়েছে। নানকের গজলের নমুনাস্বরূপ একটি পংক্তি উদ্ধৃত হলো-

ہوں وہ میکش بعد مردن یہ اثر ہے خاک میں ☆ جو بنا ساغر مری گل کا وہ جام جم ہوا۔[৯৯]

নানক লক্ষ্মৌবী গজল লিখেছেন। তার গজলের সংগ্রহ- مطلع خورشید (মাতলা খুরশীদ) নামে বেনারসের সুলাইমানী প্রেস থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল যাতে দুই হাজার 'আশ'আর' রয়েছে।

২.২ নজম

নজম গজলের মতোই পুরানো একটি শাখা। গজলের পরে কাব্যসাহিত্যে নজমের স্থান। নজম এক ধরনের কবিতা যা একক শিরোনামে একটি বিষয়ে রচিত হয়। নজম কাব্যের ঐ শাখা, যার মধ্যে কোন কাহিনি, কোন ঘটনা, কোন অনুভূতি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়, যার এক লাইনের সাথে আরেক লাইনের সাদৃশ্য অত্যাবশ্যক। উর্দুতে প্রথমে নজমের সীমাবদ্ধতা ছিল। তারপর ধীরে ধীরে তা প্রসারিত হয়। উর্দুতে প্রায় সব কবিই নজম লিখেছেন এবং উর্দু নজমকে সামনে নিয়ে গেছেন। মুসলিম কবিরা যেমন উর্দু নজমে অবদান রেখেছেন, অমুসলিম কবিরাও এই শাখার উন্নতিতে অবদান রেখেছেন।

ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্তঃ ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত কবিতা ভাবাপন্ন একজন ব্যক্তি ছিলেন। চাকবাস্ত মীর আনিস ও দবিরের কবিতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন যা তাকে যথেষ্ট সাফল্য এনে দিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর শারব রাদুলুবি 'চাকবাস্ত কি শায়েরানা আহমিয়্যাত' প্রবন্ধে লিখেছেন-

"مسدس کی ہیئت لکھنو کے محاورے، زبان کے انداز اور بعض خاص تراکیب استعمال کی وجہ سے کہیں کہیں ان کے یہاں انیس و دبیر کا اثر معلوم ہونے لگتا ہے۔"[১০০]

চাকবাস্তের সকল কবিতায় দেশপ্রেমের চেতনা প্রস্ফুটিত হয়। তার কবিতা পড়লে মনে হয় তার সকল চেতনা দেশপ্রেমকে নিয়ে। দেশপ্রেমের বিষয়টি নিয়ে তার অনুরাগী নজমের মাধ্যমে ভারতীয়দের হৃদয়ে দেশপ্রেমের সত্যিকারের ভালোবাসা বিকশিত করেছেন। নজমের মাধ্যমে কবি যে অনুভূতিগুলো উপস্থাপন করেছিলেন, তা মানুষের হৃদয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। মাত্র ৪৪ বছর বয়স পেয়ে চাকবাস্ত জাতীয় ও দেশের কবিতার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনাকে শক্তিশালী করেছিলেন। তিনি ১২ বছর বয়সে حب قومی (হুব্বে কওমী) নজমটি লিখেছিলেন, যা সহজভাবে দেশপ্রেমের অনুভূতি প্রকাশ করে। তিনি বলেন-

حب قومی کا زبان پر ان دنوں افسانہ ہے ☆ بادۂ الفت سے پر دل کا مرے پیمانہ ہے
جس جگہ دیکھو محبت کا وہاں افسانہ ہے ☆ عشق میں اپنے وطن کے ہر بشر دیوانہ ہے۔[১০১]

চাকবাস্ত দেশপ্রেমের উপর অনেকগুলো নজম লিখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নজম হলো- خاکِ ہند (খাকে হিন্দ), যা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতাটি বিশেষ করে একটি দেশপ্রেমের কবিতা। একটি দুর্দান্ত শৈল্পিক উপায়ে কবি এই নজমটি রচনা করেছেন। দেশের উজ্জ্বল অতীতের আধ্যাত্মিক মহিমা এবং স্বদেশের মহান নেতারা যারা আলোকিত আলো, এগুলো তিনি সুন্দরভাবে এই নজমে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ নজমে তিনি বলেন-

اے خاک ہند تیری عظمت میں کیا گماں ہے ☆ دریائے فیض قدرت تیرے لئے رواں ہے
ہر صبح ہے یہ خدمت چورشید پر ضیا کی ☆ کرنوں سے گوندھتا ہے چوٹی ہمالیا کی۔[১০২]

'খাকে হিন্দ' কবিতা ছাড়াও দেশপ্রেমের উপর তার আরো অনেক নজম রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে যে নজম না উল্লেখ করলেই নয়, সেটি হলো- ہمارا وطن دل سے پیارا وطن (হামারা ওয়াতন দিল সে পেয়ারা ওয়াতন), যা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এ কবিতাতেও তিনি দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। তিনি যে দেশকে ভালোবাসতেন, দেশের মানুষকে নিয়ে ভাবতেন, দেশের

মাটিকে তিনি আপন মনে করতেন, তার এই নজমের মাধ্যমে সহজে বোঝা যায়। এই নজমে কবি বলেন-

یہ ہندوستان ہے ہمارا ہے ہمارا وطن☆محبت کی آنکھوں کا تارا وطن
ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔[১০৩]

চাকবাস্ত কাব্যসাহিত্যে একজন উজ্জ্বল কবি। তিনি তার নজমের মাধ্যমে দেশের মানুষকে দেশপ্রেমের দাওয়াত দিতেন এবং মানুষকে বুঝাতেন যে, দেশ হচ্ছে মানুষের জন্য মঙ্গলময়। তিনি দেশপ্রেমের উপর অনেকগুলো কবিতা রচনা করেছেন, তার মধ্যে বিশিষ্ট একটি কবিতা হলো- وطن کو ہم وطن ہم کو مبارک (ওয়াতন কো হাম ওয়াতন হাম কো মুবারক), যা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এ কবিতার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তিনি নিজের দেশকে মঙ্গলময় মনে করতেন। দেশের মানুষকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আর সে জন্যই তিনি দেশের প্রতি লক্ষ্য রেখেই এই নজম রচনা করেছেন। তিনি তার দেশকে অত্যন্ত সুন্দর ও প্রিয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন-

یہ پیاری انجمن ہم کو مبارک☆یہ الفت کا چمن ہم کو مبارک
وطن کو ہم وطن ہم کو مبارک۔[১০৪]

চাকবাস্ত দেশপ্রেম ছাড়াও দেশের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। তিনি দেশের চিত্র এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেন মনে হয় একটি জীবন্ত চিত্র। চিত্রের ঐতিহ্যটি রবারবই উর্দুতে প্রিয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের এত সুন্দর কমনীয় চিত্র উপস্থাপন করেছেন যে, সেগুলো আরো সুন্দর ও মোলায়েম দেখায়। উদাহরণ স্বরূপ তার একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো- جلوۂ صبح (জলোওয়ে সুবহে), যা ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতায় কবি বলেন-

خورشید منور کا دم جلوہ گری تھا☆نور رخ مہتاب چراغ سحری تھا۔[১০৫]

এই নজমে কবি একটি সুন্দর সকালের দৃশ্য উপস্থাপন করেছেন। পাখির হাট, সকালের হিমশীতল দৃশ্য, গাছপালার সমাবেশ এত সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর চিত্র এই নজমে কবি নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হলো- سیر دیرہ دون (সায়রে দেরাদুন), যা ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। নজমটি পড়ে মনে হয় যেন কোন শিল্পী দেরাদুনের পাহাড়, নদী, ঝর্ণা ইত্যাদির চিত্র এঁকেছেন। তিনি দেরাদুনের চিত্র আঁকতে গিয়ে বলেন-

گھنے درخت ہری جھاڑیاں زمین شاداب ☆ لطیف دسر وہوا پاک صاف چشمۂ آب
کمی کبھی نہیں شادابیوں کے ساماں میں ☆ ٹھہر گئی ہے بہار آکے اس گلستاں میں۔[১০৬]

এ জাতীয় নজম কেবল সেই কবিই লিখতে পারেন, যিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য পূজারী। এই লাইনগুলোর মাধ্যমে দেরাদুন পাহাড়ের সৌন্দর্যের প্রকৃত চিত্র চিত্রিত হয়েছে।

ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তিনি বিভিন্ন আঙ্গিকে নজম রচনা করেছেন। তার নজম لارڈ کرزن (লর্ড কার্জন) একটি স্বচ্ছ রঙের নজম বলে মনে হয়। এ নজমে চাকবাস্ত লর্ড কার্জনের ক্ষমতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তাকে ইংরেজ সরকারের একজন অনন্য অফিসার বলেছেন। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের উপর তার নজম বিশেষ করে মিসেস অ্যানি বেসেন্ট, মহাদেব গোবিন্দ রানা, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে এবং বাসন নারায়ণ ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্তের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নজম হলো- گائے (গায়ে), যা ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এ কবিতায় তিনি হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস অনুসারে একটি গরু একটি পবিত্র প্রাণী এবং এর অস্তিত্ব মায়ের ভালোবাসা এবং স্নেহ প্রদর্শন করে। হিন্দুরা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের পূজা-অর্চনা করে থাকে। এই কবিতায় গাভীটিকে বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন করা হয়েছে যার মর্যাদা মানুষের মর্যাদার সীমা ছাড়িয়ে যায়। একটি গাভী থেকে লাভের বিষয়ে এতই অতুক্তি করা হয়েছে যে বাস্তবের সাথে এর খুব কম মিল রয়েছে। এই নজমে তিনি গাভীকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

میرے دل میں ہے محبت کا تری سرمایا ☆ ماں کے دامن سے ہے بڑھ کر مجھے تیرا سایا
یاد ہے فیض طبیعت نے تجھ سے پایا ☆ عین قسمت جو ترا نام زبان پر آیا۔[১০৭]

চাকবাস্ত তার নজমগুলোতে যে বিষয়গুলো বেছে নিয়েছিলেন, তার বেশিরভাগই সমাজ ও রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত। তিনি এ বিষয়গুলো সফলভাবে মোকাবেলার চেষ্টা করেছেন।

উপরে উল্লেখিত নজম ছাড়াও তিনি আরও অসংখ্য নজম রচনা করেছেন। তার নজমের সংগ্রহ হলো- صبح وطن (সুবহে ওয়াতন)।

চাকবাস্ত একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি হিন্দু মুসলিম জোটের সমর্থক ছিলেন। তার নজমে কোন সম্প্রদায়িকতা দেখা যায় না। গোপীচাঁদ নারায়ণ এই প্রসঙ্গে বলেছেন-

وہ تسبیح اور زنار کے پھندے کے قائل نہیں تھے کیونکہ اس کی پیدا کی ہوئی تفریق تحریک آزادی کی رہ میں قدم قدم پر اڑچنیں پیدا کرتی تھی اور انگریزوں کے ہاتھ میں ہندوستان کو غلام رکھنے کے لئے ایک جربہ بن گئی تھی۔ چکبست دونوں مذہبوں کے ظاہری اختلاف اور تہذیبوں کی رنگارنگی کے قائل تھے۔ لیکن ان تمام رنگوں میں بنیادی نور تلاش کرنے کی دعوت دیتے تھے اور ایسا صرف کسی مشترکہ سیاسی تصور یا نصب العین کو اپنانے ہی سے ہو سکتا تھا۔[১০৮]

চাকবাস্তের দেশাত্মবোধক নজমগুলোর মূল বিষয় হলো, নজমগুলোতে দেশের মাটির সুগন্ধ রয়েছে। কবি দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে পছন্দ করেন এবং তিনি চান অন্য স্থানীয় নাগরিকরা তাদের জন্মভূমির মাটিকে ভালোবাসুক। তিনি বিপ্লবের বার্তা দেন। তিনি কেবল স্বদেশকে ভালোবাসেন এবং ভালোবাসা শেখান।

মোটকথা চাকবাস্তের নজম দেশপ্রেমে ভরপুর। তিনি তার নজমের মাধ্যমে তার দেশের জন্য একটি ভালোবাসা তৈরি করেছেন। তার নজমগুলো দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং ভৌগোলিক প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে। চাকবাস্তের স্বদেশের প্রতি তার গভীর মমতা নজমের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে চাকবাস্ত একজন দেশপ্রেমিক কবি হিসেবে উপস্থিত হন এবং তার নজম সর্বদা মানুষকে স্বদেশের ভালোবাসা শিক্ষা দিয়ে থাকে।

জগন্নাথ আজাদঃ জগন্নাথ আজাদ একাডেমিক ও সাহিত্যিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই পরিবেশের প্রভাবে শৈশব থেকে সাহিত্যের রুচি জন্ম হয়েছিল তার মধ্যে। জগন্নাথ আজাদ বংশানুক্রমিকভাবে কবি ছিলেন। কারণ তার বাবা একজন কবি ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি কবিদের সাহচর্যে ছিলেন। তিনি ইকবালের কবিতা খুব পছন্দ করতেন এবং তার ধারায় তিনি কবিতা চর্চা শুরু করেন। কবি প্রতিটি বিষয়ে কবিতা লিখতেন। তবে তার দৃষ্টি ছিল দেশপ্রেম ও দেশপ্রেমের দিকে। তিনি অনেকগুলো নজম লিখেছেন। জগন্নাথ আজাদ নজমে খুব পরিচিত একটি নাম।

জগন্নাথ আজাদ একজন সুপরিচিত কবি হলেও তিনি একজন দেশ প্রেমিক ছিলেন। তিনি দেশকে মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন। দেশের জন্য তিনি অনেক নজম লিখেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশে পদচারণা করেছেন, তবে তিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন, সে দেশের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন। তার এরকমই একটি নজম سیر پاکستان (সায়রে পাকিস্তান) যা দেশপ্রেমের উপর নির্ভর করে তিনি রচনা করেছেন। এ নজমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি নিজের দেশকে কতটা ভালোবাসতেন। তিনি একবার দেশকে ছেড়ে পুনরায় দেশে ফিরে তার স্নেহার্দ হৃদয় দিয়ে তার অনুভূতি এভাবে বর্ণনা করেছেন-

چھوڑی ہوئی انجمن میں واپس آیا☆ مہجور وطن وطن میں واپس آیا
اے اہل چمن ! چمن میں اعلان کرو☆شیدائے چمن، چمن میں واپس آیا۔[১০৯]

জগন্নাথ আজাদের দেশপ্রেমের উপর আরেকটি উল্লেখযোগ্য নজম হলো- پنجاب (পাঞ্জাব)। এতে লেখক পাঞ্জাবের ধ্বংসের অনেক বড় কারণ ও প্রভাব চিত্রায়িত করেছেন। এতে পাঞ্জাবে যে প্রভাব পড়েছে তা তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে-

مٹی ہوئی تقسیم، محبت ہوئی رخصت☆اخلاص گیامہر ومروت ہوئی رخصت
چہروں سے ہنسی دل سے صداقت ہوئی رخصت☆پنجاب کی دیرینہ شرافت ہوئی رخصت۔[১১০]

আজাদ তার দেশকে এতই ভালোবাসতেন যেন সে দেশ তাকে গভীরভাবে টানে। আজাদ তার দেশকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছাড়তে চাননি, তবে বাধ্য হয়ে তাকে ছাড়তে হয়েছিল। এজন্য তার অনেক দুঃখ রয়ে যায়। তার কিছু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল, তার দেশ তার প্রার্থনা শুনতে পায় এবং তার দেশ তাকে আবার ফিরে আসতে আমন্ত্রণ জানায়। তার রচিত নজম شکوۂ پاکستان (শেকওয়ায়ে পাকিস্তান) এ কবি বলেন-

وطن کو بھولنے والے وطن کو واپس آ☆غزال دشت ختن پھر ختن کو واپس آ
اداس اداس ہیں پھولوں کے چہرہائے جمیل☆توائے بہار چمن ! پھر چمن کو واپس آ۔[১১১]

আজাদ যেমন দেশপ্রেমিক ছিলেন তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। আজাদ কখনো কাউকে ধর্মের আয়নায় দেখেননি। তার জন্য মানবতার সম্পর্ক অন্যতম সেরা সম্পর্ক এবং তিনি আজীবন তার নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি কখনো হিন্দু ও মুসলিমকে আলাদা করে দেখতেন না। তিনি মনে করতেন সবাই মানুষ। এ সমস্ত বিষয় তিনি তার নজমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তার একটি নজম بھارت کے مسلمان (ভারত কে মুসলমান) এর মধ্যে কবি বলেছেন-

اس دور میں تو کیوں ہے پریشاں دہراساں☆کیابات ہے کیوں ہے متزلزل ترا ایماں
دانش کدہ دہر کی اے شمع فروزاں☆اے مطلع تہذیب کے خورشید درخشاں
حیرت ہے گھٹاؤں سے ترا نور ہو ترساں☆بھارت کے مسلماں-[১১২]

আজাদ মুসলমানদের উপর যতগুলো নজম লিখেছেন তা পড়লে বোঝা যায় যে, ইসলামী সংগঠনের সাথে তার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। তিনি ওই সময়ে পূর্বদেশে সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ইসলামী

সংগঠনের ইতিহাসের প্রভাব দেখেছেন এবং সে অনুভূতি থেকে তিনি مسجد قرطبہ سے دیلنشیاں بک (মসজিদ কুরতুবা সে দিলনাশিয়া বেক) নজমটি লিখেছেন। এই নজমে তিনি বলেন-

رفتار وقت دیکھ رہا ہوں ترا طلسم ☆ طوفان سمٹ کے آج فقط رہ گیا ہے تو
ڈھونڈے سے بھی نہ اس کا مجھے مل سکی سراغ ☆ تہذیب وہ کہ جو تھی زمانے کی آبرو۔[১১৩]

এই বিষয়ের উপর আরেকটি কবিতা- دہلی کی جامع مسجد (দিল্লী কি জামে মসজিদ) যা ঐ সময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এই নজমের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, তিনি মুসলিম এবং ইসলামের বন্ধু। তার আরেকটি কবিতা اردو (উর্দু)। যেখানে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, হিন্দু ও মুসলিম সংগঠনের একটি পরিণতি হলো- 'উর্দু'। এটিকে শেষ করা মানবতাবিরোধী বরং নিজের সম্প্রদায়কে মেটানোর সমান। হিন্দুস্তানের কিছু লোক মনে করে উর্দু হিন্দুস্তানের ভাষা নয়, এটি শুধু হিন্দুস্তানের মুসলমানদের ভাষা। একরম যারা মনে করে তাদেরকে কবি ঘৃণা করেন এবং সেটি দূর করার জন্য তিনি রাগান্বিত এবং স্নেহ ভরা মন দিয়ে নজমটি লিখেছেন। এই নজমে কবি বলেছেন-

عداوت کی فضا میں ہے محبت کا بیاں اردو ☆ اسے اہل وطن دیکھیں نہ ہر گز بد گمانی سے
کہ ڈھل کر آئی ہے یہ زمزم و گنگا کے پانی سے ☆ ریاض ہند میں اردو وہ اک خوش رنگ پودا ہے
جسے خون جگر سے ہندو مسلم نے سینچا ہے ☆ مرے اہل وطن یہ آدمیت کا تقاضا ہے۔[১১৪]

জগন্নাথ আজাদ মুসলমানদের উপর আরেকটি নজম লিখেছেন, তা হলো- پیغمبر اسلام (পয়গম্বর ইসলাম)। এই নজমে কবি ইসলামের পথপ্রদর্শক মহানবী (স.) কে সালাম জানিয়েছেন। এ নজমে তিনি বলেন-

سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا ☆ سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا
سلام اس پر حلائی شمع عرفان جس نے سینوں میں ☆ کیا حق کے لیے بیتاب سجدوں کو جبینوں میں۔[১১৫]

জগন্নাথ আজাদ কিছু রোমান্টিক নজমও লিখেছেন। সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১. প্রকৃতির দৃশ্যের উপর ভিত্তি করে এবং ২. তার স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা বিষয়ক। তিনি দৃশ্যের বর্ণনা তার মনের অনুভূতি দিয়ে এমনভাবে তুলে ধরেন যা পাঠকের মনের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর তার একটি নজম کنارے راوی (কিনারে রাদি)। এ নজমে কবি দৃশ্যের বর্ণনা খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন-

ہر چیز چاندنی سے زر پوش ہو رہی تھی ☆ گردوں سے ماہ تاباں سونا لٹا رہا تھا
دو موسموں میں باہم تھا اتصال گویا ☆ اک وقت آ رہا تھا اک وقت جا رہا تھا
رادی کے پل کے نیچے تھیں نغمہ بار لہریں ☆ لہروں کا راگ دل کو بے خود بنا رہا تھا۔[১১৬]

দৃশ্য এবং সুন্দরের উপর আরেকটি নজম হলো- ڈل کے کنارے ایک صبح (ডাল কে কিনারে এক সুবহে)। এই নজমে কবি সকালের দৃশ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

ذرا تو رحم کر صبح کی لطیف ہواؤ ☆ جو بجھ چکی ہیں وہ چنگاریاں نہ پھر سلگاؤ
تھپک تھپک کے سلایا ہے جن کو وقت سے ☆ ان آرزوؤں کو پھر میری روح میں نہ جگاؤ۔[১১৭]

জগন্নাথ আজাদের প্রথম স্ত্রীর নাম ছিল শকুন্তলা। তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তার খুব কষ্ট হয়। তাই তার স্ত্রীকে স্মরণ করে তার নামে তিনি একটি নজম লিখেছেন, যা রোমান্টিক নজম হিসেবে পরিচিত। شکنتلا (শকুন্তলা) নজমে কবি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

سامنے میرے دعاؤں کا مری انجام ہے ☆ اب تری ہر دور ہر تکلیف کو آرام ہے
اب نہ روئے گی تو اپنی بچوں کو دیکھ کر ☆ اور اس کی معصوم کی خاطر نہ ترسے گی نظر
جو تری دامن میں آیا مسکرایا چل بسا ☆ جس کو یہ انداز دنیا کا نہ بھایا چل لبا۔[১১৮]

তার রোমান্টিকতার উপর আরেকটি নজম হলো- ایک آرزو (এক আরজু), যা তার স্ত্রীর জন্য রচিত হয়েছিল। এই নজমে তার স্ত্রীর প্রতি তার গভীর ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। তিনি প্রবল ইচ্ছা পোষণ করেন যেন তার স্ত্রী পুনরায় তার কাছে ফিরে আসে। তিনি বলেন-

اے کہ تجھ کو ڈھنڈتی ہے میری جان درد مند ☆ اے کہ اک پل کی جدائی بھی نہ تھی تجھ کو پسند
ہو سکے تو میری خلوت گاہ میں پھر آ بھی ☆ خاطر اندوہگیں کو شادماں فرما کبھی۔[১১৯]

জগন্নাথ আজাদ ছিলেন একজন মানুষ প্রেমিক। তিনি মানুষের জন্য অনেক নজম লিখেছেন। তিনি যে সকল নজম লিখেছেন সেগুলোর মধ্যে ذرو! قطرو! (জরো ও কাত্রো) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এখানে কবি মানুষকে জেগে উঠতে বলেছেন। দুনিয়াতে বেঁচে থাকার জন্য যে যুদ্ধ করতে হয় কবি তাতে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিয়েছেন।

ایک نئے مضمون کی اب تمہید بنو
ذرو! قطرو!

ایک نئی محفل کا اب ساماں بنو۔[১২০]

জগন্নাথ আজাদের উপরোক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও তিনি তার নজমে রাজনৈতিক বিষয়টিও খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যদিও তার কবিতায় দেশপ্রেমের বিষয়টি বেশি পরিলক্ষিত হয় তবুও রাজনৈতিক বিষয়টিকেও তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি রাজনীতির বিষয়টি তার নজমে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন তিনি একজন রাজনীতিবিদ। তিনি সত্যিকার অর্থে একজন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। সেই কারণে তিনি রাজনীতির ভাষা ভালো বুঝতেন এবং তিনি তার নজমে সুন্দরভাবে তা তুলে ধরেছেন। যেমন তার রাজনীতি বিষয়ক একটি কবিতা ۱۵اگست ۱۹۴۷ (১৫ ই আগস্ট ১৯৪৭)। এ নজমে তিনি বলেন-

نہ پوچھو جب بہار آئی تو دیوانوں پہ کیا گزری ☆ ذرا دیکھو کہ اس موسم میں فرزانوں پہ کیا گزری۔[১২১]

জগন্নাথ আজাদের আরেকটি উল্লেখযোগ্য রাজনীতি বিষয়ক নজম হলো- آزادی کے بعد (আজাদিকে বা'দ)। তিনি এই নজমেও রাজনীতির বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন এটি দেশের একটি কবিতা। এই নজমে কবি বোঝাতে চেয়েছেন যে, স্বাধীনতার পরেও দেশ সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হতে পারেনি। তিনি বলেন-

گرد دامن سے غلامی کی چھڑانے والے ☆ ترے ماتھے پہ غلامی کا نشاں آج بھی ہے

جو سماں پیری نگاہوں سے نہاں ہے شاید ☆ وہ سماں میری نگاہوں پہ گراں آج بھی ہے۔[১২২]

উপরে উল্লেখিত নজম ছাড়াও তিনি অসংখ্য নজম রচনা করে গেছেন। তার নজমের বইগুলো হচ্ছে- بیکراں (বেকরান), ستاروں سے ذروں تک (সিতারোঁ সে জাররোঁ তক), وطن میں اجنبی (ওয়াতন মে আজনবী), نوائے پریشاں (নুয়ায়ে পেরেশান), طبل وعلم (তবল ও ইলম), بوئے رسیدہ (বুয়ে রসিদা), بچوں کی نظمیں (বাচ্চোঁ কি নজমেঁ), شاعر کی آواز (শায়ের কি আওয়াজ), اجنتا (অজন্তা) ইত্যাদি।

জগন্নাথ আজাদ বিভিন্ন বিষয়ের উপর নজম লিখতেন। নজমের জন্য তিনি প্রথমে বিষয়টিকে নির্বাচন করতেন, সেটি সমাজ এবং মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকত। তারপর সে বিষয়ের উপর কবিতার লাইন লিখতেন। তিনি কবিতায় এত মর্যাদাবান ছিলেন যে, তার কবিতাগুলো জনপ্রিয় হয়ে উঠে। তার অনুভূতি ও ভালোবাসার জন্য কবিতাগুলোকে জীবনের একটি অংশ মনে হয়।

ফেরাক গোরাখপুরীঃ ফেরাক গোরাখপুরীর কবিতা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। কারণ তার পিতা ছিলেন একজন কবি। শৈশবকাল থেকে তিনি কবিতা মেজাজে ছিলেন। তবে ফেরাক **১৯১৮** খ্রি. থেকে

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে নজম লিখা শুরু করেন। তিনি অসীম জ্ঞান সৃষ্টিকারী কবিতার কবিদের মধ্যে অনন্য হিসেবে গণ্য হন। ফেরাক গোরাখপুরী গজল বাদে কবিতার আরেকটি শাখায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তা হলো নজম। এই শাখায় ফেরাক গজলের মতই সুপরিচিত হন। ফেরাক প্রেমমূলক, প্রাকৃতিক দৃশ্য, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং জীবনীমূলক বিষয়ে কবিতা লিখেছেন।[১২৩] ফেরাকের নজম সম্বন্ধে গোপীচাঁদ নারায়ণ বলেছেন-

"فراق گورکھپوری ہمارے عہد کے ان شاعروں سے تھے جو کئی صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی شاعری میں حیات وکائنات کے بھید بھرے سنگیت سے ہم اہنگ ہونے کی عجیب وغریب کیفیت تھی۔ اس میں ایک ایسا حسن، ایسا رس اور ایسی لطافت تھی جو ہر شاعر کو نصیب نہیں ہوتی۔ فراق نے نظمیں بھی کہیں اور رباعیات بھی۔ لیکن وہ بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے۔ ہندوستانی لہجہ اردو میں پہلے بھی تھا۔ فراق کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے خدائے سخن میر کی شعری روایت کے حوالے سے اس کی بازیافت کی اور صدیوں کی آریائی روح سے ہم کلام ہو کر اسے تخلیق اظہار کی نئی سطح دی اور آج کے انسان کے دل کی دھڑکنوں کو اس میں سمو دیا۔"[১২৪]

ফেরাক গোরাখপুরী তার জীবদ্দশায় অনেকগুলো নজম লিখেছেন। তার মধ্যে অন্যতম এবং প্রধান নজম হচ্ছে ادھی رات کو (আদহি রাত কো)। এ নজমটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লিখিত হয়েছিল। এ গুরুত্বপূর্ণ নজমটি একটি যুদ্ধের পরিস্থিতিগুলোর চেয়ে তার প্রভাবের দিকে বেশি ইঙ্গিত করেছে। যেমন-

سیاہ پیڑ ہیں اب آپ اپنی پرچھائیں☆زمیں سے تا مہ و انجم سکوت کے مینار
جدھر نگاہ کریں اک اتھاہ گوشدگی☆اک ایک کر کے فسردہ چراغوں کی پلکیں۔[১২৫]

ফেরাকের একটি সুন্দর এবং করুণ কবিতা হলো- جگنو (জগনু)। এতে একটি ২০ বছর বয়সী ব্যক্তির শোক চিত্রিত করা হয়েছে, যার মা তার জন্মদিনেই মারা গিয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ-

مری حیات نے دیکھی ہیں بیس برساتیں☆مرے جنم ہی کے دن مر گئی تھی ماں میری
وہ ماں کہ شکل بھی جس ماں کی میں نہ دیکھ سکا☆جو آنکھ بھر کے مجھے دیکھ بھی سکی نہ وہ ماں۔[১২৬]

ফেরাকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নজম হলো- ہنڈولہ (হন্ডোলা)। এই নজমে কবি তার শৈশবকালীন অনুচ্ছেদ এবং অনুভূতি রেকর্ড করেছেন। যেমন-

مری سرشت میں ضدیں کے کئی جوڑے☆شروع ہی سے تھے موجود آب و تاب کے ساتھ

مرے مزاج میں پہناں تھی ایک جدلیت ☆ رگوں میں چھوٹتے رہتے تھے بے شمار انار۔[১২৭]

ফেরাকের আরেকটি অনন্য সৃষ্টি হলো- داستان آدم (দাস্তানে আদম)। ফেরাকের এই সেরা নজমটি একটি ঐতিহাসিক নজম। এতে তিনি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এখন অবধি মানব ঐতিহাসিক, ক্রমান্বয়ে বিপ্লবী বিকাশের কথা উল্লেখ করেছেন। এ নজমে কবি বলেন-

سائنس کے یہ معجزے ایجادوں کے یہ دور ☆ دنیا کے سب آئین، تمدن کے سبھی طور
بدلیں گے ابھی اور ابھی اور ☆ تاریخ کی رفتار بہت تیز کریں گے۔[১২৮]

ফেরাকের অন্য আরেক ধরনের কবিতা হলো- پرچھائیاں (পারছায়িয়া)। কবি ঐশ্বরিকভাবে নান্দনিকতা এবং প্রেমের অনুভূতি প্রতিনিধিত্ব করেন। নজমে কবি আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টির প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে বলেছেন-

یہ چھپ، یہ روپ، یہ جوبن، یہ سج، یہ دھج یہ لہک ☆ چمکتے تاروں کی کرنوں کی نرم نرم پھوڑ
یہ رسماتے بدن کا اٹھان اور ابھار ☆ فضا کے آئینہ میں جیسے لہلہائے بہار۔[১২৯]

ফেরাক গোরাখপুরী প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর অনেকগুলো নজম লিখেছেন। তার মধ্যে অন্যতম নজম হলো- شام عیادت (শাম ইয়াদত)। এ নজমে কবি প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপরূপ চিত্র চিত্রায়ন করেছেন যেন সবাই প্রকৃতির প্রেমে পড়ে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর রচিত 'শাম ইয়াদত' নজমে কবি প্রকৃতির দৃশ্য এভাবে বর্ণনা করেছেন-

ادائے حسن برق پاس شعلہ زن نظارہ سوز ☆ فضائے حسن اددی اددی بجلیاں لئے ہوئے
جگانے والے نغمۂ سحر لبوں پہ موج زن ☆ نگاہیں نیند لانے والی لوریاں لئے ہوئے۔[১৩০]

ফেরাকের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেমের নজম হলো- حسن کی دیوی سے (হসন কি দেবী সে)। তিনি প্রকৃতিকে খুব পছন্দ করতেন এবং প্রকৃতির প্রেমে পড়ে যেতেন। এই প্রেম থেকেই তিনি এই নজমটি রচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ-

یہ رنگ رنگ جوانی، چمن چمن پیکر ☆ یہ غنچہ غنچہ تبسم، قدم قدم گفتار
قد جمیل ہے یا کام دیو کی ہے کماں ☆ نظر کے پھول گندھے تیر کرتے جاتے ہیں دار۔[১৩১]

ফেরাকের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নজম হলো- آزادی (আজাদি) যা ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে লিখা হয়েছিল। যখন দেশে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সংগ্রাম চলছিল তখন মানুষ দেশ স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখছিল। এ কবিতাটি ঐ সময়ে লেখা হয়েছিল, যখন দেশের মানুষ স্বাধীন হওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিল। আর এই ঘটনাটি কবি খুব সুন্দরভাবে এ নজমে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন-

ترنم سحری دے رہا ہے لو چھپ کر☆حریف صبح وطن ہے یہ شام آزادی
ہمارے سینے میں شعلے بھڑک رہے ہیں فراق☆ہماری سانس سے روشن ہے نام آزادی۔ [১৩২]

ফেরাকের আরেকটি খুব ছোট নজম হলো- ترانۂ عشق (তারানায়ে ইশক)। এ নজম ছোট হলেও কবি এই নজমটি দেশ প্রেমের উপর ভিত্তি করে রচনা করেছেন। অর্থাৎ তার মধ্যেও যে দেশপ্রেম ছিল তিনি তার নজমে ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। দেশের প্রতি ভালোবাসা সব মানুষেরই আছে। তিনিও দেশকে খুব ভালোবাসতেন। আর দেশপ্রেম থেকেই তিনি এ নজমটি লিখেছেন। তিনি বলেন-

جلوہ گل کو بلبل بہت ہے☆شمع کر گریہ شام
باد بہاری گل کو بہت ہے☆مجھ کو تیرا نام۔ [১৩৩]

ফেরাক যদিও একজন দেশ প্রেমিক ছিলেন তবুও রাজনৈতিক কারণে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। কারাগার থেকে বের হয়ে তিনি মুক্ত হওয়ার পরে تلاش حیات (তালাশে হায়াত) নামে একটি নজম লিখেছেন। এ নজমে কবি বলেন-

ہند کے گھونگھٹوں ملتے☆کتنی سہائی آگ ہے
صبح کو ماں کے ماتھے پر☆آج نیا بہاگ ہے۔ [১৩৪]

ফেরাকের রাজনৈতিক বিষয়ের উপর আরেকটি উল্লেখযোগ্য নজম হলো- دھرتی کی کروٹ (ধরতী কি করোট)। এ কবিতায় তিনি রাজনীতির বিষয়টিকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

اتّر، دکھن، پورب، پچّھم☆آگے، پیچھے، اوپر نیچے
دیش دیش میں دنیا بھر میں☆توڑ رہی ہے دم تاریگی
سرخ سویرا ہونے کو ہے۔ [১৩৫]

উপরোক্ত নজম ছাড়াও ফেরাক গোরাখপুরী অসংখ্য নজম রচনা করেছেন। তার নজমের সংকলন হলো- دھرتی کی کروٹ (ধরতী কি করোট), نغمۂ نما (নাগমা নুমা), مشعال (মশাল), روح کائنات (রূহে কায়েনাত), گلبانگ (গুলবাঙ্গ)।

ফেরাক গোরাখপুরী উর্দু কাব্যসাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার নজমগুলো পড়লে বোঝা যায় যে, তিনি একজন উচ্চমানের কবি ছিলেন। কবিতার ধারা তার মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল।

তিলোকচাঁদ মাহরুমঃ তিলোকচাঁদ মাহরুম উর্দু সাহিত্যের দুনিয়ায় নিজের জায়গা তৈরি করেছেন কবিতার মাধ্যমে। মাহরুম প্রকৃতপক্ষে একজন নজমের কবি।[১৩৬] মাহরুম কবিতার জন্য পুরো পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার খ্যাতি ও সম্মান কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। তিনি আখলাকী, সামাজিক, রাজনৈতিক, মাজহাবী, দেশ, জাতীয় এবং বাচ্চাদের বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। মাহরুম সৌন্দর্য সন্ধানী একজন কবি। তার লিখায় সৌন্দর্য একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উর্দু নজমে দৃশ্যের বর্ণনা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।[১৩৭] তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর অনেক সংবেদনশীল। তিনি গ্রামে বাস করতেন, তাই তার কাছে চিত্রের বর্ণনা খুব সহজেই আসে। তিনি গ্রামে বাস করতেন বলেই প্রকৃতিকে অনেক কাছে থেকেই দেখেছেন। তাই তার মনে সব সময় প্রকৃতির চিন্তা আসে।

তার বেশিরভাগ নজমই প্রাকৃতিক দৃশ্য বা চিত্রাবলীর উপর চিত্রায়িত হয়েছে। তিনি প্রকৃতির উপর অনেক নজম লিখেছেন। দৃশ্যের উপর তার একটি উল্লেখযোগ্য নজম হলো- گنگا (গঙ্গা)। এই নজমে কবি দৃশ্যের বর্ণনা এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেন 'গঙ্গা' সম্বন্ধে মানুষের ধারণা সহজে চলে আসে। এ নজমে গঙ্গা নদীর বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন-

ٹھنڈا میٹھا اس کا پانی ☆ کونسا دریا اس کا ثانی
شہروں کی آبادی اس سے ☆ رونق اس سے، شادی اس سے۔[১৩৮]

দৃশ্যের এবং চিত্রাবলীর উপর তার আরেকটি মনজুড়ানো নজম হলো- آندھی (আন্ধী)। এই নজমে অন্ধের পুরো দৃশ্য সামনে আসে । এ নজমে কবি বলেন-

آتی ہے مثل اژدر صحرا پھنکارتی ☆ للکارتی فلک کو زمین کو پکارتی
ذرّوں کو تا بہ چرخ چہارم ابھارتی ☆ اڑتے ہُوؤں کو روج فضا سے اتارتی۔[১৩৯]

দৃশ্যের উপর মাহরুমের আরেকটি উল্লেখযোগ্য নজম হলো- بادبہاری چلی (বাদ বাহারী চলি)। তিনি এই নজমে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা এমনভাবে তুলে ধরেছেন যেন আল্লাহর সৃষ্টিকেই তিনি তুলে ধরেছেন। যেমন-

گلشن آفاق میں پھول کھلاتی ہوئی☆ناچتی گاتی ہوئی
جلوۂ فردوس کا رنگ جماتی ہوئی☆عطر اڑاتی ہوئی
بادبہاری چلی![১৪০]

চিত্রের চিত্রায়ন করা মাহরুমের একটি সৃষ্টিশীল শিল্প। তার চিত্রের উপর আরেকটি সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম হলো دھوپ (ধূপ)। বর্ষার পরে প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয় তা কবি এই নজমে অতি চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন-

بارش کے بعد نکلی ہے کیا زرنگار دھوپ☆برسا رہی ہے دشت و چمن پر نکھار دھوپ
ذرّے زمین کی صورت گوہر چمک اٹھے☆دامان کوہسار میں پتھر چمک اٹھے
پاکیزہ مثل دامن پاکاں یہ دھوپ ہے☆حُسن عمل کی طرح درخشاں یہ دھوپ ہے[১৪১]

প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর তার নজমের সংগ্রহ হলো- گنج معانی (গঞ্জে মা'আনি)। এই নজমের বইয়ে প্রায় সব নজমই প্রাকৃতির দৃশ্যের উপর রচিত। তিলোকচাঁদ মাহরুম ঘটনার বর্ণনার উপর অনেক নজম রচনা করেছেন। তার মধ্যে আলোচিত নজম হলো- عزم صحرا (আজম ছেহরা)। এই নজমে শ্রী রামচন্দ্র জী এর বনবাসে যাওয়ার ঘটনা এবং এই ঘটনা শুনে আযোধ্যাদের মনে আশঙ্কা কবি খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন-

صحرا کو رام لچھمن و سیتا جو چل پڑے☆بیتاب ہو کے لوگ گھروں سے نکل پڑے
زار و قطار روتے ہوئے بے قرار سب☆تھے پیچھے پیچھے رام کے باحال زار سب۔[১৪২]

ঘটনার বর্ণনার উপর তার আরো অনেক নজম রয়েছে। ویران کٹیا (বিরান কাটিয়া), سیتا جی کی فریاد (সিতাজী কি ফরিয়াদ), اعجاز عصمت (ইজাজ আসমত), راون کا ماتم (রাবন কা মাতম) এবং رامائن کے سین (রামায়ণ কে সিন) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দেশের উপর অনেক কবিই নজম লিখেছেন তার মধ্যে মাহরুম অন্যতম। তিনি কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমে দেশের প্রতি যে আবেগ প্রকাশ করেন, তা অন্যান্য কবিদের মধ্যে দেখা যায় না। তিনি দেশের প্রতি সর্বদা নিবেদিত ছিলেন। তার দেশপ্রেমের নজম সমাজ গঠনের উৎসাহ দেয় এবং

মানুষের মনে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রেরণা যোগায়। দেশ ও জাতির জাগরণের জন্য মাহরুমের নজম অস্বীকার করা যায় না।

হালি ও চাকবাস্ত দেশের উপর অনেক নজম রচনা করেছেন। মাহরুমও দেশের উপর অনেক নজম রচনা করেছেন। মাহরুম দেশকে স্বাধীন দেখতে চেয়েছিলেন। মাহরুম জানতেন যে, ভারতকে গঠন করতে দেশের যুবকদের ভূমিকা রয়েছে। এ জন্য দেশের যুবকদের নিয়ে তিনি একটি নজম রচনা করেছেন ہندوستانی نوجوانوں کی دعا (হিন্দুস্তানি নোজোয়ানুঁ কী দু'আ)। এই কবিতায় হিন্দুস্তানি তরুণরা তাদের দেশের জন্য প্রার্থনা করে।

سینے میں ہو مرے دل بے کینہ، اے خدا☆ ہر گرد سے ہو پاک یہ ائینہ، اے خدا
خالی ہو ہر غرض سے مرا سینہ، اے خدا☆ درد وطن کا اس میں ہو گنجینہ، اے خدا۔[১৪৩]

মাহরুম দেশকে নিয়ে অনেক নজমই রচনা করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নজম হলো- جلوۂ امید (জলোয়ায়ে উম্মিদ)। এই নজমে কবি হিন্দুস্তানি মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার রং নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। এই নজমে কবি বলেছেন-

گلشن ہندوستان میں پھر بہار آنے کو ہے☆ رنگ نو سے لالہ و گل پر نکھار آنے کو ہے
اور بھی چل جم کے تو اے صرصر آہ سحر☆ ظلمت غم کی گھٹا میں انتشار آنے کو ہے۔[১৪৪]

তিলোকচাঁদ মাহরুমের দেশকে নিয়ে লেখা নজমগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ নজম হলো- ہندوستان ہمارا (হিন্দুস্তান হামারা)। মাহরুমের দেশের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার অফুরন্ত উদাহরণ হলো এই নজম। এই নজমে পুরোপুরিভাবে দেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি এই নজমে দেশপ্রেমের প্রকাশ এভাবে করেছেন-

گلشن اجڑ چلا ہے اے باغبان ہمارا☆ ہونے کو تنکے تنکے ہے آشیان ہمارا
کس دشن میں الٰہی اب خاک چھانتے ہیں☆ باد بہار اپنی، آب روان ہمارا۔[১৪৫]

মাহরুম শুধু তার দেশ হিন্দুস্তান নিয়ে নজম রচনা করেছেন তা নয়, তিনি পাকিস্তান ও পাঞ্জাব দেশ নিয়েও নজম রচনা করেছেন। তার এমনই একটি নজম হলো- پنجاب کے میدان (পাঞ্জাব কে ময়দান)। তিনি পাঞ্জাবের জন্য নিজের অফুরন্ত ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। এই কবিতা পড়লে বোঝা যায় যে, তিনি পাঞ্জাবের অভাবনীয় সুন্দর দৃশ্য চিত্রায়ন করেছেন। যেমন-

کس قدر ہے آہ! دامنگیر دل تیری زمین☆دلکشی پنجاب! کتنی تیرے میدانوں میں ہے
تیری وسعت میں ہوئی گم رفعت چرخ بریں☆ایک ایوان فلک بھی تیرے ایوانوں میں ہے![১৪৬]

তিলোকচাঁদ মাহরুম শুধু দৃশ্য ও দেশপ্রেম বিষয়ে নজম রচনা করেছেন তা নয়; তিনি রাজনৈতিক বিষয়েও নজম লিখেছেন। তিনি তার নজমে রাজনীতির বিষয়গুলো খুব চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার রাজনৈতিক বিষয়ে নজমের মধ্যে অনন্য নজম হলো- صبر ہمارا جیت گیا (সবর হামারা জীত গিয়া)। এই নজমে তিনি জয়ের বার্তা দিতে গিয়ে বলেন-

پر ذوق ستم نے اس کے آخر خود اس کو بدنام کیا☆بے کار گئی تدبیر اس کی تقدیر نے اپنا کام کیا
اس وقت کو ہمدم یاد نہ کر، وہ دور غلامی بیت گیا☆جب جور و ستم سب ہار گئے اور صبر ہمارا جیت گیا۔[১৪৭]

তিলোকচাঁদ মাহরুম দেশকে যেমন ভালোবাসতেন তেমনি দেশের মানুষের জন্য ভাবতেন। হিন্দু ও মুসলমান যে মানুষই হোক না কেন সবাই তার কাছে সমান। তিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ। যদিও তিনি হিন্দু ছিলেন তুবও তিনি মুসলমানদের কখনও ঘৃণা করতেন না। ہندو مسلمان 'হিন্দু মুসলমান' নজমে কবি বলেছেন-

مٹے جھگڑا الٰہی کب یہاں ہندوستان کا☆بنے کب مشترک ہندوستان ہندو مسلمان کا
گناہ بغض پنہاں کی سزا بھی کچھ تو ہوتی ہے☆نہ دشمن کس لئے ہو آسمان ہندو مسلمان کا۔[১৪৮]

মাহরুমের দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক বিষয়ে আরো অনেক নজম রয়েছে। দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক বিষয়ের উপর তার নজমের সংগ্রহ হলো- کاروان وطن (কারওয়ানে ওয়াতন)।

তিলোকচাঁদ মাহরুম দেশ ও বড়দের নিয়ে এবং যুবক বা তরুণদের নিয়ে অনেক নজম লিখলেও তিনি শিশুদের অর্থাৎ ছোটদের নিয়েও অনেক নজম লিখেছেন। বাচ্চাদের নিয়ে লিখা নজমের মধ্যে স্বনামধন্য নজম হলো- پہلے کام پیچھے آرام (পেহলে কাম পিছে আরাম)। এই নজমে কবি ছোটদের পড়াশুনা করতে বলেছেন, তারপর আরাম করতে বলেছেন। এতেই তাদের সফলতা আসবে। এই নজমে কবি বাচ্চাদের এভাবে বলেছেন-

کامیابی کی تمنا ہے اگر کام کرو☆مرد کہلاؤ، زمانے میں بڑا نام کرو
وقت آغاز سے اندیشۂ انجام کرو☆کام کا لطف ہے جب صبح سے تا شام کرو
پہلے تم کام کرو، بعد میں آرام کرو![১৪৯]

সত্যের পথে পুরো পৃথিবী চলে। যদি মানুষ সৎপথে চলে তবে সবকিছু সহজেই অর্জন করতে পারবে। আর অসৎপথে চললে দুনিয়াতে কেউ তাকে ভালোবাসে না। এই বিষয়ের উপর কবির লিখা سچائی (সাচ্চায়ী) নজমটি কবি ছোটদের জন্য লিখেছেন। এই নজমে কবি বলেছেন-

سورج کی چمک☆تاروں کی جھلک
باغوں کی مہک☆بلبل کی چہک
گندن کی ڈلک☆موتی کی دمک
موجود ہیں اک سچائی میں![১৫০]

তিলোকচাঁদ মাহরুম এই দু'টি নজম ছাড়াও বাচ্চাদের জন্য অসংখ্য নজম রচনা করেছেন। বাচ্চাদের উপর তার রচিত কবিতার সংগ্রহ হলো- بچوں کی دنیا (বাচ্চো কি দুনিয়া)।

তিলোকচাঁদ মাহরুম শুধু সাধারণ মানুষের কথা ভেবেই নজম লিখেছেন তা নয়। তিনি অসহায় মানুষের জন্যও নজম রচনা করেছেন। তার নজম مچھلی کی بے تابی (মাছলি কি বেতাবী) একটি উল্লেখযোগ্য নজম। তিনি কোন অসহায় মানুষের অসহায়ত্ব দেখে তার কবিতায় এভাবে বলেছেন-

مسرور ہو نہ دیکھ کے بیتابیاں مری☆سرپنجہ عذاب میں ظالم! ہے جان مری
اے بدگمان نہ رکھ مجھے الجھا کے دام میں☆میں نیجاں ہو اب وہ تڑپ ہے کہاں مری۔[১৫১]

তিলোকচাঁদ মাহরুম শুধু মানুষের জন্য নজম লিখেছেন তা নয় তিনি পশুপাখি এবং জীবজন্তু নিয়েও নজম রচনা করেছেন। এই বিষয়ের উপর তার একটি উল্লেখযোগ্য নজম হলো- بلبل کی فریاد (বুলবুল কি ফরিয়াদ)। এই নজমে কবি পশুপাখির প্রতি দয়ালু হওয়ার কথা বলেছেন। এই নজমে কবি বুলবুল পাখির প্রার্থনা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন-

صیاد نے چھڑایا جس دن سے آشیانا☆پہلو میں دل کے بدلے غم نے کیا ٹھکانا
گلزار سے نکلا، قید قفس میں ڈالا☆بے درد کچھ نہ سمجھا، ظالم نے کچھ نہ جانا۔[১৫২]

পশুপাখির উপর মাহরুমের আরেকটি নজম হলো- چڑیا کی زاری (চিড়য়া কি জারি)। এই নজমে কবি পশুপাখির বিভিন্ন অবস্থা সম্বন্ধে বলেছেন। মা পাখি কীভাবে তার বাচ্চাদের খাওয়ায়, বাসা তৈরি করে এবং বাচ্চাদের লালন-পালন করে সেই সম্বন্ধে কবি এই নজমে খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন-

جنگل میں جاکے اپنا میں آشیاں بناتی ☆ شاخ شجر پہ خس کا چھوٹا مکاں بناتی
رہتی ہنستی خوشی سے بچوں کو پالتی میں ☆ خطرے میں اپنی جاں کو ہر گز نہ ڈالتی میں۔[১৫৩]

তিলোকচাঁদ মাহরুম জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট পেয়েছেন। আর এই দুঃখ-কষ্ট নিয়েও তিনি নজম লিখেছেন। তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুতে তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আর এই কষ্ট থেকেই তিনি طوفان غم (তুফানে গম) নামে একটি নজম রচনা করেছেন। তিনি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ১ম বিবাহ করেন এবং ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে তার স্ত্রী পরলোকগমন করেন। সহধর্মীনির অকাল মৃত্যুতে তিনি খুব ভেঙ্গে পড়েন। এই নজমে কবি তার স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

یہ ہاتھ جوڑ کی مجھ سے معافیاں کیسی ☆ چھڑی ہے آج یہ رخصت کی داستاں کیسی؟
ذرا تو دھیان کرو میرے سوز غم کی طرف ☆ چلے ہو تاروں کی چھاؤں میں کیوں عدم کی طرف۔[১৫৪]

মাহরুম তার স্ত্রীকে নিয়ে আরো অনেক নজম লিখেছেন। যেমন- کسی کے پھول (কিসি কে ফুল), ہردوار سے واپسی پر (হার দোয়ার সে ওয়াপসী পর), سارس کا جوڑا (সারস কা জোড়া), نومبر کی ایک صبح (নভেম্বর কি এক সুবাহ), ناپائدار رشتے (নাপায়েদার রেস্তে) ইত্যাদি।

তিলোকচাঁদ মাহরুম ধাপে ধাপে শোকাহত ছিলেন। তিনি তার স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে যেমন নজম লিখেছেন তেমনি তার মায়ের মৃত্যু নিয়েও একটি নজম লিখেছেন। তার মায়ের মৃত্যু নিয়ে লিখা নজমটি হলো- دردناک منظر (দারদেনাক মানজার)। তিনি তার মাকে উদ্দেশ্য করে এভাবে বলেন-

نظروں سے آہ! کیا کیا حسرت ٹپک رہی ہے ☆ رہ رہ کے منہ ہمارا حیرت سے دیکھتی ہے
چہرے سے ہے نمایاں دل کی جو بیکلی ہے ☆ تیری تلاش اس کو اے مہر مادری ہے۔[১৫৫]

তিলোকচাঁদ মাহরুমের ১ম স্ত্রী মারা যাওয়ার সময় একটি ছেলে রেখে যান, তার নাম হচ্ছে ওয়াদদিয়া। তিনি তার ছেলের বিয়ে উপলক্ষ্যে একটি নজম- باپ کے آنسو (বাপ কে আঁসু) নামে রচনা করেন। এই নজমে কবি তার ছেলের হাত অন্য এক অচেনা মানুষের হাতে তুলে দেওয়াতে তার কষ্টের কথা বলেছেন। আসলে কবি তার স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তার ছেলেকে শুধু বাপের স্নেহ দিয়ে লালিত-পালিত করেননি মায়ের ভালোবাসাও দিয়েছেন। তাই তার বিয়েতে তার হাত অন্য জনের হাতে তুলে দেওয়াতে তার চোখে পানি চলে আসে।

وقت رحلت سے ذرا پہلے جب آئی ہوش میں ☆ مرنے والی نے تجھے سونپا مرے اغوش میں
آج اے لخت جگر! اے اس کی پیاری یادگار ☆ تجھ کو کرتا ہوں جدا گھر سے بچشم اشکبار۔[১৫৬]

তিলোকচাঁদ মাহরুম যে ছেলে বিয়ে দিয়েছেন সেই ছেলের মৃত্যুও দেখেছেন। তিনি وڈیا کی خودکشی پر (ওয়াদদিয়া কি খোদকাশি পর) নামে একটি নজম রচনা করেছেন। এই নজমটিতে কবি তার ছেলের আত্মহত্যার কথা বলেছেন। তার ছেলে শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে বিবাদ লাগার কারণে নিজে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। এই নজমে কবি দরদ ভরা হৃদয় দিয়ে বলেছেন-

کس کے جل مرنے کی آئی ہے خبر☆شعلے لرزاں میں دل ناشاد پر
کس سے پوچھوں، کیاہوا، جاوں کدھر☆اے قضامجھ پر بھی برسادے شرر
آہ! اے دریا، یہ تونے کیاکیا☆خاتمہ کیوں آگ میں اپناکیا۔[১৫৭]

তিলোকচাঁদ মাহরুম শুধু দুঃখ-কষ্টের নজম লিখেছেন তা নয়; খুশির বিষয়গুলো নিয়েও তিনি নজম লিখেছেন। এমনই একটি নজম হলো- ہلال عید (হেলালে ঈদ)। এ নজমে তিনি বলেন-

مرحبا! اے ہلال شام سعید☆لے کے آیاہے توبشارت عید
مخبر صبح عیش عشرت عید☆تجھ سے وابستہ ہے سعادت عید[১৫৮]

তিলোকচাঁদ মাহরুমের এই নজমটি মুসলমানদের ঈদ উৎসব নিয়ে লিখা। ঈদের আনন্দ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ায় তার উদ্দেশ্য ছিল।

তিলোকচাঁদ মাহরুম একজন উর্দু কাব্যসাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার কলমের দ্বারা তিনি উর্দু কাব্যসাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

আনন্দ নারায়ণ মোল্লাঃ আনন্দ নারায়ণ মোল্লা সাহেব যে সময় কবিতা লেখা শুরু করেন ঐ সময়ে চাকবাস্ত জাতীয় ও দেশের কবিতা লিখতেন। মোল্লা সাহেব চাকবাস্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দেশোত্মবোধক এবং রাজনৈতিক বিষয়ক কবিতা লিখতেন; কিন্তু তার বেশিরভাগ কবিতা মানব প্রেম বিষয়ে। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর সৈয়দ ইজাজ হুসাইন বলেছেন-

"ملا کی شاعری میں حب وطن، حسن، انسان دوستی اور نئی دنیا کے محور ملتے ہیں۔ ان کی شاعری ہمارے ادب کے تمام صالح میلانات کب آئینہ دار ہے اوران کی شخصیت ہماری تہذیب کی وسیع المشربی اور ہمہ گیری کی ایک زندہ تابندہ تصویر"۔[১৫৯]

আনন্দ নারায়ণ মোল্লা একজন দেশপ্রেমিক ছিলেন। তার দেশপ্রেমমূলক নজমের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো- زمینِ وطن (জমিনে ওয়াতন) চাকবাস্তের দেশপ্রেমমূলক নজম خاک ہند (খাকে হিন্দ) এর সঙ্গে তুলনা করলে মোল্লা সাহেবের এ নজম কম নয়। এ নজমে কবি দেশপ্রেমের কথা অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। কবি বলেছেন-

زمین وطن ! اے زمین وطن !☆ازل میں جہاں سب سے پہلے حیات
لیے اپنی آغوش میں کائنات☆جلاتی ہوئی شمع ذات وصفات۔[১৬০]

মোল্লা সাহেবের রাজনৈতিক নজমের মধ্যে بوڑھا مانجھی (বুড়হা মাঝি) একটি অনন্য নজম হিসেবে সব নজমের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। এই নজমে কবি জোহরলাল নেহেরুর শেষ সময়ের ঘটনা উল্লেখ করেছেন।

مانجھیو! ساتھیو! اے میرے رفیقوں! یارو!☆اے جواں سال مرے ہم سفرو!
مجھ کو دھارے سے ہٹانے کی یہ کوشش نہ کرو☆سالہاسال ہوئے میں بھی تمہاری ہی طرح۔[১৬১]

আনন্দ নারায়ণ মোল্লা অনেক বিষয়ের উপরই নজম লিখেছেন। তিনি স্বাধীনতা বিষয়ক কিছু নজম লিখেছেন। তার মধ্যে একটি অনন্য সৃষ্টি হলো- صبح آزادی সুবহে আজাদি)। এ নজমে কবি স্বাধীনতার বিষয় তুলে ধরেছেন নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয়ের মাধ্যমে-

شب مردہ کی لے لاش حسین شانوں پر☆گنگنا جس کا ابھی تک ہے بدن
رقص کرتا ہوا آتا ہے نیا طفلک صبح☆ صبح آزادی زندان وطن۔[১৬২]

আনন্দ নারায়ণ মোল্লার নজমে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মানবপ্রেম। আর এই বিষয়ের উপর অত্যন্ত সুন্দর একটি নজম- گمرہ مسافر (গোমরাহ মুসাফির)। এ নজমে কবি মানুষের দুঃখ-কষ্ট ও একাকী খুব সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন। কবি বলেন-

دنیا کے اندھیرے زنداں سے انسان نے بہت جاہانہ ملا☆اس غم کب بھول بھلیاں سے باہر کا کوئی رستا نہ ملا
اہل ملاقت اٹھتے ہی رہے بھاری بھاری تیشے لے کر☆دیوار پس دیوار ملی دیوار میں دروازہ نہ ملا۔[১৬৩]

আনন্দ নারায়ণ মোল্লা উপরোক্ত কবিতা ছাড়াও অসংখ্য কবিতা রচনা করেছেন। তার সংগ্রহের কিছু বই রয়েছে। বইগুলোর নাম হলো- جوئے شیر (জুয়ে শীর), کچھ ذرے کچھ تارے (কুচ্ছ জাররে কুচ্ছ তারে), میری حدیث عمر گریزاں (মেরি হাদিসে উমরে গ্রীজান)। মোল্লা সাহেবের কবিতা মানুষের জীবনের অনুবাদ। তার কবিতায় মানব সভ্যতার ভ্রাতৃত্ব দেখা যায়। তার ভাষা এবং সভ্যতায় যে ভালোবাসা পাওয়া যায় তা তার জীবনে এবং কবিতায় দেখা যায়। তিনি আজকের দিনেও তার কবিতার মাধ্যমে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন।

সত্বীয়াপাল আনন্দঃ সত্বীয়াপাল আনন্দ উর্দু সাহিত্যে এক বড় এবং সম্মানিত লেখক ও কবি। তার পরিচয় উপন্যাস উপ-অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি উর্দু গদ্য সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। উর্দু গদ্য সাহিত্যে তিনি যেমন উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন, তেমনি উর্দু কাব্যসাহিত্যেরও একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি কাব্যসাহিত্যের মধ্যে নজমে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি ৫০০ এর বেশি নজম লিখেছেন।[১৬৪] সত্বীয়াপাল আনন্দ আধুনিক যুগের রোমান্টিক কবি। তার নজম পড়লে বোঝা যায় যে, তার রোমান্টিকতার মধ্যে গভীরতা রয়েছে। আসলে সত্বীয়াপালের কবিতা খেয়ালী নয়, অনুভূতি প্রবন এবং স্পর্শকাতর। আধুনিক নজমে এগুলোর খুব অভাব রয়েছে। তিনি মনে করেন রোমান্টিক অনুভূতি ছাড়া কেউ ভালো কবি হতে পারেনা। তাই তিনি প্রেম বিয়ষক অধিকাংশ নজম রচনা করেছেন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ নজম হলো- سینکڑوں بار اور جینا ہے (সেকড়ু বার অওর জিনা হ্যা)। এ নজমে কবি প্রেমের জন্য হাজার বছর বাঁচার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তিনি বলেন-

آخری رات جیتے مرتے ہوئے☆چڑھتے سورج کی پہلی کرنوں کو
ارگھ دیتا ہوں اوس کا کہ مجھے☆ سینکڑوں بار اور جینا ہے![১৬৫]

সত্বীয়াপাল আনন্দ প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব পছন্দ করতেন, তাই তিনি প্রকৃতির প্রেমে পড়ে যেতেন। প্রকৃতিকে এতই ভালোবাসতেন যেন তিনি একজন প্রকৃতিপ্রেমী। দৃশ্যের বর্ণনা তার নজমে অধিকাংশ জায়গায় দেখা যায়। তার নজম ایک پینٹنگ کو دیکھ کر (এক প্রিন্টিং কো দেখ কর) এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি দৃশ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

دور پس منظر میں اک ویران، چٹیل، خشک میدان☆نسل کش ناکارگی بنجر زمین، لاولد دھرتی
نذد منظر میں فقط ایک خشک مردہ پیڑ ہے☆جو جسم کی اپنی عمودی بے ریا جومیٹری میں۔[১৬৬]

সত্বীয়াপাল আনন্দ একজন রোমান্টিক কবি হিসেবে পরিচিতি পেলেও তিনি একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন। তিনি আমেরিকায় ইংরেজির প্রভাষক হিসেবে চাকরি করেছেন। তিনি ইংরেজি ও উর্দু দুটো ভাষায় নজম লিখতেন। চাকরির সুবাদে তাকে আমেরিকায় যেতে হয়েছিল। সেখানে গিয়ে তার দেশের প্রতি যে টান অনুভব করেন তা অতুলনীয়। তিনি দেশের প্রতি অনেক শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। দেশের প্রতি তার যে অনুরাগ রয়েছে, তার بینا نا بینا (বীনা না বীনা) নজমটি পড়লে সহজেই তা অনুধাবন করা যায়। যেমন-

یہ راز مجھ پہ کھلا☆وہ مرا رفیق نہ تھا
جو ساتھ چلتا رہا، ہم سفر نہ تھا میرا☆کہ آنکھیں میری تھیں چمڑے کے خول اس کے تھے![১৬৭]

সত্বীয়াপাল আনন্দের বেশিরভাগ নজমে বাস্তবের ছাপ রয়েছে। তার নজমগুলো কাল্পনীক নয়, বাস্তবের দিকে দৃষ্টি রেখেই তিনি নজম রচনা করতেন। কবির এই ধরনের নজমের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নজম হলো- نیند میں چلنے والے ہم تم (নিন্দ মে চলনে ওয়ালে হাম তুম)। এই নজমে কবি বোঝাতেন চেয়েছেন যে, ঘুমিয়ে না থেকে সবারই জেগে উঠা প্রয়োজন এবং ঘুমিয়ে থেকেও আগে চলার স্বপ্ন দেখা যায়। কবি বলেন-

کچھ بھی تو اب یاد نہیں ہے☆کیوں نکلے تھے گھر سے منزل کیا تھی اپنی!
بے مقصد، بن بارش، ہم آوارہ بادل☆کیو سر گرم سفر ہیں یارو؟
نیند میں چلنے والے ہم تم۔[১৬৮]

সত্বীয়াপাল আনন্দ যৌনতা বিষয়েও নজম লিখেছেন। আনন্দ সাহেবের পাশ্চাত্য পড়াশুনা এবং আমেরিকায় চাকরির সুবাদে তিনি সেখানকার সমাজকে গভীরভাবে অবলোকন করেছিলেন। তাই তিনি এই বিষয়ের উপর নজম লিখতে উৎসাহ পেয়েছিলেন। যৌনতা বিষয়ক তার অবিস্মরণীয় একটি নজম হলো- جسم اور جنسی (জিসম অওর জিন্সী)। এই নজমে কবি বলেন-

جنس تو جسم کی ضرورت ہے☆جنس کب اہمیت کو کم نہ کرو![১৬৯]

উপরোক্ত নজম ছাড়া সত্বীয়াপাল আনন্দ অগনিত নজম লিখেছেন। সেই নজমগুলো বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। সেগুলো হলো- لہو بولتا ہے (লাহু বোলতা হ্যা), جو نسیم خندہ چلے (জো নাসিম খন্দাহ চলে), مجھے نہ کر وداع (মুঝে না কর বিদা), میرے اندر اک سمندر (মেরে আন্দর এক সমুন্দর), پتھر کی صلیب (পাথ্থর কি সালিব), وقت لاوقت (ওয়াক্ত লা ওয়াক্ত), تتھاگت نظمیں (তথাগত নজমি)।

পণ্ডিত ব্রজ মোহন দাতাতরিয়া কাইফীঃ পণ্ডিত ব্রজ মোহন দাতাতরিয়া কাইফী ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে সেন ইস্টেফিন কলেজ দিল্লী থেকে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি উর্দু কাব্যসাহিত্যে একজন সমুজ্জ্বল কবি ছিলেন। তিনি তার জীবনে অনেকগুলো নজম লিখেছেন। তার কবিতার সংগ্রহ

হলো- خم خانہ کیفی (খম খানা কেইফী), مراۃ خیال (মুরাত খেয়াল) ও تمثیلی مشاعرہ (তামছিলী মুশায়েরাহ)।[১৭০]

চৌধুরী জগত মোহন রাওয়ানঃ চৌধুরী জগত মোহন রাওয়ান কাব্যসাহিত্যের একজন অসাধারণ কবি। তিনি ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ১০ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। তার বাবার নাম চৌধুরী গংগা প্রসাদ। তিনি গজল, মছনবী, রুবাঈ এবং নজম লিখেছেন। তবে নজমের দিকে তার ঝোঁক বেশি ছিল। তার নজমের সংগ্রহ হলো- روح رواں (রূহ রাওয়ান)।[১৭১]

পণ্ডিত মেলারাম অফাঃ পণ্ডিত মেলারাম অফা ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের বিখ্যাত জেলা শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম পণ্ডিত ভগতরাম। তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সাংবাদিকতার পেশা গ্রহণ করেন।[১৭২] পণ্ডিত মেলারাম অফা ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে যখন তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয় পড়তেন, তখন থেকে কবিতা লেখা শুরু করেন। আল্লামা ইকবাল তার কবিতার প্রশংসা করতেন। তার নজম فرنگی (ফিরিঙ্গী) এর কারণে তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তার কবিতার সংগ্রহ হলো- روح نظم (রূহে নজম), سوز وطن (সুজ ওয়াতন) (১৯৪১)।[১৭৩]

পণ্ডিত বদরীনাথ সুদর্শনঃ পণ্ডিত বদরীনাথ সুদর্শন উর্দু গদ্য সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত নাট্যকার, ঔপন্যাসিক এবং ছোটগল্পকার। তার পরিচয় উপন্যাস উপ-অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি গদ্য সাহিত্যকে তার লেখনীর মাধ্যমে অনেক সমৃদ্ধ করেছেন। তবে তিনি কাব্যসাহিত্যেও কিছুটা অবদান রেখেছেন। তিনি তার জীবনে অনেকগুলো নজম লিখেছেন, তবে তার নজমের সংগ্রহ হচ্ছে- گلدستہ سخن (গুলদাস্তা সাখন)।[১৭৪]

গোবিন্দ প্রসাদ আফতাবঃ গোবিন্দ প্রসাদ আফতাব দাপটের সাথে উর্দু কাব্য ও গদ্যসাহিত্যে নিজের স্থান দখল করে নিয়েছেন। উপন্যাস উপ-অধ্যায়ে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি গজল, নজম ও কাসিদায় বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। তার নজমের সংগ্রহ হলো- نورتن (নো রতন)।[১৭৫]

সুরজ নারায়ণ মেহেরঃ সুরজ নারায়ণ মেহের গজলে যেমন অবদান রেখেছেন, তেমনি নজমেও তার বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর নজম লিখেছেন। কিন্তু তিনি ইংরেজি কবিতা

উর্দুতে খুব চমৎকারভাবে অনুবাদ করেছেন। তার অনুবাদকৃত নজমের মধ্যে سادھو (সাধু) নজমের উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হলো-

سامنے وہ جو شمع ہے روشن ☆ہاں ذرا اے مہاتما اٹھ کر
راہ گم کردہ اور ہو تنہا ☆اور یہ جنگل فراخ لیے ہیں۔[১৭৬]

তার অনুবাদকৃত বেশির ভাগ নজম 'কালামে মেহের' বইয়ে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সুরজ নারায়ণ মেহের বাচ্চাদের নিয়েও নজম লিখেছেন। উর্দু কাব্যসাহিত্যে তিনি বাচ্চাদের নিয়ে নজম লিখে স্বনামধন্য কবি ইসমাঈল এর মতো খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি বাচ্চাদের বিষয় ছাড়া আরো অনেক নজম লিখেছেন। তার নজমের সংগ্রহ হলো- یاد رکھو (ইয়াদ রাখো)।

২.৩ মছনবী

নজমের পরে কাব্যসাহিত্যে যে শাখাটি আসে তা হলো কাসিদা; কিন্তু কাসিদায় অমুসলিম কবিগণের তেমন কোন অবদান ছিল না। তাই নজমের পরে মছনবী কাব্যসাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান তুলে ধরা হলো। মছনবী আরবি শব্দ থেকে ফারসি এবং ফারসি হতে উর্দু ভাষায় এসেছে।[১৭৭] মছনবী একটি দীর্ঘ কবিতা যার মধ্যে একটি গল্প বা কোন ঘটনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়। মছনবীর সংজ্ঞা আজিমুল হক জুনায়দী এভাবে দিয়েছেন-

"مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جو مسلسل ہو اور اس میں کوئی واقعہ یا داستان وغیرہ نظم کی جائے۔"[১৭৮]

মছনবী কাব্যসাহিত্যে বহু সংখ্যক অমুসলিম কবি অসাধারণ অবদান রেখেছেন।

দয়া শংকর নাসিমঃ তার আসল নাম পণ্ডিত দয়া শংকর এবং উপাধি নাম নাসিম। তার পিতার নাম পণ্ডিত গংগা পরশাদ কোল যিনি লক্ষ্মৌতে বসবাস করতেন। তিনি ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৭৯] তিনি گلزار نسیم (গুলজারে নাসিম) মছনবীটি রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। 'গুলজারে নাসিম' মছনবী পণ্ডিত দয়াশংকর নাসিমের একটি প্রেমের কবিতা। এই কবিতার মূল গল্পটি ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে এজাতুল্লাহ বাঙ্গালী ফারসি ভাষায় 'কাসন গুল বাকাওলী' নামে তৈরি করেছিলেন। তৃতীয় বারের মতো পণ্ডিত দয়াশংকর নাসিম উর্দু কবিতাটি পরিবেশন করেছিলেন এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে এটি 'গুলাজারে নাসিম' মছনবী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।[১৮০] এই কবিতাটি প্রথম রশিদ হাসান খান সংকলন করেছিলেন। রশিদ আহমেদ সিদ্দিকী মছনবীটি সম্পর্কে বলেছেন-

"شعر وشاعری کے جن پہلوں کے اعتبار سے لکھنؤ بدنام ہے گلذار نسیم نے انہیں پہلو سے لکھنؤ کا نام اونچا کیا ہے زبان کو شاعری اور شاعری کو زبان بتا دینا کوئی آسان کام نہیں۔"[١٨١]

অধ্যাপক এহতেসাম হোসাইন গুলজার নাসিমকে কাব্য ও শৈল্পিক সৃষ্টির একটি অলৌকিক ঘটনা বলেছেন। পূর্বে জেন আল-মুলুক নামে এক অতি উচ্চ বেদী রাজা ছিলেন। তার চার পুত্রসন্তান ছিল এবং তার পঞ্চম পুত্রসন্তান তাজ-উল-মুলুক খুব সুদর্শন এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। জ্যোতিষীরা বলেছিলেন যে, তাকে দেখে রাজার চোখ এতই আলোকিত হবে যে, তিনি আর দেখতে পাবেন না। একদিন রাজা শিকার থেকে ফিরছিলেন হঠাৎ তার দৃষ্টি তাজ উল মুলুকের দিকে পড়ল এবং রাজার চোখ থেকে আলো বেরিয়ে গেল। রাজা অনেক চিকিৎসা করলেন, কিন্তু রাজার চোখে দৃষ্টি ফিরল না। অবশেষে তিনি একজন অতি বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ চক্ষু ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। রাজার চোখ দেখে তাকে জানালেন যে, বাকৌলির বাগানে একটি ফুল রয়েছে, সেই ফুলের পাপড়ি লাগালে রাজার চোখের আলো আসতে পারে। তাই চার রাজকুমার গুল বাকৌলির সন্ধানে রওনা দিল। তার সেনাবাহিনী এমন এক মাঠ পেরিয়ে গেল যেখানে তাজ উল মুলুকও ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন এই সৈন্য কোথায় যাচ্ছে? সৈন্যদের মধ্যে একজন জবাব দিয়েছিল যে, রাজা জায়ন আল মুলুক তার ছেলের চোখের দিকে দৃষ্টিপাত করে অন্ধ হয়ে গিয়েছেন। তার চিকিৎসার জন্য ইরামের কাছ থেকে ফুল আনতে সবাই যাচ্ছে। রাজপুত্রও একজন সৈনিকের সাথে হাঁটলেন। পথে ফেরদৌস নামে একটি জায়গা ছিল সেখানে দিলবার নামে একজন পতিতা থাকতেন। তিনি তার অভ্যন্তরে ধনী ব্যক্তিদের ডাকতেন। তার সাথে দাবা খেলতেন এবং তার আনন্দের সাথে সবকিছু নিয়ে তাকে বন্দী করে ফেলতেন। এই চার রাজকুমারও তার সাথে জড়িয়ে পড়ে এবং সবকিছু হারিয়ে তারা বন্দী হয়েছিল। তাজ-উল-মুলুক যখন সেখানে গেলেন, তখন একজন ধাত্রী ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন যার ছেলে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। তার ছেলের মতো রাজপুত্রের আকৃতি হওয়ায় তিনি তাকে ভিতরে নিয়ে যান এবং রাজকুমার তার ভাইদের পরিণতির কথা শুনেন। এই পরিণতির কথা শুনে রাজকুমার কয়েকদিন সেখানে ঘোরা-ফেরা করেন এবং দাবা খেলোয়াড়ের কাছে থেকে দাবা খেলা শিখেছিলেন। তারপরে তিনি দিলবারের সাথে দাবা খেলেন এবং বন্দীদের মুক্ত করতে তাকে পরাজিত করেছিলেন। তিনি তার কাছ থেকে জিনিসপত্র নিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাকে তার ক্রীতদাস দাস বানিয়েছিলেন। রাজপুত্র দিলবারকে বললেন, আমি ইরাম যাচ্ছি, আমি ফিরে আসার সময় তোমার কাছে আসব। ততক্ষণ এগুলো এখানে থাক। দিলবার বলেছিল যে, ইরাম হলো পরীর দেশ এবং সেখানে মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। মানুষ ও পরীর মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা নেই। রাজকুমার হেসে জবাব দিলেন যে চেষ্টার মাধ্যমে সব কঠিন কাজ সহজ হয়ে যায়। যুবরাজ তাজ-উল-মুলুক সেখান থেকে হেঁটে

একটি প্রান্তরে গিয়েছিলেন সেখানে ইরামের সীমানা দেখা যাচ্ছিল। ইরামের একজন মহান রক্ষী ছিল, সে দীর্ঘ দিন ক্ষুধার্ত ছিল। রাজপুত্রকে দেখে সে খুশী হলো যে তার খাবার এসেছে। দৈত্যটি খুশিতে লাফাতে থাকল। রাজকুমার একটি বড় পাত্রে রান্না করলেন এবং দৈত্যকে খাওয়ালেন। এতে দৈত্য খুশি হয়ে বলল এর বিনিময়ে তোমাকে কী দিতে পারি? রাজকুমার প্রথমে দৈত্যের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি ইরাম যেতে চান। দৈত্য বলল সেখানে যাওয়া মুশকিল। সে প্রতিশ্রুতি ভাঙতে পারবে না। তাই দৈত্য তার এক ভাইকে ডেকে রাজপুত্রের প্রতি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। সে তার বোন হিমলাকে একটি চিঠি লিখেছিল এবং বলেছিল যে, উনি আমার কাছে বিশেষ মানুষ। তিনি যা চান তাই পেতে সহায়তা করো। রাজপুত্র চিঠি নিয়ে তার কাছে গেলেন। তার বোন দৈত্যের চিঠিটা পেয়েছিল এবং সহায়তাও করেছিল। বাকৌলির বাগানের সুড়ঙ্গটি মাটি থেকে খনন করা হয়েছিল। বাকৌলিতে এসে তিনি বাকৌলির ফুলটি টেনে এনেছিলেন এবং অত্যন্ত সুরক্ষার সাথে রেখেছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে বাকৌলি বালাদ্রীতে ঘুমাচ্ছে। প্রথমে তিনি বাকৌলিকে জাগাতে চেয়েছিলেন তারপর তিনি বাকৌলিকে না জাগিয়ে নিজের আংটিটি ফেলে তা বাকৌলির উপর রেখে দেন। ফিরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে হিমলা তাকে দুটি চুল দিয়েছিল এবং বলেছিল যে, আমার যখন প্রয়োজন হবে তখন তিনি চুলগুলো পোড়ালে সে সহায়তা করবে। তারপর রাজকুমার সমস্ত লোককে দিলবার থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের দেশে চলে গেলেন। স্বদেশের নিকটে পৌঁছে তিনি অন্ধ ভিক্ষুকের চোখের উপর একটি ফুল ঠেকালেন এবং তার দৃষ্টি আবার ফিরে আসে। চারজন রাজকুমার যখন আসল ফুল আনতে ব্যর্থ হয়, তারা প্রতারণার জন্য নকল ফুল নিয়েছিল এবং বড়াই করতে শুরু করেছিল। ভিক্ষুক বলল: আসল ফুল সেই ব্যক্তির নিকটে যিনি আমার চোখ ভালো করেছিলেন। চারজন রাজকুমার তার কাছে গিয়ে তাকে ফুল দেখিয়ে বলল যে আমরা আসল ফুল নিয়ে এসেছি। তাজ-উল-মুলুক তার পকেট থেকে বের করে আসল ফুলগুলো দেখিয়ে দিলেন। সুযোগ পেয়ে তারা ফুলগুলো ছিনিয়ে নিয়ে বাড়ি গেল। তারা জায়ন-উল-মুলুকের চোখে একটি ফুল রেখেছিল, এতে তার চোখ ভাল হয়ে গেল এবং সবাই আনন্দ করল।

অন্যদিকে বাকৌলি পরী যখন ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুতে পুলের কাছে গিয়েছিল, তখন সে দেখতে পেল যে, ফুলটি অনুপস্থিত। বোকৌলি ফুলের সন্ধানে প্রতিটি বাগান, প্রতিটি বন এবং প্রতিটি শহর ঘুরে বেড়াতে শুরু করে। তবে কোথাও ফুলের সন্ধান পাওয়া যায়নি।। অবশেষে সে শহরে পৌঁছে গেলো, যেখানে ফুলটি রাজার চোখে আলো এনেছিল এবং সবাই সেখানে সর্বত্র উত্তেজনা এবং আনন্দিত হয়েছিল। যাদুতে সে একজন পুরুষ হয়ে রাজার ঘোড়া যেখান থেকে আসছিল সেখানে গিয়েছিল। সৌন্দর্য দেখে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে? তুমি কোথা থেকে এসেছ? সে জবাব

দিল যে আমার নাম ফারাহ। আমি ফিরোজের ছেলে এবং আমি একজন মুসাফির। তার সৌন্দর্য ও বুদ্ধি দেখে রাজা তাকে তার সাথে নিয়ে গেলেন এবং তাকে তার মন্ত্রী করলেন। একদিন তাজ-উল-মুলুক সম্পর্কে কথা বলার সময় সে বুঝতে পেরেছিল যে, ঠিক এটিই ছিল। যখন চার ভাই তাজ-উল-মুলুকের কাছ থেকে ফুল ছিনিয়ে নিয়েছিল, তখন তিনি খুব বিরক্ত হন। হিমলা দেওয়ানির দেওয়া চুল পুড়িয়ে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সে উপস্থিত হয়। রাজকুমার এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, গুলশানে নিগারিগুলো তৈরি করা উচিত এবং গাছ লাগানো উচিত। হিমলা দেবী তার কথা মতো সবকিছু করে দিল। তারপর রাজা তার চারপুত্র ফারাহ উজির এবং ধনীদের সাথে নিয়ে ঐ গুলশানে নিগারীতে এসেছিলেন। তাজ-উল-মুলুক তার প্রতি শ্রদ্ধা জানান। ঘটনাক্রমে সেখানে তার পুত্র রাজকুমারের পরিচয় জানে এবং রাজা ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। রাজমুকার বাদশাহকে বলেছিলেন যে, তিনি নির্জনে দুজনের সাথে সাক্ষাত করতে চান। রাজা বললেন তাদের ডেকে পাঠাও। তাজ-উল-মুলুক দিলবারকে ডেকে পাঠালেন, দরজার কাছে এসে দিলবার বলেছিল এই চারজনই দোষী, মিথ্যাবাদী, দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। দিলবার রাজকুমারের সাথে ঘটেছিল এমন সব গল্প বর্ণনা করেছিল যা গোপন ছিল তা প্রকাশ করে এবং পরীর আংটিটি প্রমাণ হিসেবে দেখিয়েছিলেন। চারজন মিথ্যাবাদী রাজকুমার বিব্রত হয়ে চলে গেল। তখন দিলবার ও মাহমুদা দুজনেই রাজার কাছে এসে তার পায়ে চুম্বন করলো এবং রাজা তাদের পুরস্কৃত করলেন। ফারাহ উজির (বাকৌলি) কিছু বলতে চেয়েছিল কিন্তু স্বার্থের জন্য সে চুপ করে রইল। সে পুরো পরিস্থিতি শোনে। ফারাহ উজির যাদু থেকে বাকৌলির পরীতে উড়ে তার বাগানে আসে। বাকৌলি একটি চিঠি লিখে সামান পরীকে যুবরাজের কাছে চিঠিটি নিয়ে যেতে বলে। সামান পরী চিঠিটি তাজ-উল-মুলুককে পৌঁছে দেয়। যুবরাজ চিঠিটি পড়ে বাকৌলিকে আরেকটি চিঠি লিখেছিলেন। এর মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে। তাজ-উল-মুলুক ছিল মানুষ; কিন্তু বাকৌলি ছিল পরী। রাতে পরী রাজার বাড়িতে নাচ ও গান করতে যেতো সেটা যুবরাজ বুঝতে পেরেছিল। এক সময় বাকৌলিকে রাজা এক মাজারে পুতে ফেলেছিল সেখানে সে পাথরের মূর্তি হিসেবে ছিল।

এদিকে রাজার মেয়ে চিত্রাওয়াত যুবরাজের প্রেমে পড়ে এবং তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। যুবরাজ লুকিয়ে বাকৌলির সঙ্গে দেখা করতো, এটি চিত্রাওয়াত বুঝতে পেরে সেই মাজারের মূর্তিটি তুলে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই মূর্তিটি ফেলে দিলে এক কৃষকের ঘরে কন্যা হিসেবে পরীর জন্ম হয়। তার সৌন্দর্য ও যৌবনের কথা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে, এই খ্যাতি শুনে তাজ-উল-মুলুক তাকে দেখতে গেলেন। দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে, সেই মেয়েটি তার পরী। সামান পরীর সাহায্যে বাকৌলি ও তাজ-উল-মুলুক গুলশান-নিগারিতে ফিরে আসেন। দীর্ঘদিন হারিয়ে যাওয়ার পর রাজপুত্র

ফিরে এলে রাজ্যের সবাই আনন্দ করতে থাকে। তাজ-উল-মুলুকের সাথে বাকৌলী আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই মছনবীর সমাপ্তিতে কবি বলেন-

حاصل ہوئی ان گلوں بے خار ☆ سیر شب زلف و صبح رخسار
جس طرح انھیں بہم ملایا ☆ بنچھڑے ہوئے سب ملیں خدایا![১৮২]

মুন্সী মাখন লালঃ মুন্সী মাখন লাল এর জন্ম তারিখ পাওয়া খুব মুশকিল। তবে তিনি কায়স্থ ছিলেন। তার দেশ মালুফ শাহজাহানাবাদ ছিল। তিনি কিছু সময় লক্ষ্ণৌতেও ছিলেন। তিনি ইনশার সাথে পরামর্শ করতেন। তিনি অত্যন্ত সৃজনশীল, বিনয়ী ও মুক্তমনা ছিলেন। তিনি ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন।[১৮৩] তার একটি মছনবী পাওয়া গেছে- سنگھاسن بتی (সিংহাসন বিতী)। এতে ৩২টি পুতুল রয়েছে, যা রাজা বকর মজিদের সাহসিকতা ও মুক্তি সম্পর্কে রয়েছে।

গল্পটি হলো এক বাদশাহ চন্দ্র কিরণ এক সিংহাসন তৈরি করেছিলেন এবং তিনি এটা মহাবেদজীকে দিয়েছিলেন। মহাবেদজী আবার রাজা ইদোরকে দেন, ইদোর আবার আজীনের রাজা বকর মজিদকে দেন। বকর মজিদের পুত্র করম সিন বাদশাহ হয়েছিলেন এবং তিনি এ সিংহাসনে বসতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সিংহাসনে থাকা ৩২টি পুতুল তাকে তা করতে নিষেধ করেছিল। তখন তিনি সেই সিংহাসনটি মাটির নীচে সমাধিস্থ করেছিলেন। রাজা ভোজের সময় এলে তিনি এ সিংহাসনটি সরিয়ে নিয়ে বসতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাকেও পুতুলগুলো নিষিদ্ধ করেছিল। তাদের নিষেধ না শুনে রাজা ভোজ সিংহাসনে বসেছিলেন। বসার সাথে সাথেই তিনি অন্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু যখন তিনি বকর মজিদের নাম নিলেন তখন তার চোখ ভাল হয়ে গেল। বকর মজিদই শুধু এই সিংহাসনের একমাত্র দাবিদার। এই পুতুলগুলো আসলে রাজার অভ্যন্তরে পরী ছিল যারা তাদের অপরাধের শাস্তি হিসেবে পাথর প্রতীমা তৈরি করে এবং সিংহাসনে বন্দী ছিল এবং তারা রাজা ভোজকে হয়রানি শুরু করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি যদি রাজা ভোজকে এই বিংশতম কাহিনিগুলো বলেন এবং তা সম্পূর্ণ হওয়ার পরে তারা মুক্তি পাবে। যেহেতু সেই অর্থের গল্পগুলো সম্পন্ন হয়েছে এবং সিংহাসনের রহস্য উন্মোচিত হয়েছিল সেহেতু পরীরা আকাশে উড়ে গেল। রাজা ভোজ পরীদের আকাশে চুল উড়ার শব্দ শুনতে পেলেন। রাজা ভোজ যখন এই অদ্ভূত কাহিনি শুনলেন তখন তিনি সিংহাসনটি আবার স্থায়ী ভূমিতে ফেলে দিলেন।

পণ্ডিত অমর নাথ হালুঃ পণ্ডিত অমর নাথ হালু তার নাম এবং আশফতা তার উপাধি। তিনি দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৮৪] পণ্ডিত অমর নাথ ছিলেন একজন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। যৌবনে তার দাদা কাশ্মির থেকে দিল্লীতে পাড়ি জমান। আশফতা ছিলেন তার

সময়ের বিখ্যাত গজল কবি। বেশিরভাগ ভাষ্যকার তাকে গজলকার কবি হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যাই হোক তার মছনবী প্রথম দিকের মছনবীর মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য। এই মছনবীর নাম گلشن ہفت رنگ (গুলশান হাফত রং)। প্রায় দুশো পৃষ্ঠার সমন্বয়ে পণ্ডিত হর গোপাল তোফতার তত্ত্বাবধানে এই মছনবী প্রকাশিত হয়েছিল। এই মছনবী শুরু হয় হামদ দিয়ে। আসল গল্পটি শেষ হয় যখন হাতেমতাই তার জন্মভূমি ছেড়ে চলে যান। হাতেমের চরিত্রটি এমন একজন ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত যিনি একে অপরের পক্ষে কাজ করেন। তাকে অনেকে একটি কল্পিত চরিত্র বলে মনে করেন। আরবের বণি উপজাতির প্রধান হাতেম ছিলেন একজন সত্যিকারের মানুষ, যিনি অন্যের উপকারে আসার জন্য তার জীবনের লক্ষ্য তৈরি করেছিলেন। এগুলো পঞ্চম শতাব্দীতে ঘটেছিল। লোকেরা একবার ইসলামের নবীকে জিজ্ঞাসা করল সেরা মানুষ কে? তিনি বলেন, সর্বোত্তম মানুষ হলো তিনিই যিনি মানুষের উপকার করেন। অতএব বলা যায় যে, হাতেম নিঃসন্দেহে একজন ভালো লোক ছিলেন। আশফতা তার মছনবীতে হাতেমকে হিরো হিসেবে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন, তাতে বোঝা যায় যে, আশফতা নিজেই এই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। এই মছনবী থেকে প্রকাশিত হয় যে, আশফতার গল্প বলার অসীম ক্ষমতা ছিল। এই মছনবীতে তিনি দিল্লীর বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন-

عجب پر فضا گلشن لالہ زار ☆ وہ دلی کہ دل ہائے باغ و بہار
مصفا در و بام، رنگیں تمام ☆ ہر ایک خشت پر لاجوردی کا کام
وہ راستہ، وہ بازار رشک قصور ☆ دکانیں برابر کہ بین السطور۔[১৮৫]

অশোক প্রেমপাল দেহলবীঃ অশোক প্রেমপাল দেহলবী একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। অশোক তার উপাধি নাম এবং প্রেমপাল দেহলবী তার নাম। আশোক দিল্লীর প্রাচীন বাসিন্দা। তার বাবার নাম জনাব বেলাইতি রাম। তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ৫ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লীতে শিক্ষিত হয়ে সরকারি সামরিক পত্রিকা 'সমাচার' এর সাথে যুক্ত হন। তিনি আলিম, ফাজিল ও এম. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি شکنتلا (শকুন্তলা) নামে একটি মছনবী লিখেছেন, যা ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৮৬] মহাভারতের এই কাহিনিটিতে বলা হয়েছে যে, একদিন রাজা বশিন্ত একটি শিকারে গিয়ে তিনি একটি আশ্রমে কানুরশ্রীর পরীর মতো সুন্দর মেয়ে শকুন্তলাকে দেখে মুগ্ধ হন। শকুন্তলা কানুরশ্রীর আশ্রমে পালিত হয়েছিল এবং আপাত দৃষ্টিতে সে তার মেয়ে কিন্তু বাস্তবে সে তার মেয়ে ছিলনা। প্রকৃতপক্ষে শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের কন্যা এবং একটি ষড়যন্ত্রের মাঝে অন্তঃকরণ অপেরা মেনকার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিল। জন্মের পরে মেনকা গোপনে মেয়েটিকে

কানুরশ্রীর আশ্রমে রাখে। কানুরশ্রীর দৃষ্টি যখন ঐ মেয়েটির উপর পড়ল, তিনি তাকে তার আশ্রমে নিয়ে এলেন এবং তাকে কন্যার মতোই লালন-পালন করেছিলেন এবং এজন্যই সে তার মেয়ে হয়েছিল। রাজা বশিন্ত শকুন্তলাকে দেখে তার প্রেমে পড়ে যান এবং শকুন্তলাও রাজার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠে। রাজা শকুন্তলাকে রেখে কিছু দিন পরে তার রাজ্যে ফিরে যান। ঐ সময় সন্তান সম্ভবা হয় শকুন্তলা। রাজা যাওয়ার সময় তার চিহ্ন হিসেবে শকুন্তলাকে একটি আংটি দিয়ে যান। নিজের রাজ্যে দারদাসারশীর অভিশাপের কারণে রাজা শকুন্তলাকে পুরোপুরি ভুলে যান এবং শকুন্তলার কোন সংবাদ নেননা। কিছু দিন অপেক্ষা করার পরে শকুন্তলা তার মা মেনকা এবং ঐ আংটি নিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেল। আংটিটি দূর্ঘটনাক্রমে পানিতে পড়ে যায়। শকুন্তলা মনে করে যে রাজা তাকে দেখেই চিনতে পারবেন এজন্য সে রাজার দরবারে পৌঁছেছে; কিন্তু রাজা শকুন্তলাকে স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দেননা। এই ঘটনায় শকুন্তলার সহচররা যারা অন্তরে উচ্চ আশা নিয়ে আশ্রম থেকে তার সাথে এসেছিল, তারা শকুন্তলার পক্ষ ছেড়ে পালিয়ে যায়, কিন্তু শকুন্তলার মা মেনকা থেকে যায়। শকুন্তলা অনেক রেগে যায় এবং দরবারে রাজাকে অভিশাপ দেয়; কিন্তু এর কোনও প্রভাব হয় না। অসহায় হয়ে মেনকা তার মেয়ে শকুন্তলাকে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যায় যখন তার সন্তানের জন্মের সময় ঘনিয়ে আসে তখন সে পাশের একটি জঙ্গলে বসে। সেখানে শকুন্তলা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছিল, যার মধ্যে রাজাদের অনেক চিহ্ন দেখা যায়। ঘটনার এক পর্যায়ে শকুন্তলা মাছের পেট থেকে সেই আশার আংটিটি নিয়ে আসে এই আংটিটি রাজাকে দেখায় যা থেকে রাজার স্মৃতি ফিরে এসেছে। ফলস্বরূপ, তথ্য পাওয়ার পরে, শকুন্তলাকে বাচ্চা সমেত সম্মান দিয়ে দরবারে ডাকা হয়েছে। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বাচ্চা ভরতকে দেখে রাজা এতটাই মুগ্ধ ও আনন্দিত যে তিনি তার রাজ্যভিষেকের ঘোষণা দেন এবং সময় এলে এই ভরতই হিন্দুস্তানের রাজা হবে। কিছু লোক হিন্দুস্তানের নাম 'ভারত' হিসেবে বিখ্যাত হওয়ার জন্য 'ভরত' নামটিকে দায়ী করেন। এই কাহিনিটি কবি অশোক কবিতার মাধ্যমে চিত্রায়িত করেছেন।

মুন্সী আমির জাওলাঃ মুন্সী আমির জাওলা শঙ্কর বারিলীতে বসবাস করতেন এবং প্রফুল্ল কবি ছিলেন। তার বাবা মুন্সী গঙ্গাদত্ত তার ভালো কাজের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।[১৮৭] তিনি واقع عذاب (ওয়াফী' আজাব) নামে একটি মছনবী লিখেছেন। এর মধ্যে ঈশ্বরের সারমর্মটি বোঝান হয়েছে, এতে সন্দেহ নেই যে, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন সত্ত্বা আছেন, যিনি শাস্তি প্রতিরোধকারী। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে "আর যদি আল্লাহ আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন তবে তা অপসারণ করার মতো কেউ নেই।"

এই মছনবী ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল যা প্রায় সাড়ে চারশ আশ'আর রয়েছে। এর ভাষা সহজ-সরল এবং প্রাঞ্জল। এই মছনবীতে মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা করা হয়েছে। কবি বলেন-

اسی کی ہر طرف جلوہ گری ہے ☆ کہیں زہرہ، کہیں وہ مشتری ہے
جدا ہے سب سے لیکن ہے ہر اک جا ☆ دوئی سے دور ہے، یکتا ہے یکتا
بیان کیا کر سکے یہ پیکر خاک۔[১৮৮]

আসাদ মুন্সী গীরধারী লালঃ আসাদ মুন্সী গীরধারী লাল লক্ষ্মৌয়ের একটি শিক্ষিত পরিবারের সদস্য ছিলেন। তার বাবা মুন্সী রাম দয়াল লাল নিজ জেলা আওতাম থেকে লক্ষ্মৌতে চলে এসেছিলেন। আসাদ একজন মিষ্টি কথার কবি ছিলেন। তিনি একটি মছনবী লিখেছেন যার নাম منظومہ فرخ (মানজুমা ফ্রখ)। এটি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৮৯] এই মছনবী কাব্যিক উপমায় পূর্ণ। আঞ্জুম একটি সাধুর নগ্নতাটিকে সুজন অর্থাৎ সূচের নগ্নতার সাথে তুলনা করেছেন। কারণ সূচ একটি নগ্ন বস্তু যা সবার পর্দার বাইরে চলে যায়। এখানে একটি নদীর তীরের কথা উল্লেখ আছে যেখানে সাধুজি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

বখশি মুন্সী সুরজঃ বখশি মুন্সী সুরজ খাইরাবাদ জেলার সীতাপুরের বাসিন্দা পীয়ারে লাল বখ্শী শ্রীবাস্তরের পুত্র ছিলেন। তিনি ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি উর্দু ও ফারসি উভয় ভাষারই শিক্ষক ছিলেন। তিনি তার জীবনে অনেকগুলো মছনবী লিখেছেন। সেগুলো হলো-

مثنوی بخش (মছনবী বখশ), مہاراج نامہ (মহারাজ নামা), پہلی نامہ (পেহলি নামা), طلسم نامہ (তালসিম নামা), حیات نامہ(হায়াত নামা), انجم نامہ (আঞ্জুম নামা)।[১৯০]

মুন্সী জাওলা প্রসাদ বারকঃ মুন্সী জাওলা প্রসাদ ২১ অক্টোবর ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোসবা মুহাম্মদী জেলা লাখিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। শহরটি সীতাপুরের নিকটে, তাই কিছু লোক এটিকে সীতাপুরী হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তার বাবার নাম মুন্সী শিব দয়াল। বারক এল. এল. বি পরীক্ষায় পাস করেন এবং ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন। তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে আদালতে জজ হয়েছিলেন। বারক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও জ্ঞানবান ছিলেন। শৈশব থেকেই তার কবিতার প্রতি আগ্রহ ছিল এবং তার পুরো জীবন ভাষা ও সাহিত্যের আরাধনায় কাটিয়েছেন। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে তিনি লক্ষ্মৌতে প্লেগ রোগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[১৯১] বারক দুইটি মছনবী লিখেছেন। তা হলো- (১)

معشوق فرنگ (মা’শুকা ফেরঙ্গ), যা শেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়েট এর অনুবাদ ছিল এবং (২) مثنوی بہار (মছনবী বাহার)। এই মছনবীতে বাগান ও বসন্তের দৃশ্য প্রস্ফুটিত হয়েছে। কীভাবে বীজ থেকে একটি ফুল প্রস্ফুটিত হয় তা বোঝাতে কবি এই মছনবীতে বলেন-

بوٹا ساوہ قد۔ بہار کے دن ☆ اٹھتی کوپل۔ ابھار کے دن

گھونگٹ اک ناز سے نکالے ☆ سہرا پھولوں کا منھ پہ ڈالے[١٩٢]

শিয়াম সুন্দরলালঃ শিয়াম সুন্দরলাল সীতাপুর জেলার ইসমাইলপুরের বাসিন্দা। তার বাবার নাম মুন্সী কিশন প্রসাদ এবং তার দাদা ছিলেন মুন্সী সীতল প্রসাদ একজন আইনজীবী। সুন্দরলাল ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ফারসি ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন এবং মৌলভী উজির আহমদ তার শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি ইংরেজি পড়ার জন্য সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং বি. এ. পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। তার পর তিনি তার মায়ের অসুস্থ হওয়ার খবর শুনে বাড়িতে চলে আসেন এবং পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। সুন্দরলাল অত্যন্ত ভাগ্যবান যিনি মায়ের সেবা ও সান্ত্বনাটিকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন। তার মা ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর দুই বছর পর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তার বাবাও মারা যান। তার চাচা বাবু হরপ্রসাদ তাকে সাহায্য করেন এবং তিনি ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে এল. এল. বি পরীক্ষায় পাস করেন এবং সীতাপুরে আইন অনুশীলন করেন। সুন্দরলাল উর্দু ও ফারসি ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তারপর আরবি ও সংস্কৃত বিষয়েও দক্ষতা অর্জন করেন। কবিতার প্রতি আগ্রহী হলে কিসমাহুনবীর কাছ থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। সুন্দরলাল দুইটি মছনবী লিখেছেন। প্রথম মছনবী شاہ لیر (শাহলের) এবং দ্বিতীয় মছনবী سلک مروارید (সালক মারওরিদ)।[১৯৩]

‘শাহ লের’ মছনবী কাহিনিতে বলা হয়েছে যে, একজন বাদশার তিনটি মেয়ে ছিল। তিনি তার বড় মেয়েকে তার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করেন। সে অত্যন্ত সততা দেখিয়েছিল। তাই রাজা তাকে দেশ ও সম্পদের এক তৃতীয়াংশ দিয়েছিলেন। তারপর সে অন্য মেয়েকে একই প্রশ্ন করেন। সেই মেয়েটি অতিরঞ্জিত করে তার উত্তর দিল। অতএব, সে দেশ ও সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পেয়েছিল। এবার তৃতীয় মেয়ের কাছে বাদশাহ একই প্রশ্ন করেন । সে খুব সরলভাবে উত্তরে বলেছিল যে, কন্যা তার পিতাকে যতটুকু ভালোবাসতে পারে ততটুকু আমি তোমাকে ভালোবাসি। বাদশাহ তৃতীয় মেয়ের উত্তর পছন্দ করেননি। তাই তাকে বাদশাহ দেশ ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। একজন বিশ্বস্ত

চাকর বাদশাহকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তিনি তা শুনেননি। অবশেষে রাজা বুঝতে পারলেন যে, ঐ দুই মেয়ের চেয়ে ছোট মেয়েটির কথাটি সত্যি।

সুন্দরলালের দ্বিতীয় মছনবী হলো- 'সালকে মারওরিদ' যা নৈতিক ও ধর্মীয়। এই মছনবীর কাহিনির প্রারম্ভে এভাবে বলা হয়েছে-

ہے واجب حمد پہلے اس خدا کی☆زباں کو جس نے گویائی عطا کی۔[১৯৪]

বাশাশ মুন্সী দেবী প্রসাদঃ বাশাশ মুন্সী দেবী প্রসাদ একজন মছনবীর কবি ছিলেন। বাশাশ উপাধি এবং মুন্সী দেবী প্রসাদ তার আসল নাম। বাশাশ এর বাবার নাম মুন্সী বকনলাল; কিন্তু তিনি ঘাসী রাম নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ভুপালের বাসিন্দা ছিলেন এবং কায়স্থ বংশোদ্ভূত ছিলেন। যখন তিনি কবিতা বলা শুরু করেন তখন তার হাবীক উপাধি ছিল এবং পরে বাশাশ উপাধি ব্যবহার করেন। বাশাশ کلیلہ دمنہ (কালিলা দামনা) নামে একটি মছনবী লিখেছেন।[১৯৫] তিনি মছনবীটি খুব আকর্ষণীয় ও চিন্তাশীল উপায়ে চিত্রিত করেছেন।

বিহারী লালঃ বিহারী লাল দিল্লীর একজন কায়স্থ বংশের ছিলেন, তিনি স্বজ্ঞাত, শিক্ষিত ও দয়ালু মানুষ ছিলেন। তিনি দুইটি মছনবী লিখেছেন। এক زہرہ زمین (জাহরাহ জমিন) এবং অন্যটি رامائن (রামায়ণ।[১৯৬]

বেইতাব মুন্সী জোগিশর নাথ বারমাঃ বেইতাব মুন্সী জোগিশর নাথ বারমা বারীলির একজন সুপরিচিত আইনজীবী। তার ভালো কবিতা ও চিত্রকলার কারণে তিনি সে সময়ে খুব সুপরিচিত ছিলেন। বেইতাব উর্দু ও হিন্দিতে প্রচুর লিখেছেন। তিনি দুইটি মছনবী লিখেছেন। এক امر کہانی (অমর কাহিনি), যার মধ্যে শ্রীরাম চন্দ্রজির গল্প বলা হয়েছে। তবে এটি পুরো রামায়ণ নয়।

তার দ্বিতীয় মছনবী پری زاد (পরীজাদ)। এটি আসলে একটি জনপ্রিয় গল্প শকুন্তলা। কারণ শকুন্তলা একটি অন্ত:সত্ত্বার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং অপ্সরা ও পরী। সুতরাং এই মছনবীর নামকরণের ক্ষেত্রে বেইতাব নতুনত্ব, বিরলতা এবং স্বতন্ত্রতা দেখিয়েছেন এবং একটি সুন্দর নাম দিয়েছেন। এই মছনবীর কাহিনি দুটি ভাগে বিভক্ত। ১ম অংশে শকুন্তলা জন্মের ঘটনাটি অত্যন্ত অদ্ভূত। কথিত আছে যে, শিব বিশ্বামিত্র যখন উপসনা এবং তপস্যা শুরু করে এবং তপস্যা থেকে বিশ্বামিত্র কে বিপদগামী করার জন্য তিনি একটি পরী বা স্বর্গীয় গৃহিনী মেনকাকে প্রেরণ করেন, যিনি স্বর্গে সমস্ত ভক্ষকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিলেন এবং তাকে প্রতিটি উপায়ে কাজ করার নির্দেশ

দিয়েছিলেন। তার জন্য মেনকা বিশ্বামিত্রের কাছে পৌঁছে এবং সকল কৌশল অবলম্বন করে, যার কারণে বিশ্বামিত্র নিজের তপস্যা ছেড়ে মেনকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে যার পরিণতি হিসেবে শকুন্তলার জন্ম হয়েছিল। মেনকা ছিল জান্নাতের হুর অর্থাৎ পরী। আর তার মেয়ে শকুন্তলাও অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী ছিল। বেইতাব তার মছনবীর মাধ্যমে মেনকা কীভাবে জান্নাত থেকে বের হয়ে পৃথিবীতে এসেছে তার বর্ণনা তিনি এভাবে দিয়েছেন-

کارواں، گلشن فردوس سے، بن میں آیا کر دیا☆ابر گہر بار نے اٹھ کر سایا۔
پھول جیبوں میں صبا اور کہاں تک بھرتی☆چل پڑی شکوہ کوتاہی داماں کرتی۔[১৯৭]

মছনবীর দ্বিতীয় অংশে যে কাহিনি আছে সেটি অশোক এর শকুন্তলা মছনবীতে বর্ণনা করা হয়েছে।

তামান্না মুন্সী রাম সাহায়েঃ তামান্না মুন্সী রাম সাহায়ে এক কায়স্থ পরিবারের বিখ্যাত কবি ছিলেন। মুন্সী ঐশ্বরী প্রসাদ শআযী তামান্নার দাদা ছিলেন যিনি ফারসির কবি ছিলেন। তার বাবা মুন্সী পুরনচাঁদও লক্ষ্মৌর বিখ্যাত কবি ছিলেন। তামান্না লক্ষ্মৌর পুরানো পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উর্দু, ফারসি এবং ইংরেজি ভাষা জানতেন। তিনি শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিদর্শক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। কবিতায় তার মামা মুন্সী শঙ্কর দয়াল ফরহাত লক্ষ্মৌয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৯৮] তামান্না অনেকগুলো মছনবী লিখেছেন। সেগুলো হলো-

(১) رام لیلا (রাম লীলা)। এই মছনবীতে রামের বর্ণনা রয়েছে।

(২) رہس پنچ ادھیائے (রহস পাঁচ অধায়ে)। এই মছনবীতে ক্রিশনজীর লীলার বর্ণনা রয়েছে।

(৩) گیتا (গীতা)।

(৪) گلزار فرنگ (গুলজারে ফিরিঙ্গ)। শেক্সপিয়ারের রোমিও জুলিয়টের অনুবাদ।

(৫) گلگشت باغ لکھنؤ (গুলকাস্ত বাগ লক্ষ্মৌ)। এই মছনবীতে রানি ভিক্টোরিয়ার আগমন বর্ণনা রয়েছে।

(৬) سنبلستان حیرت (সুনবালিস্তান হায়রত)। এই মছনবীতে নেপালের মন্ত্রী মহারাজা আসাদ জাং এর বর্ণনা রয়েছে।

(৭) شکار نامہ (শিকার নামা)। এই মছনবীতে আসাদ জাং বাহাদুরের শিকারের কথা বর্ণিত আছে।

(৮) نظم دلپذیر (নজম দিলপাজির)। এই মছনবীর দ্বারা মহারাজা বলরামপুরের পরিস্থিতি জানা যায়।[১৯৯]

জিগর শিয়াম মোহন লালঃ জিগর শিয়াম মোহন লাল বারেলির সুপরিচিত কবি। তিনি কানিয়া লাল বারেলির চতুর্থ পুত্র। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মেট্রিক, ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বি. এ পাস করেন। তিনি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে নায়েব তহসিলদারি থেকে কর্মসংস্থান শুরু করেন।[২০০] তিনি অবসর নিয়ে মীরাঠে স্থায়ী হন। তিনি ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে কবিতা বলা শুরু করেন। জিগর এর বিখ্যাত মছনবী پیام ساوتری (পয়াম সাদতরী), যা ১৪০০ 'আশ'আর' নিয়ে রচিত ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২০১] জিগর کرشن سداما (ক্রিশন সদামা), پریم کہانی (প্রেম কাহানি), انتظار (ইনতেজার) এবং بہشتی روودار (বেহেস্তি রোওদার) নামে আরো চারটি মছনবী লিখেছেন। কিন্তু 'পয়াম সাদতরীর' মতো এত বিখ্যাত হয়নি।

জোহার রায়ঃ জোহার রায় বখতিয়ার সিংহ এর ছেলে এবং মুন্সী রায়ে বাহাদুর লাল এর নাতি। জোহার কায়স্থ বংশের ছিলেন। তিনি ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। জোহার ফারসিতে গুল মোহাম্মদ খান নাতক এবং উর্দুতে ইমাম বখশ নাসখের ছাত্র ছিলেন এবং নিজের একটি নাম তৈরি করেছিলেন। তিনি বিশেষত প্রকৃতি একেশ্বর বাদ এবং সুফিবাদের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনি খাজা আমীরের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। জোহার তিনটি মছনবী লিখেছেন। প্রথমটি جوہر افلاق (জোওহার আফলাক), দ্বিতীয়টি جوہر اوراک (জোওহার আওরাক) এবং তৃতীয়টি شکارنامہ (শিকার নামা) এই মছনবীতে শাহজাদা এডিনবরার শিকার করা হাতির অবস্থা, লিপিবদ্ধ জ্যোতিষ বিদ্যার সমস্যাগুলো দূর করা হয়েছিল।[২০২]

চমন মুন্সী সাদী লালঃ চমন মুন্সী সাদী লাল লক্ষ্ণৌ একজন অসাধারণ মছনবীর কবি ছিলেন। তিনি উর্দু ও ফারসি ভাষার শিক্ষক হিসেবে খুব বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে الف لیلی (আলিফ লায়লা) নামে একটি মছনবী রচনা করেছেন যা ফারসি ভাষার কিতাব ہزار افسانہ (হাজার আফসানা) এর অনুবাদ। সাধারণত ধারণা করা হয় যে, 'আলিফ লায়লা' কথাসাহিত্যের বিষয়টি আসলে সংস্কৃত থেকে নেওয়া হয়েছে এবং বইটি মূলত ফারসি ভাষায় রচিত এবং তৃতীয় শতাব্দীর হিজরিতে আরবিতে অনুবাদ করা হয়েছিল। এই মছনবীর নমুনা হিসেবে দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত হলো-

کدھر ہے ساقی میگشن کدھر ہے☆طبیعت کچھ ہماری جوش پر ہے
بہت جلدی صراحی بھر کے مے لا☆کے تام ہو نظم نثر 'الف لیلی'۔[۲۰۳]

হাজিন মুন্সী গোপালঃ হাজিন মুন্সী গোপাল একজন বিশিষ্ট মছনবীর কবি। তিনি উত্তর প্রদেশের মুজাফফর নগর জেলার একটি গ্রামে বাস করতেন। উর্দু ও ফারসি দুটো ভাষায় তিনি সাবলীল ছিলেন। হাজিন موجہ غم (মোজা গম) এবং نالہ حزیں (নালা হাজিন) নামে দুটি মছনবী লিখেছেন। 'মোজা গম' মছনবীতে বিশেষ করে মহাবিশ্বের সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। এই মছনবীর প্রথমে বলা হয়েছে-

آغاز سخن بنام خلاق۔ پیدا کیا جس نے وکن سے آفاق۔[২০৪]

খাস্তা মুন্সী জয়লালঃ খাস্তা মুন্সী জয়লাল একজন অসাধারণ কবি ছিলেন। খাস্তা দিল্লীর সম্মানিত কায়স্থ পরিবারের সদস্য ছিলেন। খাস্তা উর্দু ও ফারসি ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। তার ছোটবেলা থেকে কবিতার ইচ্ছা ছিল। তিনি نسیم سحر (নাসিম সেহের) নামে একটি মছনবী রচনা করেন যা ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই মছনবী মীর সাদিক আলির আদেশে লিখা হয়েছিল। 'নাসিম সেহের' প্রায় পাঁচশো আশ'আর নিয়ে একটি দীর্ঘ মছনবী যা ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই মছনবীতে তিনি দিল্লীর সহজ-সরল ও সাধাসিধে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন। এই মছনবীর প্রথমদিকে কবি বলেছেন-

لکھوں پہلے حمد خدائے کریم ☆ کہ ہے نام اس کا غفور الرحیم
ہوا عشق کا بھی اسی سے ظہور ☆ کیا یعنی پیدا محمد کا نور۔[২০৫]

মুন্সী জগন্নাথ লাল খোশতারঃ মুন্সী জগন্নাথ লাল খোশতার একজন সুপরিচিত মছনবীর কবি ছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌর বিশিষ্ট ও বিদ্বান পরিবারের এক সদস্য। তার বাবার নাম মুন্সী মুনা লাল। খোশতার উর্দু ও ফারসি এবং আরবি ও সংস্কৃত ভাষা জানতেন। তার পরিবারের সদস্যরা রাজকুমারের দরবারে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজে ওয়াজিদ আলী শাহের সদর দফতরের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি কবিতায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিন ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। খোশতার তিনটি মছনবী লিখেছেন। প্রথমটি হলো- رامائن (রামায়ণ), দ্বিতীয়টি হলো- بھاگوت گیتا (ভাগোত গীতা) এবং তৃতীয়টি হলো- پدم پوتھی (পদম পোথী)। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তার ছেলে লালা রওশন মাহের লক্ষ্ণৌবী 'ভাগোত গীতা' প্রকাশিত করেছিলেন।[২০৬]

মুন্সী শংকর দাসঃ মুন্সী শংকর দাস পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলার পিণ্ডি ভট্রানের একজন বাসিন্দা এবং সেখানকার স্কুলে চাকরি করতেন। তিনি দুটি মছনবী লিখেছেন। প্রথমটি نقشۂ زندگی (নকশা

জিন্দেগী), যার মধ্যে রয়েছে জীবনের একটি মানচিত্র, যেখানে প্রতিদিনের পরিস্থিতি পরিচালনা করা হতো। দ্বিতীয়টি کارزار مغربی (কারজারে মাগরিবি), যার মধ্যে রাশিয়া-রোম যুদ্ধের ঘটনাগুলোর ভিত্তিতে একটি পশ্চিমা অভিযান রয়েছে।[২০৭]

বালুয়ান সিং বাহাদুরঃ বালুয়ান সিং বাহাদুর একজন সুপরিচিত কবি ছিলেন। তিনি ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিয়ারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২২ শে ডিসেম্বর ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২০৮] মহারাজা বালুয়ান সিং বাহাদুর এর দাদা বালুনাথ সিং ছিলেন সিংহাসনে এবং তার দাদার মৃত্যুর পর তার বাবা চিত সিং সিংহাসনে আরোহন করেন। রাজা সাহেবদের বাড়িতে মুশায়ার গল্পটিও গুলদস্ত নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতার বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিটি কবি তার নিজের নাম, জাতীয়তা, বয়স, বাসস্থান, শিক্ষকের নাম, কবিতার সময়কাল এবং তার রচনার বিবরণ লিখেছিলেন। তাই রাজা সাহেবও নিজের সম্পর্কে লিখেছিলেন। আর এভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি گل بکاؤلی (গুলে বাকাওলী) নামে একটি মছনবী লিখেছেন, যার ঐতিহাসিক নাম داستان گل سخن (দাস্তানে গুলে সুখান)। এতে চৌদ্দশো এর বেশি 'আশ'আর' রয়েছে এবং এটি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

মুন্সী ভাগোনাত রায় রাহাতঃ মুন্সী ভাগোনাত রায় রাহাত একজন অসাধারণ মছনবীর কবি ছিলেন। তিনি লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা। তার পিতার নাম মুন্সী দীন দয়াল সাহেব। রাহাত উর্দু ও ফারসি ভাষাতে সাবলীল ছিলেন। কবিতায় সৈয়দ আগা হুসেন আমানত লক্ষ্ণৌয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২০৯] তিনি কবিতার প্রেমিক ছিলেন। আসলে রাহাত ছয়টি মছনবী লিখেছেন। তার মছনবীগুলো হলো-

نل دمن (নীল দামন), زہرہ و بہرام (জাহরাহ ও বাহরাম), بوستان راحت (বোস্তান রাহাত), غنیمت اردو (গুনীমত উর্দু), مدھ مالتی (মেধ মালুতি), سوز عاشقانہ (সুজ আশিকানা)।[২১০]
রাহাত এর মছনবীগুলোর মধ্যে সফলতা অর্জন করেছে 'নীল দামন' মছনবী। এতে নীল ও দামনের বিখ্যাত প্রেমের গল্প রয়েছে যা তিনি ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন। এটি দীর্ঘ একটি মছনবী।

মুন্সী পিয়ারে লালঃ মুন্সী পিয়ারে লাল ছিলেন আগ্রার এক সম্ভ্রান্ত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি যশবন্ত সিংয়ের সময়ে ভরতপুরে আইনজীবী ছিলেন। তিনি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি অত্যন্ত উচ্চতর কবি ছিলেন এবং তার বেশিরভাগ কবিতা সুপরিচিত এবং প্রবাদবাদী। তিনি দুইটি মছনবী লিখেছেন। সেগুলো হলো- نیرنگ تقدیر (নৈরাঙ্গে তাকদীর) এবং مینا بازار (মিনা বাজার)।[২১১]

মুন্সী সামনলালঃ মুন্সী সামনলাল একজন জনপ্রিয় মছনবীর কবি ছিলেন। তিনি راجہ چترمکٹ ورانی چندر کرن (রাজা চত্তরমকট ও রানি চন্দ্র কিরণ) নামে একটি মছনবী রচনা করেছেন। তিনি মছনবীটি স্যার হেনরি এলিয়ট গভর্নরের নামে লিখেছেন। এটি দুই হাজার 'আশ'আরে' সমন্বিত একটি দীর্ঘকায় মছনবী। এই মছনবীর প্রথম অধ্যায়গুলো মিঃ এলিয়াটের জীবন সম্বন্ধে রচিত ছিল। এই মছনবী ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে রচনা করা হয়েছিল।[২১২]

মুন্সী আরোড়া রায়ঃ মুন্সী আরোড়া রায় একজন চিন্তাশীল প্রখ্যাত কবি। তার জন্ম তারিখ পাওয়া মুশকিল। তবে তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২১৩] মুন্সী আরোড়া রায় سوہنی مہیوال (সোহনী মহিওয়াল) নামে একটি মছনবী লিখেছেন। এই মছনবী ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে ৮০ পৃষ্ঠা রয়েছে।

মুন্সী হুব লাল রাদঃ মুন্সী হুব লাল রাদ এলাহাবাদ জেলার বাসিন্দা ছিলেন। তবে তার পিতা মুন্সী গুনিশ প্রসাদ গোয়ালিয়ার রাজ্যভুক্ত ছিলেন। রাদ উর্দু, ফারসি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিয়ায় আইন অনুশীলন শুরু করেন। তিনি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং দাগের শিষ্য হন। তার একটি মছনবী نغمہ راز حقیقت (নাগমা রাজ হাকীকত), যা ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২১৪]

মুন্সী জগত মোহন লাল রাওয়ানঃ মুন্সী জগত মোহন লাল রাওয়ান একজন জনপ্রিয় ও বিশিষ্ট মছনবীর কবি ছিলেন। তিনি যখন কবিতা লেখা শুরু করেন, তখন তিনি লক্ষ্মৌতে চলে যান এবং পরে তিনি আজীজ লক্ষ্মৌবীর ছাত্র হন। তিনি گوتم بدھ (গৌতম বুধ) নামে একটি মছনবী লিখেছেন। তিনি ছিলেন অনেক উদার, উচ্চচিন্তা মনা এবং মানবিক।[২১৫]

মুন্সী দেবী প্রসাদঃ মুন্সী দেবী প্রসাদ অসাধারণ মছনবীর কবি ছিলেন। তিনি বাদাউনের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা চেনিলাল এবং মা দুজনেই কবি ছিলেন। স্নাতক শেষে তিনি শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন এবং উপ-পরিদর্শকের পদ থেকে পেনশন পান। তিনি বিভিন্ন বিজ্ঞান ও চারুকলায় বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তিনি نظم پردیں (নজম পারদিঁ) নামে একটি মছনবী লিখেছেন। তিনি ১৪ ডিসেম্বর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।[২১৬]

পণ্ডিত রতন নাথ সরশারঃ পণ্ডিত রতন নাথ সরশার একজন সুপরিচিত ঔপন্যাসিক। গদ্যসাহিত্যের উপন্যাস উপ-অধ্যায়ে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি গদ্যসাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার

পাশাপাশি কাব্যসাহিত্যেও অবদান রেখেছেন। তিনি দুইটি মছনবী লিখেছেন। প্রথমটি হলো- ساقی نامہ (সাকি নামা) এবং তার দ্বিতীয় মছনবীটি হলো- تحفۂ سرشار (তোহফায়ে সরশার) [২১৭]।

মহারাজা স্যারকিশন প্রসাদ শাদঃ মহারাজা স্যারকিশন প্রসাদ শাদ একজন প্রখ্যাত মছনবীর কবি। তিনি বিট্রিশ সরকারের কাছে থেকে "নাইট হালড" উপাধি পেয়েছিলেন। তিনি উর্দু, ফারসি এবং ইংরেজি ছাড়াও প্রায় সব ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তার বাবার নাম হরীকিশন প্রসাদ। তিনি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২১৮] তিনি পাঁচটি মছনবী লিখেছেন। যেমন-

آئینہ وحدت (আয়না ওহদাত), ائینہ وجود (আয়না ওজুদ), پیارے باتیں (পিয়ারে বাতেঁ), سزوجود (সাজে ওজুদ) جلوہ کرشن (জলুয়া ক্রিশন)।[২১৯]

পণ্ডিত পীম নারায়ণ শাকরঃ পণ্ডিত পীম নারায়ণ শাকর কানপুরের একজন মেধাবী এবং সুচিন্তিত কবি। জালাল লক্ষ্মৌয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি 'গুলজারে নাসিম' মছনবীর উত্তরে بہار کشمیر (বাহারে কাশ্মির) নামে একটি মছনবী ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে লিখেছেন যা ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২২০]

পণ্ডিত শিবনাথ কোল শাকেরঃ পণ্ডিত শিবনাথ কোল শাকের একজন প্রখ্যাত মছনবীর কবি ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ কোল শাকের গোয়ালিয়রের বাসিন্দা ছিলেন। তার পিতার নাম পণ্ডিত কাশীনাথ। তিনি ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিতায় পারদর্শীতা অর্জন করেছিলেন। তিনি مرآۃ الخیال (মিরাতুল খেয়াল) নামে একটি মছনবী লিখেছেন।[২২১]

দিলগীর লক্ষ্মৌবীঃ মারছিয়ার বিখ্যাত কবি দিলগীর লক্ষ্মৌবী আমীনাবাদ এর প্রশংসায় ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে ১৭৫ আশ'আর বিশিষ্ট একটি মছনবী লিখেছেন। এই মছনবীতে হামদ, না'ত এবং মুনকাবাত ব্যতীত আমজাদ আলী শাহ এবং আমীন উদ্দৌলা এর প্রশংসা করা হয়। তাদের প্রশংসা ব্যতিরেকে তিনি আমীনাবাদ এর বাজারের প্রশংসা করেন। তিনি এই মছনবীতে বাজারের প্রশংসা এভাবে তুলে ধরেছেন-

جو دیکھے خواب میں یوسف یہ بازار ☆ تو جان و دل سے ہو اس کا خریدا

نہ اس بازار کو بازار کہے☆اگر کہے تو تو پھر گلزار کہے-[২২২]

সালিক রাম সালিকঃ সালিক রাম সালিক উর্দু কাব্যসাহিত্যে এক বিশিষ্ট নাম। তিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেন এবং ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।[২২৩] তিনি একটি মাত্র মছনবী লিখে উর্দু কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার মছনবী হলো- سی پنوں (সী পীনু)।

মুন্সী তোতারাম শায়ানঃ মুন্সী তোতারাম শায়ান ছিলেন কায়স্থ এবং লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা। তার বাবার নাম মুন্সী আত্মা রাম এবং দাদার নাম লালা মনসিখ রাম। তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। তার আরবি ও তুর্কি ছাড়া উর্দু ও ফারসি ভাষাতে অসাধারণ দক্ষতা ছিল। শায়ান ছিলেন একজন স্বতন্ত্র কবি। তিনি ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছয়টি মছনবী লিখেছেন। সেগুলো হলো-

مثنوی حسن (মছনবী হুসন), مثنوی عشق (মছনবী ইশক), مثنوی ستی (মছনবী সতী), مہابھارت (মহাভারত), طلسم شایاں (তালসিম শায়াঁ), الف لیلہ (আলিফ লায়লা)।[২২৪]

মুন্সী বানোয়ারী লাল শোলাঃ মুন্সী বানোয়ারী লাল শোলা উর্দু কাব্যসাহিত্যে একজন সুপরিচিত কবি। তার বাবা মুন্সী মোতি লাল কবিতা ও সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করেছিলেন। মুন্সী বানোয়ারী লাল ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শোলা আলীগড়ে পড়াশুনা করেছেন। তিনি কবিতায় গালিবের শিষ্য হরগোপাল তোফতার শিষ্য হয়েছিলেন। তিনি ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২২৫] তিনি برج چھوپ (ব্রজ ছুপ), موسم بہ (মৌসুম বে) ও برنداین (ব্রিন্দাবন) নামে তিনটি মছনবী লিখেছেন। শোলা হিন্দু হওয়ার কারণে এমন অনন্য বিষয় বেছে নিয়েছিলেন এবং তা কাব্যিক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।[২২৬]

মুন্সী লালতা প্রসাদ শফকঃ মুন্সী লালতা প্রসাদ শফক লক্ষ্ণৌর একটি গ্রাম ভায়ানি গঞ্জের বাসিন্দা। তার বাবার নাম মুন্সী বিজয় লাল। তিনি উর্দু, ফারসি, আরবি এবং ইংরেজি ভাষায় অনেক পারদর্শী ছিলেন। তার কবিতার শিক্ষক ছিলেন মুন্সী কানুর জী মাদহুশ এবং শংকর দয়াল ফরহাদ। শফক بہار شفق (বাহারে শফক) নামে একটি মছনবী লিখেছেন, যা চার দরবেশ কাহিনি থেকে নেওয়া হয়েছে।[২২৭]

মুন্সী লাঝমী নারায়ণ শফিকঃ মুন্সী লাঝমী নারায়ণ শফিক একজন বিশিষ্ট মছনবীর কবি ছিলেন। তার জন্ম ২৩ শে ফেব্রুয়ারি ১৭৫৫ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু হয় ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে। তার আসল দেশ

লাহোর। কিন্তু তার দাদা দক্ষিণাত্যে গিয়েছিলেন এবং তার বাবা নেসরাম রায় আওরঙ্গবাদের বাসিন্দা।[২২৮] তিনি আজাদ বেলগেরামীর শিষ্য ছিলেন। উর্দু ও ফারসি দুটো ভাষারই তিনি কবি ছিলেন। ফারসিতে 'সাহেব' এবং উর্দুতে 'শফিক' উপাধি ছিল। শফিকের تصویر جاناں (তাসবিরে জানাঁ) নামে একটি মছনবী ছিল।

মুন্সী ছোটাম লালঃ মুন্সী ছোটাম লাল কাব্যসাহিত্যের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার বাবার নাম রায়জবু লাল। তিনি খত্রী পরিবারের সদস্য ছিলেন। হায়দ্রাবাদের বাসিন্দা ছিলেন এবং মহীশ্রীর ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি صحیح وطن (ছহিহ ওয়াতন) নামে একটি মছনবী লিখেছেন।[২২৯]

বাবু নোল সিং আজীজঃ বাবু নোল সিং আজীজ কাব্যসাহিত্যের একজন সুপরিচিত কবি। তিনি ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে جگروب (জিগরোব) নামে একটি মছনবী লিখেছেন, যা প্রেমের কাহিনিতে রচিত হয়েছিল। তার এই মছনবীর নমুনা-

ترانام گوئیندہ ہوں، گردگار☆جہاں آفریں ہے تو پروردگار۔[২৩০]

পণ্ডিত কানিহা লাল আশিকঃ পণ্ডিত কানিহা লাল আশিক একজন প্রখ্যাত মছনবীর কবি। তার পিতার নাম পণ্ডিত ঠাকুরদাস কাশ্মিরী। আশিক দিল্লীতে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে শিক্ষার্জন করেন। তারপর তিনি কর্মের সুবাদে সুলতানপুরে আসেন। আশিক گل باضوبرچہ کرد (গুল বাজুবর চেহ করদ) নামে একটি মছনবী লিখেছেন।[২৩১]

মুন্সী রাম প্রসাদ আমলঃ মুন্সী রাম প্রসাদ আমল একজন বিশিষ্ট মছনবীর কবি। তিনি সাহোরের বাসিন্দা ছিলেন। তার পিতা শিব প্রসাদ যিনি জীবিকার সন্ধানে লক্ষ্ণৌ এসেছিলেন। তিনি একজন খুব প্রতিভাবান কবি ছিলেন। তিনি তিনটি মছনবী লিখেছেন। সেগুলো হলো-

ایکادشی مہاتم (একাদশী মহাতম), بحر طلسم (বাহার তালসিম), دریائے طلسم (দরিয়ায়ে তালসিম)।[২৩২]

মুন্সী গোরাখ প্রসাদ ইবরতঃ মুন্সী গোরাখ প্রসাদ ইবরত একজন সুবিখ্যাত ও জনপ্রিয় কবি। ফেরাক গোরাখপুরীর বাবা ইবরাত গোরাখপুরী ছিলেন গোরাখপুরের অন্যতম বিশিষ্ট আইনজীবী। তিনি ছিলেন একজন সুচিন্তিত কবি। গালিবের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি حسن فطرت (হুসনে

ফিতরত) নামে একটি বিখ্যাত মছনবী লিখেছেন যা ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে গোরাখপুরে সম্পূর্ণ হয়েছিল।[২৩৩] এটি একটি রহস্যময় মছনবী। এই মছনবীর প্রথমে কবি এভাবে বলেছেন-

بگڑنا، بننا، حقیقت میں اتفاق پہ ہے☆خوشی بشر کی مگر محض مذاق پہ ہے
صلاح خلق طبیعت کے بر خلاف نہیں☆مزاج اصل سے نیچر کو اختلاف نہیں۔[২৩৪]

লালা খোদাবখশ গারিবঃ লালা খোদাবখশ গারিব একজন অসাধারণ মছনবীর কবি। গারিবের আসল নাম তাজ বাহাদুর এবং তিনি খোদা বখশ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি দুটি মছনবী লিখেছেন। প্রথমটি سورج پران (সুরজ পুরান) এবং দ্বিতীয় হলো- فریب النساء (ফরিবুন নেসা) যা ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে বই আকারে হয়েছিল এবং ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই মছনবীর নমুনা-

کروں کیا میں حمد خدائے جہاں☆وہاں قلم ہے یہاں بے زبان۔[২৩৫]

মুন্সী শংকর দয়াল ফরহাতঃ মুন্সী শংকর দয়াল ফরহাত উর্দু কাব্যসাহিত্যে একজন খ্যাতি সম্পূর্ণ কবি ছিলেন। মুন্সী শংকর দয়াল ফরহাত আসলে কোসবা জেলার ভোনগাম শহরের বাসিন্দা। তার বাবা মুন্সী পুরানচাঁদ মেহের যিনি তার শ্বশুরবাড়ি লক্ষ্মৌতে থাকতেন। তাই ফরহাত নিজেকে লক্ষ্মৌবী বলতেন। তিনি সুদর্শন ছিলেন এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক জীবনযাপন করতেন। তিনি উর্দু, ফারসি, সংস্কৃত এবং ইংরেজিতে পারদর্শী ছিলেন। কবিতায় মুন্সী জওহর সিং-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির কবি ছিলেন। তিনি কবিতাকে ধর্মের সাথে যুক্ত করে ছিলেন।

তিনি মছনবীর বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তার এগারোটি মছনবী রয়েছে। সেগুলো হলো- جانکی بجے (জানকি বাজে), گینش پران (গুনাশ পুরান), ادبھت رامائن (অদ্ভূত রামায়ণ), پیو پران (শিবপুরান), گوری منگل (গোরী মঙ্গল), سکست چالیسی (শিকাস্ত চালিশি), پدم پران (পদম পুরান), بشنو سنسر (বিষ্ণু সনসার), پریم ساگر (প্রেম সাগর), رامائن (রামায়ণ), فرحت افزا (ফরহাত আফজা)।[২৩৬]

মুন্সী গোবিন্দ প্রসাদ ফাজাঃ মুন্সী গোবিন্দ প্রসাদ ফাজা উর্দু কাব্যসাহিত্যে একজন সুপরিচিত কবি ছিলেন। তিনি মুন্সী গোরাখ প্রসাদের পুত্র এবং লক্ষ্মৌর বাসিন্দা। তার দাদা মুন্সী চমন প্রসাদ সুপরিচিত ব্যক্তি। ফাজা ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৩৭]

তিনি بوستان اردو (বাস্তানে উর্দু) নামে একটি মছনবী লিখেছেন। তিনি گلزار فضا (গুলজারে ফাজা) নামে আরেকটি মছনবী লিখেছেন।

পণ্ডিত ব্রজ মোহন দাতাতরিয়া কাইফীঃ পণ্ডিত ব্রজ মোহন দাতাতরিয়া কাইফী উর্দু ভাষার অনেক বড় কবি ও লেখক। হিন্দু ও মুসলমান সবাই তাকে সম্মান করত। কাইফী দুটি মছনবী রচনা করেছেন। প্রথমটি হলো- پریم ترنگنی (প্রেম তারতগনী)। তার দ্বিতীয় মছনবী হলো- جگ بیتی (জাগা বীতি)।[২৩৮]

মুন্সী গীনদন লালঃ মুন্সী গীনদন লাল গোহার মুন্সী রাম দয়াল রেসার পুত্র এবং মুন্সী তিলোক চাঁদের নাতি। তিনি গোহার বাদাউনে জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়স্থ জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। গোহার ছিলেন পারিবারিক কবি। তিনি বেশ কয়েকটি বই রচনা করেন। তিনি شبِ چراغ (শবে চেরাগ) নামে একটি মছনবীও রচনা করেন।[২৩৯]

সারী মাতকাশী গহরঃ সারী মাতকাশী গহর একজন মছনবীর বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি বেনারসের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি একটি উৎকৃষ্ট মছনবী রচনা করেন। যার নাম جنت نظر (জান্নাতে নজর) যা ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই মছনবীর প্রথমে মহারাজা নাজিত সিং এর ইতিহাস রয়েছে। এই মছনবীতে কাশ্মিরের একটি পুকুরের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন-

که کشمیر میں ایک تالاب ہے ☆ چمک آب کی مثل و سیماب ہے
نئے ہر طرف اس کے عمدہ ہیں کھاٹ ☆ جو ہو باڑھ پر سوجھے ہر گز نہ پاٹ۔[২৪০]

মুন্সী ললতা প্রসাদ লায়েকঃ মুন্সী ললতা প্রসাদ লায়েক একজন বিখ্যাত কবি। তার বাবার নাম বদনী লাল। তার লালন-পালন তার নানা ইশ্বর প্রসাদ করেছিলেন। তার জন্মভূমি সানদিলা ছিল; কিন্তু তিনি তার নানার সঙ্গে কানপুরে ছিলেন। তিনি ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তার সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি। তিনি قتلِ سراج (কাতলে সিরাজ) নামে একটি মছনবী লিখেছেন।[২৪১]

লালা ইবনী প্রসাদঃ লালা ইবনী প্রসাদ সাদহোশ দিল্লীর বাসিন্দা ছিলেন। তার বাবার নাম গধারী লাল। তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও বাস্তববাদী কবি ছিলেন। তিনি কয়েকটি মছনবী লিখেছেন। তার প্রথম মছনবী হলো- گوپی چند (গোপীচাঁদ) যা ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। এতে হিয়া লালের গদ্যকে কবিতা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এতে জীবনের বস্তুগত দিকের চেয়ে আধ্যাত্মিক দিকটির শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হয়েছে। তার দ্বিতীয় মছনবী হলো- غمزہ دلربا (গমজাহ দিলরুবা)। তার তৃতীয় মছনবী হলো-

طوطاومینا (তোতা ও ম্যানা)। যেখানে দুই পাখিকে পরকালের দিকে মনোযোগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

‘গোপীচাঁদ’ মছনবীর শেষে তিনি বলেছেন-

ہوا قصہ گوپی چنداب تمام☆الٰہی ہو مقبول ہر خاص وعام۔[২৪২]

মুন্সী লালা জিসবন্ত রায়ঃ মুন্সী লালা জিসবন্ত রায় যদিও ফারসি কবি তবুও তিনি উর্দুতে একটি মছনবী লিখেছেন যা گلدستۂ عشق (গুলদস্তায়ে ইশক) নামে পরিচিত। এটি গোপী চাঁদওয়ালীর কাহিনি মছনবী আকারে প্রকাশ পেয়েছে।[২৪৩]

মৌলচাঁদ লাল মুন্সীঃ মৌলচাঁদ লাল মুন্সী দিল্লীর এক সম্মানিত কায়স্থ পরিবারের এক বিশিষ্ট, বিদ্বান ও বিখ্যাত ব্যক্তি। কবিতায় শাহ নাসিরের শিষ্য ছিলেন। মুন্সী ছিলেন একজন দক্ষ ও বুদ্ধিমান কবি। তিনি ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তিনটি মছনবী লিখে উর্দু কাব্যসাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

قصہ خسروان عجم (কিসসায়ে খুশরুওয়ানে আজম), سام نامہ (সাম নামা), ہیرورانجھا (হিরো রানঝা)।[২৪৪]

মুন্সী বাশেশুর প্রসাদ মনোয়ারঃ মুন্সী বাশেশুর প্রসাদ মনোয়ার ৭ জুলাই ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেন। তিনি ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মেট্রিক পাস করেন। তিনি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে নোবতরায় নযর লক্ষ্মৌয়ের শিষ্য হন। প্রথমে আফক উপাধি করতেন। তারপর মনোয়ার উপাধি করেন। তার বাবা মুন্সী আফক লক্ষৌবী বিখ্যাত ও সম্মানিত কবি ছিলেন। তিনি ২৪ শে মে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।[২৪৫] মনোয়ার গীতার অনুবাদ মছনবী আকারে করেছিলেন এবং کمارسنھو (কুমার শানহু) নামে আরেকটি মছনবী লিখেছেন।

মুন্সী মাতা প্রসাদ নিসানঃ মুন্সী মাতা প্রসাদ নিসান লক্ষ্মৌর অধিবাসী। তিনি ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার মামা ফরহাদ লক্ষ্মৌবীর শিষ্য ছিলেন। তিনি مثنوی باباہزارا (মছনবী বাবা হাজারা) নামে একটি মছনবী লিখেছেন। এতে তিনি লক্ষ্মৌয়ের বিখ্যাত সাধু বাবা হাজারার প্রতি তার অনুরাগ প্রকাশ করেছেন।

الٰہی دے قلم کو وہ روانی☆کہ دنیا شرم سے ہو پانی پانی

جو مضمون چاہوں وہ بندش میں آجائے ☆ سمندر میرے کوزے میں سما جائے۔[২৪৬]

লাল হুসেন বখশঃ লাল হুসেন বখশ ওয়াকফ লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা এবং প্রাচীন কায়স্থ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি উর্দু এবং ফারসি ভাষার একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন এবং হিন্দি ও ইংরেজি সম্পর্কে তার পরিচিতি ছিল। তিনি 'কানবীর ধনপতরায়' এর বিয়ের পরিস্থিতিতে بہارستان شادی (বাহারিস্তান শাদী) নামে একটি মছনবী লিখেছেন। হিন্দু বা রাজাদের বিবাহের আচরণগুলো এই মছনবীতে তুলে ধরা হয়েছে।[২৪৭]

মুন্সী হরচাঁদ রায়ঃ মুন্সী হরচাঁদ রায় হরচাঁদ আগ্রাওয়ালের বাসিন্দা। বাবার নাম রায়সিং। তিনি একজন আদর্শ কবি। তিনি পাঁচটি মছনবী লিখেছেন। সেগুলো হলো-

گلزار بیخار (গুলজারে বীখার) যা ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। افسانہ غم (আফসানা গম) যা ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। ستم نامہ (সীতম নামা) যা ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। نامہ عشق (নামা ইশক) যা ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। کشف الدقائق(কাশফুদ দাকায়েক) যা ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪৮]

মুন্সী লঝমন প্রসাদঃ মুন্সী লঝমন প্রসাদ একজন বিখ্যাত লেখক ও কবি ছিলেন। তিনি কায়স্থ বংশের ছিলেন। তার বাবার নাম নোবত রায় নযর লক্ষ্ণৌবী। তিনি ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি উর্দু, ফারসি এবং আরবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তার বিখ্যাত একটি মছনবী হলো- سداما (সদামা)। তিনি "সদামা" মছনবী ছাড়াও سلک گہر (সালক গেহের) নামে আরো একটি মছনবী লিখেছেন।[২৪৯]

মহারাজা কুলীয়ান সিং আশিকঃ মহারাজা কুলীয়ান সিং আশিক উর্দু কাব্যসাহিত্যে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তার বাবা ছিলেন শিতাব রায় বাহাদুর। তিনি ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।[২৫০] তিনি কবিতার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন এবং উর্দু ও ফারসি ভাষায় কবিতা বলতেন। তার বিখ্যাত মছনবী عاشق (আশিক)। এই মছনবীর নমুনাস্বরূপ দু'টি পংক্তি উদ্ধৃত হলো-

ہوا تیرے جلوئے سے بیخود کلیم ☆ کیا اس نے اس شعلے سے خوف و بیم
دم وصل موسی ہوا ہے خبر ☆ تجلی سے تیری گرا کوہ پر۔[২৫১]

২.৪ মারছিয়া

মারছিয়া আরবি শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। যার অর্থ মৃত কান্না এবং প্রশংসা করা।[২৫২] অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির জন্য কেঁদে কেঁদে তার গুণাবলী বর্ণনা করাকে মারছিয়া বলে। মারছিয়ার সংজ্ঞা সুম্বুল নিগার এভাবে দিয়েছেন-

"دلی صدمہ اظہار بھی ہوتا ہے اور مرنے والے کی خوبیوں کا بیان بھی۔ یہی مرثیے کی ابتدائی شکل ہے۔ جب یہ پوری طرح شعر کے سانچے میں ڈھل گیا تو مرثیہ کہلایا۔"[২৫৩]

কিন্ত মারছিয়ার সংজ্ঞা আজিমুল হক জুনায়দী একটু আলাদাভাবে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

"مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی کی وفات پر اظہار غم کے لئے کہی جائے اور اس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ اردو میں عام طور پر مرثیہ شہدائے کربلا یعنی حضرت امام حسین اور ان کے اعزّہ و رفقاء کی شہادت کے ذکر کرنے اور ان کے اوصاف نظم میں بیان کرنے کو کہتے ہیں۔"[২৫৪]

মারছিয়া শব্দটি আরবি থেকে ফারসি এবং ফারসি থেকে উর্দুতে এসেছে। তবে উর্দু ও ফারসিতে শোক প্রকাশের ধারাটি বেশিরভাগই কারবালার ঘটনার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন বলেছেন-

"یہاں مرثیہ سے مراد وہ نظمیں ہیں جو واقعات کربلا کے متعلق وقتاً فوقتاً کہی گئیں، امام حسین کی شہادت کے بعد ہی سے ایسی نظمیں عربی میں آنے لگی تھیں۔ بعد میں فارسی نے بھی اثر لیا اور اچھا خاصا ایک ذخیرہ تیار ہو گیا۔ اردو میں ابتدائی عہد سے یہ چیز آگئی تھی۔"[২৫৫]

এ ছাড়াও অনেক বড় বড় ব্যক্তিদের নিয়েও উর্দুতে মারছিয়া লেখা হয়েছে। উর্দুতে এ রীতিটি খুব জনপ্রিয়। উর্দুতে মারছিয়ার উৎপত্তি দাক্ষিণাত্য থেকে। দাক্ষিণাত্যে আদিল শাহী ও কুতুবশাহী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর শিয়াধর্ম অনুসরণকারী এবং ইমামবাড়াদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উর্দুর সর্ব প্রথম মারছিয়া কবি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের মোল্লা ওজহী। লক্ষৌতে এ ধারার আরো বিকাশ ঘটে। মীর আনিস এবং মীর দবিরের মতো কবিরা এ বিষয়ে উচ্চতর দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।[২৫৬] কারবালার ঘটনাটি বর্ণনা করতে প্রায়ই বিলোপ করা হয়। উর্দুতে যখন মারছিয়া চালু হয়েছিল, তখন এর লক্ষ্য ছিল উর্দুতে ধর্মীয় নৈতিক মূল্যবোধ প্রচার করা। কাব্যসাহিত্যের এই শাখায় মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিম কবিগণ জনপ্রিয় করে তোলার জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

দিলগীর লক্ষৌবীঃ দিলগীর লক্ষৌবী তার সময়ের একজন বিখ্যাত মারছিয়ার কবি। দিলগীর লক্ষৌবী এর আসল নাম লালা নগুলাল এবং তার উপাধি তারব। তার বাবার নাম ছিল মুন্সী রাসওয়া

রাম। তিনি ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষৌতে জন্মগ্রহণ করেন। বাদশাহ মুহাম্মদ আলী শাহ তাকে এক উচ্চ পদস্থ প্রচারক থেকে ৪০০ টাকার নগদ পুরস্কার দিয়ে সম্মানি করেছিলেন। দিলগীরের বই পড়বার খুব ইচ্ছা ছিল। সে যুগে তিনি অল্প বয়সে কবিতার প্রতি অত্যন্ত সংবেদশীল ছিলেন। নয় বছর বয়সে তিনি অন্যান্য কবিদের কবিতা বলতেন এবং ১৬ বছর বয়সে নিজেই কবিতা লিখতে শুরু করেন। তিনি নওয়াজ হুসেন খান ওরফে মির্জা খান এর ছাত্র ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, বড়দের সাহচার্য্যে এলে কবিতার বাক্য পরিপক্ক হয় এবং তিনি শিক্ষকদের নজরে পড়েন। তিনি ৬৯ বছর বয়সে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে লক্ষৌতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৫৭]

তিনি গাজী উদ্দীন হায়দার এর যুগে ১৮১৪ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।[২৫৮] তার ইসলামী নাম ছিল গোলাম হুসেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাওলানা আজাদের গোশা আদীবে দিলগীর এর মারছিয়ার এক সংগ্রহ ৬৬৪ নম্বর মজুদ রয়েছে। ঐ মারছিয়াগুলোতে দিলগীর এর নাম গোলাম হুসেন হিসেবে রাখা হয়েছিল।

দিলগীর কারবালার শাহাদাত ছাড়াও মুসলিম, ইমাম হুসেন, হযরত আলী, জনাবা ফাতেমা জোহরা (রা.), রাসুলুল্লাহ (সা.), জনাবা সাকিনা প্রমুখের অবস্থার বিষয়বস্তু নিয়ে মারছিয়া লিখেছেন। দিলগীর ঐ সময়ের বিখ্যাত মারছিয়া কবি ছিলেন। তার সমসাময়িক কবিদের চেয়ে তার কথাটি আর্তনাদে অতুলনীয় শক্তি ছিল এবং তিনি ছিলেন শোকের প্রধান।

কেউ কেউ বলেছেন যে, দিলগীর এর মারছিয়ার সাতটি খণ্ড রয়েছে। আসলে সপ্তম খণ্ডের কোথাও কোন নাম বা চিহ্ন নেই। অতএব বলা যায় যে, তার মারছিয়ার ছয়টি খণ্ড রয়েছে, যা আমির উদ্দৌলা পুলক লাইব্রেরী লক্ষৌতে ছিল, সেখান থেকে নিয়ে এসে রাজা মাহমুদ আদাবের কুতুবখানায় রাখা হয়েছে। এছাড়া ভারতের কোথাও কোথাও তার সমস্ত খণ্ড পাওয়া যায়। রশিদ সাহেবের কাছে তার ১৫৪টি মারছিয়া এবং রাজা সাহেবের কাছে ২৪টি মারছিয়া রয়েছে এবং জাখিরা আদিবে ১২০টি মারছিয়া রয়েছে। এভাবে প্রায় দিলগীরের ১৯৭টি মারছিয়া রয়েছে।[২৫৯] দিলগীর মহানবী (সা.) সম্পর্কে মারছিয়ায় বলেন-

بڑے وہ بھی مگر فوج حسینی کی طرح گا ہے
نہیں ٹکڑے ہوا تھا سب کا سب لشکر محمد کا۔[২৬০]

জাহিন লক্ষৌবীঃ জাহিন লক্ষৌবী বিখ্যাত মারছিয়া কবি। তিনি ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬১] জাহিন লক্ষৌবী বিখ্যাত শোকবিদ মিয়া দিলগীর এর ছাত্র ছিলেন। তিনি শোকের জন্য নিজের একটি পরিচয় তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি প্রয়াত নবাব সাদাত আলী খানের সময়ে

১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে মারছিয়া শুরু করেন। তিনি প্রায় ২০টি মারছিয়া লিখেছেন। রাকিম উল হুরোফের দৃষ্টিকোণ থেকে তার সব মারছিয়ার সংগ্রহ কুতুবখানায় মজুদ আছে। কারবালা বিষয়ে তার মারছিয়ার একটি পংক্তি উদ্ধৃত হলো-

مانا ہے کربلا کا سفر دور ہے بہن ☆ کیا اس کو لے چلوں کہ وہ رنجور ہے بہن۔[২৬২]

রাজা উলফাত রায় উলফাতঃ রাজা উলফাত রায় উলফাত জনপ্রিয় মারছিয়া কবি। রাজা উলফাত রায় নাম এবং উলফাত হচ্ছে পদবি। নওয়াব ওয়াজিদ আলী শাহের রাজত্বকালে তিনি তার রাজ সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন। তার পিতা রাজা লালজি দিল্লীর বাদশাহ এর কাছ থেকে রাজা উপাধি পেয়েছিলেন। উলফাত রায়ের জন্ম ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।[২৬৩] মৌলভী ইহসান উল্লাহ তার কবিতার শিক্ষক ছিলেন। তিনি কিছুদিন বাবার সাথে মির্জাপুরে অবস্থান করেছিলেন। তারপর তিনি লক্ষ্মৌতে চলে আসেন। উলফাত উর্দু ও ফারসির কবি ছিলেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পরিবারের এক মহান ভক্ত ছিলেন যা তার মারছিয়ায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি মারছিয়া কবি হিসেবে খুব সুপরিচিত ছিলেন।

উলফাত বায়ের মারছিয়ার নমুনাস্বরূপ একটি পংক্তি তুলে ধরা হলো-

"خاک اڑاتی تھی زمیں ساتوں فلک روتے تھے ☆ حوریں سر پیٹتی تھیں جن وملک روتے تھے"[২৬৪]

রাজা ধনপত রায় মহবঃ রাজা ধনপত রায় মহব একজন মারছিয়া কবি। মহব উপাধি এবং রাজা ধনপত রায় তার নাম। তার বাবার নাম রাজা উলফাত রায় বাহাদুর। পিতা-পুত্র দুজনেই মারছিয়া লিখতেন। মহব সালাম ও মারছিয়া লিখেছেন। তবে তিনি সালামের চাইতে মারছিয়াতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। রাজা ধনপত রায়ের মারছিয়ার ধরন নিম্নরূপ-

"سامع ہے کون کسی سے کہو درد دل کا حال ☆ اب اپنا کوئی دوست نہیں غیر ذوالجلال
اک دل ہے لاکھ رنج ہیں اک جان ہے سو ملال ☆ دشمن دکھائی دیتے ہیں پہنچے جدھر خیال
سینہ ہے ٹکڑے ٹکڑے جگر داغدار ہے ☆ جینا ہے شاق موت کا بس انتظار ہے۔"[২৬৫]

গোপীনাথ আমনঃ গোপীনাথ আমন একজন বড় মাপের মারছিয়ার কবি ছিলেন। তিনি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর লক্ষ্মৌর এক পাড়া ঘোশ নগরে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬৬] তার বাবার নাম জনাব মাহাদি প্রসাদ। যিনি উর্দু ও ফারসিতে কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে দুনিয়া ছেড়ে চলে যান।[২৬৭] আমন এর বাড়িতে সাহিত্যের পরিবেশ ছিল, যাতে তিনি ছোটবেলা থেকেই কবিতা আবৃত্তি করতে পেরেছিলেন। তার রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। চিন্তার প্রক্রিয়াটি

তাকে হোসেন ধর্মের ভক্ত করে তুলেছিল। তার অন্তরে মহাবিশ্বের শিক্ষক হযরত আলী এবং আলীর পরিবারের জন্য ভক্তির মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল। তিনি ছোটবেলা কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। যখন প্রথম কবিতা লিখেছেন তখন তার বয়স ছিল নয় এবং তিনি তখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়তেন। মির্জা মুহাম্মদ হাদী আজীজ তার শিক্ষক ছিলেন। আমন শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। তিনি জাতীয় এবং সাহিত্যে পুরষ্কার লাভ করেন। তার মধ্যে 'পদ্মভূষণ' উপাধি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন জ্ঞান ও উচ্চপদে যাওয়ার পরে তার মনে কখনও অহংকার সৃষ্টি হয়নি। আমন প্রকৃতপক্ষে এক সরল জীবন যাপন করতেন। যখন গাজী আবাদে আইনজীবীর কাজ করতেন তা থেকে যে অর্থ উপার্জন করতেন তা প্রয়োজনে ব্যবহার করে বাবার কাছে বাকি টাকা দিয়ে দিতেন। আমন সত্যিকারভাবে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। হিন্দু ও মুসলমানদের পক্ষে তিনি সবসময় সহৃদয় ছিলেন।

তিনি আলী ও হুসেনের চরিত্রগুলো খুব ভালোবাসতেন এবং নিরীহ ইমামদের জীবন তার জন্য একটি মশাল। আমন সাহেবের হৃদয় এই জাতীয় ব্যথার সাথে পরিচিতি ছিল। তিনি আবুল কালাম আজাদের মৃত্যুর পরে তাকে নিয়ে মারছিয়া লিখেছেন। তিনি বলেন-

اس نے قرآن کی جو کی تفسیر ☆ نہیں ملتی ہے اس کی کوئی نظیر
قابل احترام تھی ہر بات ☆ قابل قدر اس کی ہر تحریر۔[২৬৮]

তিনি হযরত আলী ও হযরত ইমাম হুসেনের চরিত্র নিয়ে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাদের জীবন প্রচার করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে জনগনের কাছে ইসলামের নবী ও ইমামদের বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। তার কাব্যিক ভক্তির মধ্যে মারছিয়ার উপস্থাপন খুব ভালো ছিল। তিনি দেশের অনেক জায়গায় প্রভাবশালী ছিলেন এবং সেই ভদ্রলোকদের মধ্যে একজন যার অন্তর ও মনের দূরত্ব ছিলনা। তিনি প্রত্যেক ধর্মের প্রবীণদের শ্রদ্ধা করতেন।

মহারাজা স্যার কিশন প্রসাদ শাদঃ মহারাজা স্যার কিশন প্রসাদ শাদ এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের মানুষ ছিলেন। অনেক লোক তার সম্পদের সাথে যুক্ত ছিল। মাওলানা হালি তাকে তার মুসাদ্দাস দিয়েছিলেন। আল্লামা ইকবাল তাকে স্ব-রহস্য এবং নিঃস্বার্থপরতার প্রতীক ব্যাখ্যা করেছিলেন। মহারাজা কিশন প্রসাদ শাদ একটি খত্রীয় পরিবার ভুক্ত ছিলেন, যা মুঘল আমলে রাজা টোডরমল এবং মহারাজা চান্দুলাল প্রভৃতি বড় বড় ব্যক্তিত্ব তৈরি করেছিলেন। চান্দুলাল সাহিত্যে জনহিতকর, দেশপ্রেম এবং ব্যক্তিত্বের ছাপ এতটাই গভীর ছিল যে, হায়দ্রাবাদকে এক সময় চিত্রালালের হায়দ্রাবাদ বলা হতো। সেই চান্দুলাল মহারাজা কিশন প্রসাদের পূর্বপুরুষ ছিল। মহারাজা কিশন

প্রসাদ মহারাজা নরেন্দ্র প্রসাদ পেশকার এবং মাদার উল-হামামের প্রকৃত নাতি ছিলেন। তার নাম পরুশুটাম দাশ রাখা হয়েছিল; কিন্তু তার নানা কিশন প্রসাদ নাম রেখেছিলেন এবং এভাবে এই নামটি সাহিত্যে এসেছে। তার প্রথম পড়াশুনা তার নানার কাছে হয়েছিল। তিনি খুব দ্রুত ফারসি, সংস্কৃত, আরবি, উর্দু ইত্যাদি ভাষা রপ্ত করেন।

জ্যোতিষ, চিত্রকলা এবং সংগীত তার নিজস্ব শখে শিখেছিলেন। তার নানা মহারাজা নরেন্দ্র প্রসাদ মৃত্যুর পরেও তিনি কিশন প্রসাদকে তার বৈধ উত্তরাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীর জেনারেল এবং সশস্ত্র বাহিনীর মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছিল এবং এমন কিছু ঘটেছিল যে তিনি নিজেই এই পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। এই পদ থেকে অবসর নেওয়ার পরে তিনি ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব, দিল্লী এবং আজমীর শরীফে দীর্ঘ যাত্রা করেছিলেন। এই সফরে তিনি পাঞ্জাবের নামে যে ভ্রমণকাহিনি লিখেছিলেন, তা খুব আকর্ষণীয়। এই বইটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম ইউনির্ভার্সিটি আলীগড়ে পাওয়া গেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি মহারাজা কিশন প্রসাদের প্রচণ্ড ভক্তি এবং শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মহররমের দিনগুলোতে মজলিসে যেতেন এবং এটি তিনি খুব ভালোবেসে করতেন। শাদ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে 'জাম জাহান নুমা' শিরোনামে একটি ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশ করেছিলেন। এতে হযরত আলীর প্রতি তার এতই নিষ্ঠা ছিল যে তিনি হযরত আলীর দিওয়ানাই-জওয়ান পড়তেন। শাদ 'আকওয়াল হযরত আলী' নামে একটি পুস্তিকা লিখেছিলেন, যা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলীগড়ে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৬৯] শাদ কারবালার ঘটনা ও শাহাদাত হুসেনের দর্শন গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তার 'শহীদ আযম' শীর্ষক একটি নিবন্ধ সরফরাজ কো-এর মহররমে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। কারবালার উপর স্যার কিশন প্রসাদের তিনটি বই ছিল। দিন হুসেন, নোহা শাদ এবং মাতেম হুসাইন।[২৭০] তিনি ইমাম হুসেন ও ইমাম হাসানের শাহাদাত এবং কারবালার ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। মহররমের দ্বিতীয় সংস্করণও শেষে ছাপা হয়েছিল। শাদ মীর আনিসের কবিতা খুব পছন্দ করতেন, তখন তিনি খুব ছোট ছিলেন। তারপর তার অনুসরণে তিনি মারছিয়া লেখার অনুপ্রেরণা পান। মাতেম হুসাইন মারছিয়াতে রঙ্গীন মদীনা থেকে কারবালা পৌঁছান পর্যন্ত ঘটনাগুলোর বর্ণনা রয়েছে। শেষের দিকে হুসাইনের বাবার শাহাদতের ঘটনা, রাসূল (সা.) এর রওজা মুবারক, ওমরাহ ও হজ্জ ইত্যাদি সম্পর্কে রয়েছে। তিনি তার এক মারছিয়ায় ইমাম হাসান ও হুসেন সম্বন্ধে বলেছেন-

کرکے قتل آپ کو خوش دل ہوا ابن زیاد☆ ہوگیا اپ کے حق میں وہ مسلمان جلاد۔[২৭১]

দিলু রামঃ দিলু রাম উর্দু কাব্যসাহিত্যের একজন খ্যাতিমান কবি ছিলেন। তার নাম দিলু রাম এবং কোসারী উপাধি। তার বাবার নাম চৌধুরী ভুরা রাম । তিনি বিশ্বনাই উপজাতি। নিকাস চৌহান পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কোসারী তার শিক্ষক সৈয়দ শরীফ হুসেন এর সহায়তায় ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তার ইসলামী নাম রাখা হয়েছিল চৌধুরী কাউসার। তার প্রবণতা শুরু থেকেই ইসলামের দিকে ছিল। কোসারী উর্দু ছাড়া ফারসি ও আরবিও জানতেন। তিনিই তার নিজের দেশে প্রথম লেখাপড়া করেছিলেন। তিনি একটি ইংরেজি স্কুলে পড়তেন; কিন্তু কবিতার শখের জন্য তিনি স্কুল ছেড়ে চলে যান। কিন্তু প্রয়াত পিতা তাকে লাহোরের একটি মেডিকেল কলেজে ভর্তির চেষ্টা করেছিলেন। সেখানে মেসিস্থা ছাড়া আর কিছুই শেখেননি এবং তিনি এই সব ছেড়ে মারছিয়া সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। তিনি বছরের পর বছর ধরে বিদ্বানদের কাছ থেকে কবিতা, উর্দু ও ফারসি সাহিত্যের পাঠ পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি কোন কবিকে তার কবিতার শিক্ষক বানিয়েছিলেন না। তিনি ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২১ শে ডিসেম্বর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৭২] তিনি মুহাম্মদ (সা.) ও তার পরিবারের প্রশংসা করে একটি দিওয়ান রচনা করেছিলেন। যার মধ্যে তিনি তার দিলুরাম এর পরিবর্তে উপাধি কৌসারী ব্যবহার করেছিলেন। । কৌসারী ছিলেন সুফী টাইপের ব্যক্তি। তিনি ছিলেন মুক্তমনা, সহনশীল এবং যত্নশীল মানুষ। ভারতের সুফীরা তাকে মহব্বত করতেন এবং তাদের সমাবেশে তাকে শ্রদ্ধা জানাতেন। তিনি হযরত আলী এবং খলিফাদের নিয়ে মারছিয়া রচনা করেছেন। তিনি হযরত আব্বাস (রা.) সম্পর্কে তার একটি মারছিয়ায় বলেন-

عباس تشنہ لب پہ بھی کیا کیا ستم ہوئے☆پانی بہا، علم گرا شانے قلم ہوئے۔[২৭৩]

রূপ কুমারীঃ রূপ কুমারী উর্দু মারছিয়া কবিতায় একটি বিশিষ্ট নাম। তার জন্ম তারিখ ও বংশ পরিচয় সম্বন্ধে তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। তবে তিনি ফারসিতে কামিলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং ইংরেজিতে ২য় বর্ষের ছাত্রী ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পরিবার থেকে এসেছেন। তিনি উর্দু ও ফারসি উভয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তার দুইটি মারছিয়া সৈয়দ মুহাম্মদ রশিদ সাহেবের কুতুবখানায় সংগৃহীত রয়েছে। তার মারছিয়াগুলো পড়লে জানা যায় যে, তিনি ইসলামের ইতিহাস ও নবীর হাদিস সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানতেন। তিনি মহানবী (সা.) এবং তার পরিবার পরিজনের প্রতি অত্যন্ত ভালোবাসা পোষণ করতেন। তিনি হযরত আলীকে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী যোদ্ধা হিসেবে বিবেচনা করতেন। আলীর প্রতি তার খুব ভক্তি ছিল। একটি মারছিয়ায় তিনি বলেন-

بڑی ثنا ہے غرض میرے دیوتا کی ثنا☆جناب حیدر صفدر مرتضی کی ثنا
علی کی مدح سرائی ہے مصطفی کی ثنا☆ثنائے احمد مختار ہے خدا کی ثنا۔[২৭৪]

নানক লক্ষ্ণৌবীঃ নানক লক্ষ্ণৌবী উর্দু কাব্যসাহিত্যের একজন বিখ্যাত মারছিয়া কবি। তিনি গজলের সাথে সাথে মারছিয়াও লিখতেন। তার দুটি মারছিয়ার সংগ্রহ রয়েছে। একটি সংগ্রহ সৈয়দ মুহম্মদ রশিদ সাহেবের কাছে রয়েছে। অপরটির সংগ্রহ হায়দ্রাবাদে রয়েছে। কবিতাগুলো ছোট বই আকারে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হতো এবং শহরগুলোতে বিক্রি হতো। দাম ছিল এক পয়সা। নানক লক্ষ্ণৌবী বিভিন্ন মজলিসে মারছিয়া বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সবাই বলে হিন্দু ঘরের ছেলে কিভাবে মারছিয়া বলবে। সেই জন্য তার কিছু পরীক্ষাও নেওয়া হয়। এতে তিনি প্রত্যেক পরীক্ষায় পাস করে যান এবং মারছিয়াতে তার বিশিষ্ট্যতা দেখিয়েছেন। লক্ষ্ণৌর বাইরে তিনি প্রথমে কানপুর, তারপর সীতাপুর, ফতেহপুর, মাহমুদ আবাদী, হায়দ্রাবাদ, পাটনা জোনপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, আগ্রা, পানিপথ, আলীগড় ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় মজলিসে মারছিয়া বলতেন। তার মারছিয়ার ধরন ছিল নিম্নরূপ-

کہتے عباس علی سے کہ سفر کرتی ہے☆تو بہت چاہتے ہو جس کو وہ اب مرتی ہے۔[২৭৫]

মুন্নী লাল জোয়ানঃ মুন্নী লাল জোয়ান একজন সফল কবি ছিলেন। মুন্নী লাল ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে সানদেশলা জেলা হারদোয়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম গোলাপ রায় শাহ একজন ব্যবসায়ী। তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৭৬] মুন্নী লাল অনেক কষ্ট করে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। তারপরে তিনি তার বাবাকে তার ব্যবসায় সহায়তা করতে শুরু করেন। যখন তার বাবা ব্যবসার জন্য লক্ষ্ণৌতে গিয়েছিলেন তখন তিনিও তার বাবার সাথে যান। এরপরে তিনি উর্দু ও ফারসি ভাষায় কিছু দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে কবিতা আবৃত্তি শুরু করেন। প্রথমে তিনি হাকিম আব্দুল কাদীর সানদেলুবীর আদলে কবিতা লিখতেন পরে তিনি আনোয়ার হুসাইন আরজু লক্ষ্ণৌবী এর সাথে যোগদান করেন। যখন আরজু কিছু চলচ্চিত্র নির্মাতার আমন্ত্রণে কলকাতায় আসেন তখন মুন্নী লালও তার সাথে কলকাতায় আসেন। শিক্ষকের পুরো সুবিধা নেওয়ার জন্য সেখানে বাসস্থান গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে আবার কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌতে আসেন। তিনি গজল, নজম এবং মারছিয়াতে দক্ষতা অর্জন করেন। তার চারটি মারছিয়া রয়েছে।

জোয়ানের মারছিয়াতে মীর আনিসের প্রভাব রয়েছে। তার মারছিয়ার বর্ণনা সরল এবং ভাষার স্বচ্ছতা রয়েছে। যখন তার মারছিয়া পাঠ করা হয় তখন মীর আনিসের কবিতার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। জোয়ান তার মারছিয়ায় সুক্ষ্ম রূপক ব্যবহার করতেন। যেমন-

جب شام غم رخصت کا پیغام آیا☆بے ساختہ لب پر ترا نام آیا۔[২৭৭]

ফেরাকী দরিয়াবাদীঃ ফেরাকী দরিয়াবাদী উর্দু কাব্যসাহিত্যের সুপরিচিত কবি। ফেরাকী পদবী নাম এবং আসল নাম রায়ে সর্দানাথ। তিনি দরিয়াবাদ জেলায় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উর্দু, ফারসি ছাড়া তিনি হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষাও জানতেন। উর্দুতে তার একটি দেওয়ানও ছিল। তিনি কারো শিষ্য ছিলেন না। তিনি মারছিয়া খুব লিখতেন। তিনি এমনভাবে মারছিয়া লিখতেন, তাতে শ্রোতারাও কাঁদতেন। তিনি দুইটি মারছিয়া লিখেছেন। একটি প্রকাশিত এবং অপরটি অপ্রকাশিত ছিল। ফেরাকীর আরেকটি মারছিয়া রয়েছে, যা জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ রশিদ সাহেবের গ্রন্থাগারে বিদ্যমান রয়েছে। ফেরাকীর একটি মারছিয়া- داغِ غمِ حسین (দাগে গমে হুসাইন) খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এই মারছিয়ায় তিনি বলেন-

داغِ غمِ حسین میں کیاب وتاب ہے☆روشن ضیاءسے اس کی دل افتاب ہے۔[২৭৮]

ছাবের সেকুয়াবাদীঃ ছাবের সেকুয়াবাদী মারছিয়া কবিতার জগতে এক বিখ্যাত নাম। ছাবের সেকুয়াবাদী ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন এবং কয়েক বছর পর অবসর নিয়েছিলেন। তিনি উর্দু মারছিয়ার এক কিংবদন্তি স্বতন্ত্র কবি। তার আসল নাম ইয়োগেন্দর পাল এবং ছাবের উপাধি নাম। তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ৪ জুলাই ফরিদাবাদীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম চৌধুরী শিয়ামেল সিং। মাতার নাম শ্রীমতী সুমনা দেবী। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম. এ পাস করেন।[২৭৯] কবিতার প্রতি তার আবেগ শৈশবকাল থেকে। তিনি গজল এবং অনেক মারছিয়া লিখেছেন। তার এক মারছিয়া হযরত আলী আসগরের মর্যাদার উপর। যেমন-

بے یارومددگارشبہ کون ومکاں ہیں☆ہیں قاسم نوعمرنہ عباس جواں ہیں۔[২৮০]

ছাবের একজন উচ্চমানের উর্দু কবি। যার নিদর্শন তার বাক্যেও পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়গুলো সেই সময় তিনি এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন যে, অন্য কবিদের মধ্যে এটি দেখা যায় না এবং কারবালার ঘটনাটিও তিনি খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

নাথুনী লাল ওহাসীঃ নাথুনী লাল ওহাসী একজন মারছিয়া কবি। তিনি উর্দু ভাষার একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই জুলাই বিহারের পাটনায় এক বিশিষ্ট খত্রীয় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ওহাসীর মারছিয়া শুধু হিন্দুস্তানের সামাজিক চিত্র, হিন্দুস্তানের কৃষ্টি-কালচার, হিন্দু মাজহাব এবং চরিত্রকে তুলে ধরে না বরং অন্য মাজহাব অর্থাৎ ইসলামের চিত্রও তুলে ধরেন। তিনি উদ্ভাবনী রূপক ব্যবহারে পারদর্শী ছিলেন।তিনি ইসলামের ইতিহাস, বিশেষত কারবালার ঘটনাটিও খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। শব্দটি এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে, তার একটি মারছিয়া ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে

معراج عشق (মি'রাজে ইশক) নামে লক্ষ্মৌতে প্রকাশিত হয়েছিল। অন্য আরেকটি মারছিয়া طبع رسا (তবয়ে রসা) নামে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৮১] মি'রাজে ইশক মারছিয়ায় কবি মি'রাজের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

معراج عقل و عشق ہے فکر رسا مری☆دنیائے رنگ و بو میں بندھی ہے ہوا میری
موتی لٹا رہی ہے چمن میں گھٹا میری☆جاتی ہے تبکدوں سے حرم تک صدا میری
کیوں کر نہ ہو کہ شاعر رنگین بیاں ہوں میں☆مستی فردش بادہ چشم بتاں ہوں میں۔[২৮২]

লাল রাম প্রসাদঃ লাল রাম প্রসাদ একজন মারছিয়ার কবি। তিনি পারিবারিকভাবে একজন কায়স্থ। তিনি বোরহানপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ফারসিতে কবিতা বলতেন। তবে উর্দুতে তিনি বেশি পারদর্শী ছিলেন। তিনি কাসিদা, মছনবী, রুবাঈ এবং মারছিয়া বলতেন। তিনি কবিতার সব শাখার মধ্যে মারছিয়াতে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।[২৮৩]

রাজা গীরধারী প্রসাদঃ রাজা গীরধারী প্রসাদ একজন সুপরিচিত কবি। তিনি ফারসি ভাষায় পড়াশুনা করেছিলেন; কিন্তু উর্দু ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ফয়েজ উদ্দিন ফয়েজ এর ছাত্র ছিলেন। তিনি ১২২৪ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১৪ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৮৪] তিনি মারছিয়া লিখে উর্দু কাব্যসাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তার মারছিয়ার নমুনাস্বরূপ দুইটি পংক্তি উদ্ধৃত হলো-

شہ کہتے تھے میں صف شکنی سے نہیں ڈرتا☆بازو میں مرنے زور ہے خیبر شکنی کا
زہرا کا کلیجہ ہوں دل شیر خدا ہوں☆سید ہوں نواسہ ہوں رسول مدنی کا۔[২৮৫]

মহারাজা চান্দুলাল শাদানঃ মহারাজা চান্দুলাল শাদান একজন অসাধারণ কবি। তিনি উর্দু ও ফারসি ভাষায় বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৮৬] তিনি ভালো গজল বলতেন; কিন্তু মারছিয়াতে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার মারছিয়ার ধরন নিম্নরূপ-

دیار شام میں جب قیدیوں کو شام ہوئی☆وہ رات پیٹتے روتے ہی میں تمام ہوئی۔[২৮৭]

লালতা প্রসাদ শাদঃ লালতা প্রসাদ শাদ একজন অতুলনীয় মারছিয়া কবি। তিনি রুবাঈও লিখেছেন। তিনি ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তার মারছিয়ার নমুনাস্বরূপ একটি পংক্তি উদ্ধৃত হলো-

جن کو تھی یہ امید کہ سو سال جیئں گے ☆ کہنے لگے وللہ نہ فی الحال جیئں گے۔[২৮৮]

মুন্সী বাশেশুর প্রসাদ মনোয়ারঃ মুন্সী বাশেশুর প্রসাদ মনোয়ার একজন বংশানুক্রমিক কবি। মনোয়ারের মারছিয়ার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। তাই তিনি এই আগ্রহের কারণে অনেক মারছিয়া লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ-

جس نے پہلو نہ مصائب سے بچایا وہ حسین ☆ گود والے کو بھی میدان میں لایا وہ حسین
جس نے دستور شہادت کا بنایا وہ حسین ☆ جو سیاست کے افق پر نظر آیا وہ حسین۔[২৮৯]

মহারাজা বালুয়ান সিংঃ মহারাজা বালুয়ান সিং একজন সম্মানিত কবি। বালুয়ান সিং গজল ও মছনবী বললেও তিনি মারছিয়ায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তার মারছিয়া ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে আগরায় ছাপা হয়। তার মারছিয়ার নমুনা-

زمانہ برسر جنگ است یا علی مدد سے ☆ کمک بغیر تو ننگ است یا علی مدد سے۔[২৯০]

রূপ কানুয়ারঃ রূপ কানুয়ার একজন বিখ্যাত মারছিয়ার কবি ছিলেন। তিনি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মারছিয়া বলা শুরু করেন। তিনি হযরত আলী (রা.) এর মারছিয়ায় লিখেন-

کیا ہے کام انھوں نے سدا خدا بھاتا ☆ علی کے باب میں بس کچھ نہیں کہا جاتا
میں ناخدا آنکھوں حیراں ہوں یا خدا ان کو ☆ کہ کہنے والوں نے اللہ کہہ دیا ان کو۔[২৯১]

সোয়ামী প্রসাদঃ সোয়ামী প্রসাদ আসগর একজন বিখ্যাত কবি। তিনি কায়স্থ বংশের ছিলেন। তার বাবার নাম রাম প্রসাদ। তিনি গজলের পাশাপাশি মারছিয়াও লিখেছেন। তার মারছিয়ার নমুনা-

جب چڑھے لڑنے کوں قاسم تب کہے رو رود ہن ☆ اے بخومی سانچ کہہ کس وقت پر لاگے لگن۔[২৯২]

জগন্নাথ আজাদঃ জগন্নাথ আজাদ বড় বড় ব্যক্তিদের মৃত্যুর পর কিছু মারছিয়া লিখেছেন। যার মধ্যে রয়েছে- *ماتم نہرو* (মাতমে নেহরু), *نوحہ ابوالکلام آزاد* (নোহা আবুল কালাম আজাদ)। 'মাতমে নেহরু' এর মধ্যে তিনি নেহরুজী সম্পর্কে তার মনের ব্যক্ততা প্রকাশ করেছেন। এতে নেহরুজীর চরিত্রকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, সবার চোখে পানি এসে যাবে। তিনি ছিলেন মহান ও মহত্ব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন। তিনি হিন্দুস্তানের সূর্য ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করাতে হিন্দুস্থানের সূর্য যেন মলিন হয়ে গিয়েছে।

اپنا اسم نہ کفر نہ ایمان کے دل سے پوچھ ☆ ہندو کے دل سے اور نہ مسلماں کے دل سے پوچھ
لنکا کے دل سے پوچھ نہ ایراں کے دل سے پوچھ ☆ حال دل تباہ بس انسان کے دل سے پوچھ
ہندو کی موت ہے نہ مسلماں کی موت ہے ☆ تیری جو موت ہے وہ ایک انسان کی موت۔[২৯৩]

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যান তখন কবি চোখের পানি ফেলতে ফেলতে বলেন যে, মরহুম আবুল কালাম আজাদের চেষ্টায় দেশ শুধু উচ্চ শিখরে গিয়েছে তাই নয় বরং হিন্দুস্তানি সাহিত্য এবং সংস্কৃতি অনেক উন্নতি হয়েছে। তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে যেভাবে দেশের জন্য অংশগ্রহণ করেছেন ঠিক একইভাবে তার কলম দিয়ে ভাষা ও সাহিত্যকে সেভাবে তুলে ধরেছেন। তার উদাহরণ আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তিনি তার কলমের সাহায্যে অনেক লোককে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইসলামকে উঁচু পর্যায়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তার মৃত্যুর পরে বড় এক ধরনের ক্ষতি হয়েছে তা কবি এভাবে বলেছেন-

اے وطن تیرا میر اکارواں جاتارہا☆ناز تھا جس پر وہ گنجے شائگاں جاتارہا
داستاں کیسی کہ زیب داستان جاتارہا☆اے کلام اللہ تیرا ترجمان جاتارہا
جس کی تحریروں سے روشن تھی شب افکار شرق۔[২৯৪]

ফেরাক গোরাখপুরীঃ ফেরাক গোরাখপুরী গজলে যেমন সুবিখ্যাত হয়েছেন তেমনি কবিতা লিখেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তবুও তিনি কতিপয় মারছিয়াও লিখেছেন। কিন্তু তিনি মারছিয়া শাখায় তেমন খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। তিনি যখন জেলে ছিলেন তখন তার ছোট ভাই মারা যায়। এই সংবাদ শুনে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছিলেন। আর এই কারণেই তিনি তার ছোট ভাইয়ের উদ্দেশ্যে মারছিয়া লিখেছেন। তিনি বলেন-

ایک سنائے کا عالم ہے دردو دیوار پر☆شام زنداں اب ہوئی تو شام زنداں بائے بائے۔[২৯৫]

তিলোক চাঁদ মাহরুমঃ তিলোক চাঁদ মাহরুম একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি গজল ও নজম দুটি শাখায় অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করেছেন; কিন্তু মারছিয়ায় খুব বেশি সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। তবে তিনি বেশ কিছু মারছিয়াও লিখেছেন। তিনি তার আপনজনের মৃত্যুতে এবং দেশের বিখ্যাত ব্যক্তি ও কবিদের মৃত্যুতে মরছিয়া লিখেছেন। উদাহরণস্বরূপ-

فرط غم سے غنچے چپ ہیں، گل گر میان چاک میں☆نوجوانان چمن بھی سر پہ ڈالے خاک ہیں۔[২৯৬]

আনন্দ নারায়ণ মোল্লাঃ আনন্দ নারায়ণ মোল্লা গজল ও নজম লিখে বিশ্বে যেমন সুপরিচিত হয়েছেন, তেমনি মারছিয়া লিখেও পরিচিতি পেয়েছেন। মহাত্মাগান্ধীজীর মৃত্যু নিয়ে অনেক কবিগণ মারছিয়া লিখেছেন; কিন্তু মোল্লা সাহেবের গান্ধীজীর মৃত্যু নিয়ে লিখা মারছিয়া খুব বিখ্যাত হয়েছিল এবং তা উপযুক্ত ছিল।

انسان وہ اٹھا جس کا ثانی صدیوں میں بھی دنیا چن نہ سکی☆موت وہ مٹی نقاش سے بھی جو بن کے دوبارہ بن نہ سکی
سینوں میں جو دے کانٹوں کو بھی جا اس گل کی لطافت کیا کہتے☆جو زہر ہے امرت کر کے اس لب کی حلاوت کیا کہتے۔[২৯৭]

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১ ড. মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ কাতীল, *মি'য়ারে গজল* (হায়দ্রাবাদঃ আঞ্জুমানে তারাক্কি তা'লীমে উর্দু, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ৯ ।

২ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কি তারিখ* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ২৮ ।

৩ ড. শেখ আকীল আহমদ, *গজল কা উবুরী দওর* (দিল্লীঃ সাকি বুক ডিপো, উর্দু বাজার, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৩ ।

৪ আজীজ নাবিল, *পণ্ডিত ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত শাখছিয়্যাত অওর ফন* (নয়াদিল্লীঃ গ্রীন পাপিজ, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ৬১ ।

৫ ড. ইবাদত ব্রেলবী, *জাদীদ শায়েরী* (লাহোরঃ উর্দু দুনিয়া, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ৫৮৯ ।

৬ কালিদাশ গুপ্তা রেজা, *চাকবাস্ত অওর বাকিয়াতে চাকবাস্ত* (বোম্বেঃ বিমল পাবলিকেশন্স, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ১৫ ।

৭ ড. আফজাল আহমেদ, *চাকবাস্ত হায়াত অওর আদবী খেদমত* (লক্ষ্ণৌঃ সারফরাজ কওমী প্রেস, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ১৫-১৬ ।

৮ সঞ্জয় কুমার, *গজলিয়াতে চাকবাস্ত কা ফিকরী ও ফন্নী মুতালি'আ* (এলাহাবাদঃ ইদারা নয়া সফর, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৬৩ ।

৯ আজীজ নাবিল, *পণ্ডিত ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত শাখছিয়্যাত অওর ফন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪ ।

১০ কালিদাশ গুপ্তা রেজা, *চাকবাস্ত অওর বাকিয়াতে চাকবাস্ত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২ ।

১১ সঞ্চয় কুমার, *গজলিয়াতে চাকবাস্ত কা ফিকরী ও ফন্নী মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬ ।

১২ ড. আফজাল আহমেদ, *চাকবাস্ত হায়াত অওর আদবী খেদমত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭ ।

১৩ সঞ্চয় কুমার, *গজলিয়াতে চাকবাস্ত কা ফিকরী ও ফন্নী মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬ ।

১৪ *তদেব*, পৃ. ১১৫ ।

১৫ *তদেব*, পৃ. ১১৮ ।

১৬ *তদেব*, পৃ. ১২২ ।

১৭ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু* (দিল্লীঃ উর্দু কিতাব ঘর, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ১৮৬ ।

১৮ খালিক আঞ্জুম, *জগন্নাথ আজাদ হায়াত অওর আদবী খেদমত* (নয়াদিল্লীঃ মাহরুম মেমোরিয়াল লিটারেরী সোসাইটি, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২১ ।

১৯ হামিদা সুলতান আহমেদ, *জগন্নাথ আজাদ অওর উসকি শায়েরী* (নয়াদিল্লীঃ আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু হিন্দ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৪০ ।

২০

Ur.Wikpedia.org/wiki/%D8%AC%DA%AF%D9%86%D9%86%D8%A7%D8
%AA%DA
%BE%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF

২১ WWW. Urdulinks.com/urj/?p=781

২২ *তদেব.*

২৩ *তদেব*

২৪ *তদেব*

২৫ হামিদা সুলতান আহমেদ, *জগন্নাথ আজাদ অওর উসকি শায়েরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

২৬ *তদেব*, পৃ. ৮৪।

২৭ খালিক আঞ্জুম, *জগন্নাথ আজাদ হায়াত অওর আদবী খেদমত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

২৮ *তদেব*, পৃ. ৮৭।

২৯ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কি তারিখ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫।

৩০ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।

৩১ ড. সৈয়দা জাফর, *ফেরাক গোরাখপুরী* (নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১২।

৩২ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৪।

৩৩ ড. সৈয়দা জাফর, *ফেরাক গোরাখপুরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮।

৩৪ Urduchannel.in/firaq-ki-infradiat-abdulbari-qasmi/

৩৫ আলী আহমেদ ফাতেমী, *শায়ের দানেশওর ফেরাক গোরাখপুরী* (নয়াদিল্লীঃ এম. আর পাবলিকেশন্স, ২০০৭ খ্রি.), পৃ. ১৪২।

৩৬ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *ফেরাক গোরাখপুরী শায়ের , নক্কাদ, দানেশওর* (নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৭২।

৩৭ Urduchannel.in/firaq-ki-infradiat-abdulbari-qasmi/

৩৮ আবুল কালাম কাসেমী, *শায়েরী কি তানক্বি দ* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১০১।

৩৯ আজীজ নাবিল, *ফেরাক গোরাখপুরী শাখছিয়্যাত, শায়েরী অওর শানাখত* (নয়াদিল্লীঃ হামদী প্রিন্ট জামিয়া নগর, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২২৩।

৪০ Urduchannel.in/firaq-ki-infradiat-abdulbari-qasmi/

৪১ মাখমুর সাঈদি, *ফেরাক গোরাখপুরী জাত ও সিফাত* (দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৫৭।

৪২ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *ফেরাক গোরাখপুরী শায়ের, নক্কাদ, দানেশওর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪।

৪৩ Urduchannel.in/firaq-ki-infradiat-abdulbari-qasmi/

৪৪ ড. সৈয়দা জাফর, *ফেরাক গোরাখপুরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

৪৫ *তদেব*, পৃ. ৪১।

৪৬ *তদেব*, পৃ. ৩৬।

৪৭ আবুল কালাম কাসেমী, *ফেরাক গোরাখপুরী* (নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১৯।

৪৮ মাখমুর সাঈদী, *ফেরাক গোরাখপুরী জাত ও সিফাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১।

৪৯ *তদেব*, পৃ. ৪২।

৫০ Urduchannel.in/firaq-ki-infradiat-abdulbari-qasmi/

৫১ আজীজ নাবিল, *ফেরাক গোরাখপুরী শাখছিয়্যাত, শায়েরী অওর শানাখত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৩-৪৯৪।

৫২ *তদেব*, পৃ. ৩১৬।

৫৩ ড. সৈয়দা জাফর, *ফেরাক গোরাখপুরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭।

৫৪ আলী আহমেদ ফাতেমী, *শায়ের দানেশওর ফেরাক গোরাখপুরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

৫৫ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কি তারিখ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৭।

৫৬ ড. আব্দুল ওয়াহিদ, জাদীদ *শু'আরায়ে উর্দু* (লাহোরঃ ফিরোজ এন্ড সন্স লিমিটেড, তা.বি.), পৃ. ১৬৯।

৫৭ ড. মুহাম্মদ ইউসুফ আনছারী, *তিলোকচাঁদ মাহরুম হায়াত অওর শায়েরী* (মহারাষ্ট্রঃ উর্দু একাডেমি, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩।

৫৮ কামিল বাহজাদী, *তিলোকচঁাদ মাহরুম এক মুতালি'আ* (নয়াদিল্লীঃ মাহরুম মেমোরিয়াল লিটারেরী সোসাইটি, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ১১।

৫৯ রামলাল নাভোবী, *তিলোকচঁাদ মাহরুম* (নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১২।

৬০ কামিল বাহজাদী, *তিলোকচঁাদ মাহরুম এক মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২।

৬১ রামলাল নাভোবী, *তিলোকচঁাদ মাহরুম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।

৬২ ড. মুহাম্মদ ইউসুফ আনছারী, *তিলোকচঁাদ মাহরুম হায়াত অওর শায়েরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬।

৬৩ *তদেব*, পৃ. ৮৭।

৬৪ কামিল বাহজাদী, *তিলোকচঁাদ মাহরুম এক মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬।

৬৫ *তদেব*, পৃ. ৫৭।

৬৬ ড. মুহাম্মদ ইউসুফ আনছারী, *তিলোকচঁাদ মাহরুম হায়াত অওর শায়েরী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

৬৭ কামিল বাহজাদী, *তিলোকচঁাদ মাহরুম এক মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।

৬৮ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কি তারিখ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬।

৬৯ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭।

৭০ শাহেদ মাহলী, *আনন্দ নারায়ণ মোল্লা শায়ের অওর দানেশওর* (নয়াদিল্লীঃ গালিব ইন্সটিটিউট, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৯।

৭১ *তদেব*, পৃ. ১০।

৭২ জগদীশ মেহতা দরদ, *উর্দু কে হিন্দু শু'আরা*, ১ম খণ্ড (দিল্লীঃ হাকীকত বিয়ানী পাবলিশার্স, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ২১।

৭৩ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কি তারিখ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৬।

৭৪ শাহেদ মাহলী, *আনন্দ নারায়ণ মোল্লা শায়ের অওর দানেশওর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

৭৫ *তদেব*, পৃ. ১৩৩।

৭৬ *তদেব*, পৃ. ১৩০।

৭৭ মহাবেরাঃ বাক পদ্ধতি বা পরিভাষা। দ্র. মাওঃ আবূ সুফ্য়ান (যাকী), *ফরহাঙ্গে জাদীদ* (ঢাকাঃ রশিদিয়া লাইব্রেরী, চক সার্কুলার, ১৯৯৮ খ্রি.), ৭৪০।

৭৮ তাশবিহাতঃ উপমা প্রদান বা সাদৃশ্য প্রতিপাদন। দ্র. *তদেব*, পৃ. ২৩৬।

৭৯ শাহেদ মাহলী, *আনন্দ নারায়ণ মোল্লা শায়ের অওর দানেশওর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।

৮০ rekhta.org/poets/suraj-narayan-mehr/profile? lang-ur

৮১ *তদেব*

৮২ নুর আহমদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা* (করাচী: ইদারায়ে ফিকরে নো, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৯৫ ।

৮৩ *তদেব*,

৮৪ *তদেব*, পৃ. ১৮২ ।

৮৫ *তদেব*, পৃ. ১৭৫ ।

৮৬ মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম, গোপাল মিত্তল এক মুতালি'আ (দিল্লী: নাজেস বুক সেন্টার, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ২২ ।

৮৭ ড. জিয়া উদ্দিন, *গোপাল মিত্তল শাখছ অওর শায়ের* (নয়াদিল্লী: ইদারায়ে ফিকরে জাদীদ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৪৩ ।

৮৮ মালিক রাম, *জিয়া ফতেহ আবাদী শাখছ অওর শায়ের* (নয়াদিল্লী: মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৩৩ ।

৮৯ নুর আহমদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯ ।

৯০ *তদেব*, পৃ. ২২৪ ।

৯১ ড. জগদীশ মেহতা দরদ, *উর্দুকে নান মুসলিম শু'আরা অওর আদীব* (নয়াদিল্লী: হাকীকত বিয়ানী পাবলিশার্স, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২১৪ ।

৯২ জগন্নাথ আজাদ, *জোহর বাজনুরী চন্দর প্রকাশ* (এলাহাবাদ: তাজ অফসেট প্রেস, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৩১ ।

৯৩ *তদেব*, পৃ. ৩৭ ।

৯৪ ড. জগদীশ মেহতা দরদ, *উর্দুকে নান মুসলিম শু'আরা অওর আদীব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২ ।

৯৫ জগদীশ মেহতা দরদ, *উর্দু কে হিন্দু শু'আরা*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২ ।

৯৬ নুর আহমদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১১ ।

৯৭ ড. জগদীশ মেহতা দরদ, *উর্দুকে নান মুসলিম শু'আরা অওর আদীব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭ ।

৯৮ সৈয়দ আমজাদ হুসাইন, *গায়রে মুসলিম মারছিয়া নিগার*, (লক্ষ্মৌ: ইস্টাই লাইন প্রিন্টার্স, ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ১৩৫ ।

৯৯ প্রফেসর আকবর হায়দারী কাশ্মিরী, *হিন্দু মারছিয়া গো শু'আরা* (নয়াদিল্লী: সাহেদ পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৭৬ ।

১০০ Pervez ahmedazmi.blogspot.com/20/3/03/chakbast-ke-kalaam-me-manzar-o-jazbat-19.htm/

১০১ সঞ্জয় কুমার, *গজলিয়াতে চাকবাস্ত কা ফিকরী ও ফন্নী মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০ ।

১০২ পণ্ডিত ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত, *সুবহে ওয়াতন* (লক্ষ্মৌ: নামী প্রেস, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৬৩ ।

১০৩ *তদেব*, পৃ. ৮৬ ।

১০৪ *তদেব*, পৃ. ৮৭ ।

১০৫ *তদেব*, পৃ. ২২৫

১০৬ *তদেব*, পৃ. ২২৭ ।

১০৭ *তদেব*, পৃ. ১১২ ।

১০৮ গোপী চাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে তাহরিক আজাদি অওর উর্দু শায়েরী* (নয়াদিল্লী: ফুরুগে উর্দু জবান, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৬৪ ।

১০৯ জগন্নাথ আজাদ, *সিতারোঁ সে জাররোঁ তক* (লাহোরঃ মাকতুবায়ে এলম ও দানশ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৭৩ ।

১১০ জগন্নাথ আজাদ, *ওয়াতন মে আজনবী* (নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৩২ ।

১১১ *তদেব*, পৃ. ৬৩ ।

১১২ জগন্নাথ আজাদ, *নুয়ায়ে পেরেশান* (লাহোরঃ মাকতুবায়ে এলম ও দানশ, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ১৩৪ ।

১১৩ মোহাম্মদ আইয়ুব ওয়াকফ, *জগন্নাথ আজাদ এক মুতালি'আ* (দিল্লীঃ ইলমী মজলিস, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ২৩১ ।

১১৪ জগন্নাথ আজাদ, *উর্দু* (দিল্লীঃ মাকতুবায়ে কসরে উর্দু, ১৯৫১ খ্রি.), পৃ. ২৩ ।

১১৫ মুহাম্মদ আইয়ুব ওয়াকফ, *জগন্নাথ আজাদ এক মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২ ।

১১৬ জগন্নাথ আজাদ, *বেকরান* (দিল্লীঃ কিতাব ঘর, ১৯৪৯ খ্রি.), পৃ. ৭৭ ।

১১৭ জগন্নাথ আজাদ, *সিতারোঁ সে জাররোঁ তক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩ ।

১১৮ জগন্নাথ আজাদ, *বেকরান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯ ।

১১৯ *তদেব*, পৃ. ১৩৬ ।

১২০ জগন্নাথ আজাদ, *সেতারোঁ সে জাররোঁ তক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২-১১৩ ।

১২১ জগন্নাথ আজাদ, *বেকরান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯ ।

১২২ *তদেব*, পৃ. ৬০ ।

১২৩ আজীজ নাবিল, *ফেরাক গোরাখপুরী শাখছিয়্যাত, শায়েরী অওর শানাখত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১ ।

১২৪ পোগাচাঁদ নারায়ণ, *ফেরাক গোরাখপুরী শায়ের, নক্কাদ, দানেশওর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫ ।

১২৫ ফেরাক গোরাখপুরী, *ধরতী কি করোট* (এলাহাবাদঃ সাহিত্য কালাভুন, ১৯৬৬ খ্রি.), পৃ. ৪২ ।

১২৬ *তদেব*, পৃ. ১৫২ ।

১২৭ *তদেব*, পৃ. ৯৭ ।

১২৮ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *ফেরাক গোরাখপুরী শায়ের, নক্কাদ, দানেশওর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২১ ।

১২৯ ফেরাক গোরাখপুরী, *গুলবাঙ্গ* (এলাহাবাদঃ সাহিত্য কালাভুন, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১২৫ ।

১৩০ ফেরাক গোরাখপুরী, *ধরতী কি করোট*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫ ।

১৩১ ফেরাক গোরাখপুরী, *গুলবাঙ্গ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬-১৮৭ ।

১৩২ ফেরাক গোরাখপুরী, *রুহে কায়েনাত* (এলাহাবাদঃ আইওয়ানে ইশায়াত, তা. বি.), পৃ. ১৫৯ ।

১৩৩ ফেরাক গোরাখপুরী, *গুলবাঙ্গ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮ ।

১৩৪ *তদেব*, পৃ. ১২৮ ।

১৩৫ ফেরাক গোরাখপুরী, *ধরতী কি করোট*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০ ।

১৩৬ কামিল বাহজাদী, *তিলোকচাঁদ মাহরুম এক মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫ ।

১৩৭ *তদেব*, পৃ. ১২৪ ।

১৩৮ তিলোকচাঁদ মাহরুম, *বাচ্চোঁ কি দুনিয়া* (নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৭৩ ।

১৩৯ তিলোকচাঁদ মাহরুম, *গঞ্জে মা'আনি* (লাহোরঃ আতরচাঁদ কাপুড় এণ্ড সন্স পাবলিশার্স, ১৯৩২ খ্রি.), পৃ. ১৬২ ।

১৪০ *তদেব*, পৃ. ২২৫ ।

১৪১ তিলোকচাঁদ মাহরুম, *নৈরাঙ্গে মা'আনি* (দিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ১১৭ ।

১৪২ তিলোকচাঁদ মাহরুম, *গঞ্জে মা'আনি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫ ।

১৪৩ তিলোকচাঁদ মাহরুম, *কারওয়ানে ওয়াতন* (নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৪০ ।

১৪৪ *তদেব*, পৃ. ৪৩ ।

১৪৫ *তদেব*, পৃ. ৫৭ ।

১৪৬ তিলোকচাঁদ মাহরুম, *গঞ্জে মা'আনি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৬ ।

১৪৭ তিলোকচাঁদ মাহরুম, *কারওয়ানে ওয়াতন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৯ ।

১৪৮ *তদেব*, পৃ. ৬৫ ।

১৪৯ তিলোকচাঁদ মাহরুম, *বাচ্চো কি দুনিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬ ।

১৫০ *তদেব*, পৃ. ৪৪ ।

১৫১ তিলোকচাঁদ মাহরুম, *গঞ্জে মা'আনি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১ ।

১৫২ *তদেব*, পৃ. ৯০ ।

১৫৩ *তদেব*, পৃ. ৯৯ ।

১৫৪ *তদেব*, পৃ. ৪০৮-৪০৯ ।

১৫৫ *তদেব*, পৃ. ৪১৬-৪১৭ ।

১৫৬ তিলোকচাঁদ মাহরুম, *নৈরাঙ্গে মা'আনি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০ ।

১৫৭ *তদেব*, পৃ. ১৪০ ।

১৫৮ তিলোকচাঁদ মাহরুম, *গঞ্জে মা'আনি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪ ।

১৫৯ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু* , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮ ।

১৬০ আনন্দ নারায়ণ মোল্লা, *মেরি হাদিসে উমরে গ্রীজান* (এলাহাবাদঃ ইণ্ডিয়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩ খ্রি), পৃ. ৮৩ ।

১৬১ *তদেব*, পৃ. ৩৫০ ।

১৬২ *তদেব*, পৃ. ১৯০ ।

১৬৩ শাহেদ মাহলি, *আনন্দ নারায়ণ মোল্লা শায়ের অওর দানেশওর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪ ।

১৬৪ ড. আই-এ আবদুল্লাহ, *সত্বীয়াপাল আনন্দ কি নজম নিগারি* (দিল্লীঃ পাবলিশার্স এ্যাণ্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, ২০০৮ খ্রি), পৃ. ১৮৮ ।

১৬৫ সত্বীয়াপাল আনন্দ, *ওয়াক্ত লা ওয়াক্ত* (দিল্লীঃ প্রিন্স অফসেট প্রিন্টার্স, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২৯ ।

১৬৬ সত্বীয়াপাল আনন্দ, *মুঝে না কর বিদা* (নয়াদিল্লীঃ ইসতেয়ারে পাবলিকেশন্স, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩৪ ।

১৬৭ সত্বীয়াপাল আনন্দ, *লাহু বোলতা হ্যা* (নয়াদিল্লীঃ আসিন অফসেট প্রিন্টার্স, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ২৫ ।

১৬৮ ড. আই-এ আবদুল্লাহ, *সত্বীয়াপাল আনন্দ কি নজম নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১ ।

১৬৯ সত্বীয়াপাল আনন্দ, *তথাগত নজমী* (দিল্লীঃ পাবলিশার্স এ্যাণ্ড এডভারটাইভার্স, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ১২৭ ।

১৭০ সাজ্জিদা খাতুন, *বিসুবি সাদী কে উর্দু মুসন্নেফীন* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১০৪-১০৫ ।

১৭১ মোহাম্মদ জামিল আহমেদ, *উর্দু শায়েরী কি মুখতাছার তারিখ* (লক্ষ্ণৌ: নওল কিশোর, ১৯৪১ খ্রি.), পৃ. ২৯৯।

১৭২ আর রায়না, *পণ্ডিত মেলারাম অফা হায়াত ও খেদমত* (নয়াদিল্লী: এনসেস অফসেট প্রিন্টার্স, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৫৫।

১৭৩ *তদেব*, পৃ. ১১৫-১১৬।

১৭৪ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার* (শ্রীনগর: মীজান পাবলিশার্স এণ্ড ডিসট্রিবিউটার্স, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৩৬।

১৭৫ সেলিম হামিদ রিজভী, *উর্দু আদব কী তারাক্কি মে ভুপাল কা হিস্সা* (ভুপাল: বাবুল ইলম পারলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪৭০।

১৭৬ মুন্সী সুরজ নারায়ণ মেহের, *কালামে মেহের*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৯।

১৭৭ সুম্বুল নিগার, *উর্দু শায়েরী কা তানক্বীদী মুতালি'আ* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৭৮।

১৭৮ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কি তারিখ*, , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭।

১৭৯ পণ্ডিত দয়াশংকর নাসিম, *মছনবী গুলজারে নাসিম* (লক্ষ্ণৌ: উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমি, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৫।

১৮০ Urdunotes.com/lesson/masnavi-gulzar-e-naseem khulasa-in-Urdu/

১৮১ *তদেব*।

১৮২ পণ্ডিত দয়াশংকর নাসিম, *মছনবী গুলজারে নাসিম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

১৮৩ সৈয়দ রফিক, *হিন্দুয়োঁ মে উর্দু*, ১ম খণ্ড (লক্ষ্ণৌ: নাসিম বুক ডিপো, তা. বি.), পৃ. ১৮৭।

১৮৪ নুর আহমেদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৮।

১৮৫ আতাউল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার* (নয়াদিল্লী: সাহিত্য একাডেমি, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৭১।

১৮৬ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা* (দিল্লী: উর্দু একাডেমি, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯২।

১৮৭ সৈয়দ রফিক, *হিন্দুয়োঁ মে উর্দু*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯২।

১৮৮ আতাউল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

১৮৯ সৈয়দ রফিক, *হিন্দুয়োঁ মে উর্দু*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯২।

১৯০ আতাউল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১।

১৯১ গুনপত সাহায়ে শ্রীভাস্টু, *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্সা* (এলাহাবাদ: ইসরার কারিমী প্রেস, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৪৪৯।

১৯২ মুন্সী জাওলা প্রসাদ বারক, *মছনবী বাহার* (লক্ষ্ণৌ: নওল কিশোর, ১৯১১ খ্রি.), পৃ. ২।

১৯৩ ইশরাত লক্ষ্ণৌবী, *হিন্দু শু'আরা* (লক্ষ্ণৌ: নামী প্রেস, ১৯৩১ খ্রি.), পৃ. ২৪।

১৯৪ শিয়াম সুন্দর বারক, *সালকে* মারওরিদ (লক্ষ্ণৌ: নওল কিশোর, ১৯২২ খ্রি.), পৃ. ১।

১৯৫ আতাউল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

১৯৬ ফয়েজ উদ্দিন, *তাজকিরায়ে হিন্দু শু'আরায়ে বিহার* (বিহার: ন্যাশনাল বুক সেন্টার, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ৪৭।

১৯৭ আতাউল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।

১৯৮ নুর আহমেদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১।

১৯৯ গুনপত সাহায়ে শ্রীভাস্টু, *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫২।

২০০ ড. জগদীশ মেহতা দরদ, *উর্দু কে নান মুসলিম শু'আরা অওর আদীব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।

২০১ সৈয়দ লতিফ হুসেইন আদীব, *চান্দ শু'আরায়ে বারেলী* (লক্ষ্মৌ: মারকীয আদব উর্দু, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ১৭২।

২০২ গুনপত সাহায়ে শ্রীভাস্টু, *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্‌সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫০।

২০৩ সৈয়দ রফিক, *হিন্দুয়োঁ মে উর্দু*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০০।

২০৪ আতাউল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

২০৫ *তদেব*, পৃ. ১১১।

২০৬ গুনপত সাহায়ে শ্রীভাস্টু, *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্‌সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫১।

২০৭ আতাউল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

২০৮ নুর আহমেদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৬।

২০৯ *তদেব*, পৃ. ২৮১।

২১০ ইশরাত লক্ষ্মৌবী, *হিন্দু শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১।

২১১ ফয়েজ উদ্দিন, *তাজকিরায়ে হিন্দু শু'আরায়ে বিহার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪।

২১২ আতাউল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫।

২১৩ নুর আহমেদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯১।

২১৪ সৈয়দ রফিক, *হিন্দুয়োঁ মে উর্দু*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৮।

২১৫ *তদেব*, পৃ. ৩১৭।

২১৬ আতাউল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০।

২১৭ প্রেমপাল অশোক, *সরশার এক মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১।

২১৮ আব্দুস শুকর, *দওরে জাদীদ মে চান্দ মুন্তাখাব হিন্দু শু'আরা* (লক্ষ্মৌ: কিতাব খানা, ১৯৪৩ খ্রি.), পৃ. ৫০।

২১৯ হাবীব জিয়া, *মহারাজা স্যার কিশন প্রসাদ শাদ: হায়াত অওর আদবী খেদমত* (হায়দ্রাবাদ: উর্দু একাডেমি, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ৭২।

২২০ গুনপত সাহায়ে শ্রীভাস্টু, *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্‌সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫১।

২২১ *তদেব*।

২২২ গীয়ানচাঁদ জীন, *উর্দু মছনবী শিমালী হিন্দ মে*, (আলীগড়: আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, ১৯৬৯ খ্রি.), পৃ. ৪৭৮।

২২৩ আব্দুল মান্নান তারজি, *না'ত গোয়ানে গায়রে মুসলিম*, (নয়াদিল্লী: বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮ খ্রি.), পৃ. ১৬৭।

২২৪ সৈয়দ রফিক, *হিন্দুয়োঁ মে উর্দু*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯।

২২৫ গুনপত সাহায়ে শ্রীভাস্টু, *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্‌সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৬।

২২৬ *তদেব*, পৃ. ৪৩৫।

২২৭ আতা উল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫।

২২৮ নুর আহমেদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৩।

২২৯ গুনপত সাহায়ে শ্রীভাস্টু, *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্‌সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫২।

২৩০ নাসির উদ্দিন হাসমী, *দাকানী হিন্দু অওর উর্দু* (হায়দ্রাবাদঃ স্টেশন রোড, তা.বি.), পৃ. ৪৫-৪৬।

২৩১ গুনপত সাহায়ে শ্রীভাস্টু, *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্‌সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫১।

২৩২ নাসির উদ্দিন হাসমী, *দাকানী হিন্দু অওর উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

২৩৩ মুন্সী গোরাখপ্রসাদ ইবরত, *হুসনে ফিতরত* (লক্ষ্মৌঃ উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ১।

২৩৪ *তদেব*, পৃ. ৩২।

২৩৫ আতা উল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০।

২৩৬ *তদেব*, পৃ. ১৬১-১৬২।

২৩৭ নুর আহমেদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৭।

২৩৮ সাজ্জিদা খাতুন, *বিসুবি সাদী কে উর্দু মুসন্নেফীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

২৩৯ গুনপত সাহায়ে শ্রীভাস্টু, *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্‌সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫২।

২৪০ আতা উল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪।

২৪১ *তদেব*, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

২৪২ *তদেব*, পৃ. ১৭৮।

২৪৩ সৈয়দ রফিক, *হিন্দুয়োঁ মে উর্দু*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫।

২৪৪ গিয়ানচাঁদ জীন, *উর্দু মছনবী শিমালী হিন্দ মে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৫।

২৪৫ নুর আহমেদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭০।

২৪৬ আতা উল্লাহ পালবী, *উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩।

২৪৭ *তদেব*

২৪৮ *তদেব*, পৃ. ২০৪।

২৪৯ গুনপত সাহায়ে শ্রীভাস্টু, *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্‌সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫১।

২৫০ আখতার ওয়ারেনভী, *বিহার মে উর্দু জবান ও আদব কা ইর্তেকা* (পাটনাঃ লাইবুল লেথু প্রেস, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ৩৪২।

২৫১ *তদেব*, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪।

২৫২ সুম্বুল নিগার, *উর্দু শায়েরী কা তানক্বীদী মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২-১৪৩।

২৫৩ *তদেব*, পৃ. ১৪২।

২৫৪ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কি তারিখ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

২৫৫ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।

২৫৬ *তদেব*, পৃ. ১০৫।

২৫৭ আলী জাওয়াদ জায়দী, *উত্তর প্রদেশ মে উর্দু মারছিয়া নিগারী* (লক্ষ্মৌঃ ইউনাইটেড বালাক প্রিন্টার্স, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ২৩৮।

২৫৮ সৈয়দ আমজাদ হুসাইন, *গায়রে মুসলিম মারছিয়া নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪।

২৫৯ প্রফেসর আকবর হায়দারী কাশ্মিরী, *হিন্দু মারছিয়া গো শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

২৬০ মীর্জা দিলগীর লক্ষ্মৌবীঃ *কুল্লিয়াতে মারছিয়া দিলগীর*, ১ম খণ্ড (লক্ষ্মৌঃ মুন্সী নওল কিশোর, ১৮৮৮ খ্রি.), পৃ. ৩।

২৬১ সৈয়দ আশুর কাজমী, *উর্দু মারছিয়া কা সফর* (দিল্লীঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১১৭৫।

২৬২ প্রফেসর আকবর হায়দারী কাশ্মিরী, *হিন্দু মারছিয়া গো শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।

২৬৩ আলী জাওয়াদ জায়দী, *উত্তর প্রদেশ মে উর্দু মারছিয়া নিগারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।

২৬৪ *তদেব*, পৃ. ১০৫।

২৬৫ প্রফেসর আকবর হায়দারী কাশ্মিরী, *হিন্দু মারছিয়া গো শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০।
২৬৬ ড. জগদীশ মেহতা দরদ, *উর্দু কে নান মুসলিম শু'আরা ও আদীব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯।
২৬৭ আজীম আখতার, *বিসুবী সাদী কে শু'আরায়ে দিল্লী*, ১ম খণ্ড (দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ২৪৭।
২৬৮ আলী আব্বাস হুসাইনী, *উর্দু মারছিয়া* (লক্ষ্ণৌঃ উর্দু পাবলিশার্স, ১৯৭৩ খ্রি.), পৃ. ২২৮।
২৬৯ প্রফেসর আকবর হায়দারী কাশ্মিরী, *হিন্দু মারছিয়া গো শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯।
২৭০ হাবীব জিয়া, মহারাজা স্যার কিশন প্রসাদ শাদ *হায়াত অওর আদবী খেদমত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।
২৭১ *তদেব*, পৃ. ৮৬।
২৭২ দিলুরাম কৌসারী, *হিন্দু কী না'ত* (দিল্লীঃ খাজা হাসান নিজামী, ১৯৩৭ খ্রি.), পৃ. ২-৭।
২৭৩ প্রফেসর আকবর হায়দারী কাশ্মিরী, *হিন্দু মারছিয়া গো শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২।
২৭৪ *তদেব*, পৃ. ২৪৮।
২৭৫ গুনপত সাহায়ে শ্রীভাস্টু, *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬০।
২৭৬ আব্দুল মান্নান তারজি, *না'ত গোয়ানে গায়রে মুসলিম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।
২৭৭ মুন্নী লালজোয়ান, *আয়না বাহুর* (কলকাতাঃ স্টার আর্ট প্রেস, তা. বি.), পৃ. ৪৭।
২৭৮ সৈয়দ আশুর কাজমী, *উর্দু মারছিয়া কা সফর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭৯।
২৭৯ ইরফান তোরাবী, *ছাবের সেকুয়াবাদী কে মারছিয়া অওর ছালাম* (কাশ্মিরঃ তোরাবী পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১০।
২৮০ *তদেব*, পৃ. ৫৭।
২৮১ সৈয়দ আশুর কাজমী, *উর্দু মারছিয়া কা সফর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮২।
২৮২ *তদেব*, পৃ. ১১৮৩।
২৮৩ জলীলুর রহমান জলীল, *বোরহানপুর কে আহাম মারছিয়া নিগার* (মুম্বাইঃ আল কমাল উর্দু ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৬৫।
২৮৪ নুর আহমেদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫।
২৮৫ সৈয়দ আমজাদ হুসাইন, *গায়রে মুসলিম মারছিয়া নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।
২৮৬ নুর আহমেদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮০।
২৮৭ সৈয়দ আমজাদ হুসাইন, *গায়রে মুসলিম মারছিয়া নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯।
২৮৮ আলী জাওয়াদ জায়দী, *উত্তর প্রদেশ মে উর্দু মারছিয়া নিগারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৯।
২৮৯ সৈয়দ আমজাদ হুসাইন, *গায়রে মুসলিম মারছিয়া নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮।
২৯০ আলী জাওয়াদ জায়দী, *উত্তর প্রদেশ মে উর্দু মারছিয়া নিগারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৪।
২৯১ সৈয়দ আমজাদ হুসাইন, *গায়রে মুসলিম মারছিয়া নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪।
২৯২ *তদেব*, পৃ. ১৫৫।
২৯৩ জগন্নাথ আজাদ, *মাতমে নেহরু* (নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ২৪।
২৯৪ জগন্নাথ আজাদ, *আবুল কালাম আজাদ* (লক্ষ্ণৌঃ ইদারাহ ফুরুগে উর্দু, তা. বি.), পৃ. ৫।
২৯৫ আজীজ নাবিল, *ফেরাক গোরাখুপুরী শাখছিয়্যাত শায়েরী অওর শানাখত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।
২৯৬ রামলাল নাভোবী, *হিন্দুস্তানি আদব কে মি'মার তিলোক চাঁদ মাহরুম*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০।
২৯৭ শাহেদ মাহলি, *আনন্দ নারায়ণ মোল্লা শায়ের অওর দানেশওর*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

তৃতীয় অধ্যায়

উর্দু গদ্যসাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান

পৃথিবীর সকল সাহিত্য কাব্য ও গদ্য দুই ধারায় বিভক্ত। উর্দু সাহিত্য ইতিহাসে প্রাচীনকালে গদ্যের চেয়ে কাব্যের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক কালে সে ধারা পরিবর্তিত হয়ে কাব্য হতে গদ্য প্রাধান্য লাভ করেছে। এর প্রধান কারণ আধুনিক যুগের সহজ-সরল ও স্বাভাবিকভাবে বক্তব্য উপস্থাপন। গদ্যের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। যেমন উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, সংবাদ সাহিত্য এবং অনুবাদ সাহিত্য ইত্যাদি। এখানে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ, এবং সংবাদ সাহিত্যে অমুসলিম লেখকদের অবদান উপস্থাপন করা হলো।

৩.১ উপন্যাস

উপন্যাস আসলে ইটালিয়ান ভাষা Novella থেকে এসেছে।[১] কেউ কেউ বলেছেন উপন্যাস ইংরেজি ভাষা থেকে এসেছে।[২] এ প্রসঙ্গে সাহিল বুখারি বলেছেন-

"جب انگریزی ادب کے زیر اثر یہ صنف ہماری زبان میں مستقل ہوئی تو اس کا نام "ناول" بھی اس کے ساتھ چلا آیا۔"[৩]

উপন্যাস শব্দটি উপনয় বা উপন্যাস্ত শব্দ থেকে উৎপত্তি। যা ইংরেজি Novel শব্দের সমার্থক রূপ। এটি ল্যাটিন শব্দ Novellus বা Novus থেকে নেওয়া হয়েছে। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় গল্প উপখ্যান বা উপন্যাস।[৪] আধুনিক কালে উর্দুতে কিচ্ছাকে উপন্যাস হিসেবে ধরা হয় যা পাশ্চত্য সাহিত্য হতে এসেছে।[৫] প্রাথমিক যুগে নভেল শব্দটি ল্যাটিন ভাষায় নতুন অর্থে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু পরবর্তীতে বকেশু তার বিখ্যাত Decameron গ্রন্থ এর ভূমিকায় Novel শব্দটিকে নতুন ক্বিচ্ছা-কাহিনি অর্থে ব্যবহার করেছেন। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, কোন বাস্তব কাহিনি কোন কল্পনা প্রসূত চিন্তা ভাবনাকে আশ্রয় করে লেখকের যে চিন্তাদর্শন, বর্ণনাত্মক শিল্পকর্মে রূপায়িত হয় তাকেই উপন্যাস হিসেবে অভিহিত করা যায়। উপন্যাস একটি সর্ব উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম।[৬]

অন্যান্য শিল্পকর্মের তুলনায় একটি স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম হলো উপন্যাস। কেননা জীবনের বাস্তবতাকে সমাজের সামনে এই শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, জীবনের গতি প্রকৃতিকে অনুধাবন করা যায়। যে কাল্পনিক গদ্যসাহিত্যে মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়, যার বিষয়বস্তু, ঘটনা, চরিত্র ইত্যাদি সমাজের বাস্তব প্রতিনিধি হবে, সেখানে বিভিন্ন জটিলতা থাকা সত্ত্বেও একটি শিল্পগত ঐক্য থাকবে তাই উপন্যাস। উপন্যাস হলো বাস্তব জীবনের চালচলন ও রীতিনীতির প্রতিচ্ছবি।[৭] এই প্রসঙ্গে সাহিল বুখারি বলেছেন-

"فن کی روسے ناول اس نثری قصے کو کہتے ہیں جس میں کسی خاص نقطۂ نظر کے تحت زندگی کی حقیقی وواقعی عکاسی کی گئی ہو۔"[৮]

উপন্যাসের সংজ্ঞা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন- E.M. Forster বলেছেন- "The Novel tells a story that is the fundamental aspect without it could not exist that is the highest factor common to all novels."[৯]

কোন সংজ্ঞাতেই উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ পায়নি; বরং একেক সংজ্ঞায় উপন্যাসের একেক দিক ফুটে উঠেছে। তথাপি বিভিন্ন সমালোচক ও সাহিত্যিকগণ উপন্যাসের সংজ্ঞা উপন্যাসের প্রয়োজন ও বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখেই দিয়েছেন। প্রখ্যাত সমালোচক আলে আহমেদ সরুর বলেছেন-

"ناول ایک مسلسل قصے کا دوسرا نام ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ تاریخی نقطۂ نظر سے صحیح ہو مگر ایسا ہو سکتا ہے۔ ناول سے بہت سے کام لیے گئے ہیں۔ جس طرح شاعری سے لیے گئے ہیں۔ اس کے ذریعے سے طنز کے تیر برسائے گئے ہیں۔ وعظ، نصیحت کے دفتر کھولے گئے ہیں، سیاسی مسائل حل کیے گئے ہیں۔ مذہبی عقیدوں کو سلجھایا گیا ہے۔ اور علمی مباحث بیان کیے گئے ہیں۔ مگر یہ سب ضمنی باتیں ہیں۔ ناول کا اصل مقصد تفریحی ہے۔"[১০]

আই এম ফস্টার এর উদ্ধৃতি দিয়ে ড. মেহজাবিন বলেছেন-

"ناول ایک خاص طوالت کا نثری فسانہ ہے۔"[১১]

উপন্যাস গদ্যসাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে সর্ব উৎকৃষ্ট। উপন্যাস সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় উপস্থাপন করে। উপন্যাস কেবলমাত্র মানব জীবনের বিশেষ কোন দিক নিয়ে আলোচনা করে না বরং সামগ্রিক দিক এতে স্থান পায়। উপন্যাসের বিষয়বস্তুই হলো মানবজীবন। এজন্য উপন্যাসে মানব জীবনের অন্তর্নিহিত সকল বিষয়সমূহ নিখুঁতভাবে পরিস্ফুটিত হয়ে থাকে। প্রাথমিক যুগের উর্দু উপন্যাসে গতানুগতিক ক্বিচ্ছা-কাহিনির উপর গুরুত্ব দেওয়া হতো যা সে যুগের জন্য যুগোপযোগী ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তা রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক, ধর্মীয়, ঐতিহাসিক, দর্শন ইত্যাদি সমস্যাকে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। এভাবেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু বৈচিত্রময়ে পরিণত হয়েছে।[১২] উপন্যাস উর্দু গদ্যসাহিত্যের একটি সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম। বিভিন্ন সাহিত্যিকগণ তাদের চিন্তা-ভাবনা ও লেখনীর মাধ্যমে উপন্যাসকে শ্রেষ্ঠ গদ্যসাহিত্যে পরিণত করেছেন। উপন্যাস অধ্যায়ে অমুসলিম লেখকদের সৃজনশীল স্বাতন্ত্র্যও স্পষ্ট। উর্দু উপন্যাসগুলোর বিবর্তনে অমুসলিম লেখকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এই গদ্য সাহিত্যে যে অমুসলিম ঔপন্যাসিকদের আবির্ভাব হয়েছিল তাদের সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডগুলো সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হলো-

প্রেমচাঁদঃ উর্দু গদ্যসাহিত্যে প্রেমচাঁদের স্থান অনেক উর্ধ্বে। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে উর্দু গদ্যসাহিত্যে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি একাধারে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, অনুবাদ, প্রবন্ধ, পত্রসাহিত্য দাপটের সাথে লিখে উর্দু গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি একজন কলম সৈনিকের স্বাক্ষর রেখেছেন। মুন্সী প্রমচাঁদের প্রকৃত নাম ধনপত রায়; কিন্তু উপন্যাস ও ছোটগল্পের জগতে তিনি প্রেমচাঁদ নামে পরিচিত।[১৩] মুন্সী তার পিতামহের উপাধি। তিনি বেনারসের নিকট পাণ্ডেপুর গ্রামে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১৪] কেউ কেউ বলেছেন তিনি বেনারসের নিকটে লামহী নামক গ্রামে ৩১ জুলাই ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।[১৫] তার পিতার নাম মুন্সী আজায়েব লাল এবং মাতার নাম আনন্দ দেবী।[১৬] প্রেমচাঁদ কায়স্থ বংশের লোক ছিলেন।[১৭] প্রথমে তিনি বাড়িতেই ফারসি ও উর্দু শিক্ষা অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি চাকরি জীবন শুরু করেন। এ সময় থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তিনি সাহিত্যের মধ্যে দরিদ্র মানুষের কথা বলার চেষ্টা করেছেন। তিনি তার সাহিত্য জীবনে ১৫টি উপন্যাস রচনা করেছেন।[১৮] তার সাহিত্যে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতের অবহেলিত শোষিত মানুষের জীবনের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি তার সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতের শ্রমিক শ্রেণিকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছেন। তার সাহিত্যের মধ্যে কৃষকদের উপর জমিদারের অত্যাচার এবং কৃষকদের দূরাবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রেমচাঁদের সাহিত্যের মূল বিষয়ই ছিল কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের উপর ইংরেজ সরকার ও তাদের অনুগত জমিদার, মহাজন, তহশীলদার ও পুলিশের নির্যাতনের কথা। তিনি কখনও লোভ লালসার কাছে নতি স্বীকার করেননি। তিনি চাকরি করার পরও ভারতীয় কৃষক, শ্রমিক ও স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অজস্র ধারায় সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। লেখক হিসেবে তিনি ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করেন। মাত্র ছত্রিশ বৎসরের সাহিত্যিক জীবনে তিনি প্রচুর লিখেছেন।[১৯] অবশেষে প্রেমচাঁদ ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২০]

উর্দু গদ্যসাহিত্যে প্রেমচাঁদের উপন্যাসের বর্ণনা তুলে ধরা হলো- جلوہ ایثار (জলওয়ায়ে-ঈছার) প্রেমচাঁদের প্রাথমিক যুগের উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। শৈল্পিক ও বর্ণনা শৈলির দিক থেকে এই উপন্যাসকে সম্পূর্ণ উপন্যাস বলা হয়। এই উপন্যাসটি ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়।[২১] এ উপন্যাস তৎকালীন ভারতীয় সামাজিক জীবনের বাস্তবধর্মী ঘটনার দর্পণ স্বরূপ। যাতে চতুর্ভুজ প্রেমের রোমাঞ্চকর কাহিনি আকর্ষণীয় ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু নর-নারীর প্রেম-ভালোবাসা, বৈধব্য ও এদের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং নারী-পুরুষের অসম বিবাদের পরিণতি।[২২]

এই উপন্যাসের নায়িকা হলো বিরজন এবং নায়ক হলো প্রতাপ চন্দ্র, আরো দুটি প্রধান চরিত্র হলো কমলাচরণ ও মাধুরী। প্রতাপচন্দ্র ও বিরজন শৈশবকাল থেকেই একে অপরকে অনেক ভালোবাসত। বিরজন হলো অনেক ধনী পরিবারের মেয়ে এবং প্রতাপচন্দ্র হলো পিতৃহীন ও গরিব। নায়িকা বড়লোক হওয়ার কারণে তাদের প্রেম বাস্তবে রূপ নেয়নি। তার বাবা তাকে একটি ধনী পরিবারের ছেলে কমলাচরণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। বিরজন বড়লোকের মেয়ে হলেও সে একজন ধর্মভীরু নারী। বিয়ের পরে সে অন্যান্য নারীর মত সংসারী হয়ে উঠে। সে তার ভালোবাসার মানুষ প্রতাপকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে। সবকিছু ভুলে সে মনে করে তার স্বামীই তার প্রিয়জন। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে। এতদসত্ত্বেও তার স্বামী কমলাচরণ মৃত্যুবরণ করলে সে বিধবা হয়ে যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর তার ভালোবাসার স্মৃতি নিয়ে সে সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। কমলাচরণের মৃত্যুর পর তার মা বিরজনকে অত্যাচার করলেও সে তার স্বামীর ভিটা ছেড়ে চলে যায়নি। অপরদিকে বিরজনের ভালোবাসার মানুষ প্রতাপচন্দ্র বিরজনের প্রতি এত ভালোবাসা ছিল যে তার বিয়ের পর সে আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন সে শুনতে পায় বিরজনের স্বামী মারা গিয়েছে তখন তার আবার ভালোবাসা প্রবল হয়। সে কারণে সে ছুটে যায় বিরজনের বাড়ির দরজায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার মনে ভয় লাগে। কারণ এতে পাপ ও অধর্ম হবে। আবার বিরজনকে সবাই খারাপ মনে করবে। এই সব কথা চিন্তা করে সে ফিরে আসে এবং সন্ন্যাসী জীবন গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে প্রেমচাঁদ তার এই উপন্যাসে এক উদ্বৃতি এভাবে তুলে ধরেছেন-

"اس تازیانہ نے وہ منزل ایک ہی لمحہ میں طے کردی جس کے طے ہونے میں برسوں لگتے اس کی زندگی کا ارادہ مستقل ہو گیا معمولی صورتوں میں قومی خدمت اس کی زندگی کا ایک دلچسپ اور غالباً ضروری مشغلہ ہوتی مگر ان واقعات نے قومی خدمت زندگی کو اس کی زندگی کی غرض اور غایت بنا دیا سبا کی دلی آرزو پوری ہونیکے سامان پیدا ہو گئے۔"[২৩]

প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে নায়ক প্রতাপচন্দ্রকে সন্ন্যাসী চরিত্রে চিত্রিত করেছেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাধুর পথ বেছে নিয়েছে। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে ড. কমর রইস বলেছেন-

"وہ ایک جوان سال، روشن، ضمیر، برہمچار اور سادھو ہے۔"[২৪]

জলওয়ায়ে-ঈছার উপন্যাসের আরেকটি প্রধান চরিত্র হলো মাধুরী। সে প্রতাপের গুণের কথা বিরজনের কাছ থেকে শুনেছিল। সে থেকেই মাধুরী প্রতাপকে গভীরভাবে ভালোবাসত। কিন্তু কোন দিন প্রতাপের কাছ থেকে প্রতিদানে কিছু চায়নি। সে নিঃস্বার্থভাবে প্রতাপকে ভালো বেসেছে। অবশেষে তাদের ভালোবাসা পরিণতি লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে ড. কমর রইস বলেছেন-

"جب مادھوری اس کے سامنے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتی ہے تو وہ بڑی آسانی سے اس کے ساتھ شادی کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔"[২৫]

এই উপন্যাসটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এতে সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসন খুব সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। এছাড়া এই উপন্যাসে গ্রামীণ চিত্র ও কৃষকদের দৃশ্যাবলী দেখানো হয়েছে। যেমন প্রেমচাঁদ লিখেছেন-

"ظالم آسمان نے سارے سامان بگاڑ دیئے۔۔۔ فصل ستیاناس ہو گئی۔ اناج برف کے تلے دب گیا۔ بخار کا زور ہے سارا گاؤں ہسپتال بنا ہوا ہے۔ فصل کا یہ حال اور مالگزاری وصول کی جا رہی ہے۔ بڑی بدعت ہو رہی ہے۔ مار دھاڑ گالی گفتار غرض سب ہی ہتھیاروں سے کام لیا جا رہا ہے۔ غریبوں پر یہ قہر خدا۔"[২৬]

এই উপন্যাসে লেখক চরিত্রায়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, কোন উপন্যাসে নায়ক-নায়িকার মিল স্বাভাবিক, কিন্তু এই উপন্যাসে লেখক নায়ক-নায়িকার চরিত্রকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে, তাদের মিলন সম্ভব ছিল না।

জলওয়ায়ে-ঈছারের পর প্রেমচাঁদ "بازار حسن" (বাজারে-হুসন) ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে লিখা শুরু করেন। বাজারে-হুসন এর বিষয়বস্তু হলো সমাজ সংস্কার।[২৭] এই উপন্যাসে লেখক তৎকালীন ভারতের সামাজিক সংস্কার বিশেষ করে নারীদের সামাজিক সমস্যাবলী চিত্রায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. রামবালাস শর্মার উদ্ধৃতি দিয়ে ড. ইউসুফ সারমাসত লিখেছেন-

"بازار حسن" کا بنیادی مسئلہ ہندوستانی عورت غلامی ہے۔"[২৮]

এই উপন্যাসের নাম প্রেমচাঁদ উর্দুতে 'বাজারে-হুসন' এবং হিন্দিতে 'সিয়াসদন' রেখেছেন।[২৯] এই উপন্যাসটি তিনি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের প্রথমার্ধে রচনা করেছিলেন। কারো মতে এ উপন্যাসের প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ। আবার কেউ বলেছেন এই উপন্যাসের প্রকাশ কাল ১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ।[৩০]

এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো সুমন। তার পিতার নাম কৃষণচন্দ্র এবং তিনি ছিলেন সৎ ও নিষ্ঠাবান। তিনি একজন সৎ দারোগা ছিলেন। তিনি তার মেয়ের বিয়ের জন্য খুব চিন্তিত ছিলেন। তিনি মনে করেন অধিক যৌতুক ছাড়া সুমনের ভালো জায়গায় বিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি ঘুষ নেওয়া শুরু করেন। ঘুষ নেওয়ার জন্য তার ৫ বছর জেলও হয়। এ প্রসঙ্গে প্রেমচাঁদের ভাষায় তার স্ত্রীকে কৃষণচন্দ্র বলেছেন-

"روتی کیوں ہو میرے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے۔ اس کی سزا مل رہی ہے۔ غالبًا مجھ پر جو فوجداری کا مقدمہ چلے گا۔ تم اس کی کچھ پرواہ نہ کرنا۔ میں ہر ایک سزا کے لئے تیار ہوں۔ میرے لئے وکیلوں اور مختاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اس کفارہ سے وہ حرام کے روپے پاک ہو گئے ہیں۔ انہیں تم دونوں لڑکیوں کی شادی میں خرچ کرنا۔ اس میں ایک پائی بھی مقدمہ میں مت لگانا۔ ورنہ مجھے صدمہ ہو گا۔"[৩১]

কৃষণচন্দ্র দারোগা হিসেবে যে ঘুষ গ্রহণ করেছিল তা তার মামলা চালাতে শেষ হয়ে যায়। সে তার উৎকোচের টাকা মেয়ের বিয়েতে খরচ করতে চেয়েছিল; কিন্তু তা আর সম্ভব হয়নি। সুমনের যেখানে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তাও ভেঙ্গে যায়। তারপর এক বৃদ্ধ ও দরিদ্র কেরানি গজাধরের সাথে সুমনের বিয়ে হয়ে যায়। সেখানে সে অনেক কষ্টে থাকে। অপরদিকে তার গ্রামে ভোলীবাঈ নামে এক নর্তকী ছিল, সে সুখ-স্বাচ্ছন্দে বসবাস করতো। ভোলীবাঈ ও তার জীবনের তারতম্য লেখক এ উপন্যাসে এভাবে তুলে ধরেছেন-

"وہ آزاد ہے۔ میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں۔۔۔ وہ کتوں کے بھونکنے کی پرواہ نہیں کرتی۔ میں سرگوشیوں سے ڈرتی ہوں۔ وہ پردے کے باہر ہے میں پردے کے اندر ہوں۔ وہ ڈالیوں پر چہکتی ہے میں پنجرے کے اندر بند تڑپتی ہوں۔ اس نے شرم چھوڑ دی ہے۔ میں اس کا دامن پکڑے ہوئے ہوں اس حیا نے اس بدنامی مجھے دوسروں کی لونڈی بنا رکھا ہے۔"[৩২]

ভোলীবাঈ এর স্বাচ্ছন্দ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন দেখে সেও এ ধরনের জীবন বেছে নেয়। এক রাত্রিতে সুমন তার বান্ধবী সুভদ্রার বাড়িতে যায়। সেখান থেকে তার স্বামী গজাধরের বাড়িতে যায় কিন্তু সেখানে তার কোন জায়গা হয় না। গজাধর তাকে দেখে দরজা বন্ধ করে দেয়। সে উপায় না পেয়ে সুভদ্রার বাড়িতে গেলে সুভদ্রার স্বামী পদ্মসিংহ তাকে বাড়িতে থাকতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তখন সে ভোলীবাঈ এর বাড়িতে থাকে এবং সেখানে নাচ, গান শিখে নর্তকী হয়ে উঠে। অর্থাৎ সুমন ভোলীবাঈ এর মত পতিতালয়ে অবস্থান করে। এই পতিতালয়ে যাওয়ার পেছনে যাদের হাত রয়েছে তারা হলো গজাধর ও পদ্মসিংহের মতো লোক। তারা যদি সে দিন তাকে ঘরে প্রবেশ করতে দিতো তাহলে সে হয়ত এ পথ বেছে নিতোনা। আবার এই পতিতালয়ে আসার পেছনে তার লোভ-লালসাকে দায়ী করা যায়। পক্ষান্তরে সুমনের পতিতা হওয়ার জন্য সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে দায়ী করা যায়। কারণ সমাজ যদি তাকে বুড়ো লোকের সাথে বিয়ে না দিতো এবং তার অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো হতো তাহলে সে পতিতালয়ে যেতো না। তাহলে বলা যায় যে, কোন না কোনভাবে সমাজ সুমনের এ অবস্থার জন্য দায়ী।

এদিকে উপন্যাসের অপর এক চরিত্র সুদন। সে তার পড়াশুনার জন্য তার চাচার বাড়ি পদ্মসিংহের বাসায় আসে। এখানে এসে তার সুমনের সঙ্গে দেখা হয়। সুমনের রূপ ও সৌন্দর্য দেখে সে তার

প্রেমে পড়ে যায়। সে সুমনের জন্য তার জীবন বিসর্জন দিতেও রাজি ছিল। কিন্তু সমাজ ও তার পরিবারের জন্য সে সুমনকে বিয়ে করতে পারে না। এই উপন্যাসের আরো একটি চরিত্র রয়েছে তা হলো, সুমনের ছোট বোন শান্তা। সুমনের কারণে শান্তার জীবনেও অনেক প্রভাব পড়ে। শান্তার বোন সুমন পতিতা তাই শান্তাকে কেউ ভালো চোখে দেখে না। অথচ শান্তা ছিলো একজন আদর্শ সতী নারী। সুদনের সঙ্গে শান্তার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু সে বিয়ে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। সুদনের সঙ্গে বিয়ে ভেঙ্গে গেলেও সে আর বিয়ে করেনি। কারণ সে সুদনকেই স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছিল এবং তাকে পাওয়ার জন্য সে বিভিন্ন পূজা পাঠ করতো।

বাজারে-হুসন উপন্যাসটি প্রেমচাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এই উপন্যাসে বীঠেল দাশ ও পদ্মসিংহকে সমাজ সংস্কারক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা পতিতাবৃত্তি সমাজ থেকে দূর করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই উপন্যাসে বীঠেল দাশ পদ্মসিংকে বলেছিলেন-

"اچھاتواب میرے مقاصد بھی سن لیجئے۔تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔میرا پہلا مقصد ہے ارباب نشاط کو شہر کے ممتاز مقامات اور شاہراہوں سے ہٹانااور دوسرا رقص وسرور کی مذموم رسم کومٹاناآپ کواس میں کوئی اعتراض ہے؟۔"[৩৩]

এই উপন্যাসে বীঠেল দাস ও পদ্মসিংহ সমাজ থেকে পতিতালয় উচ্ছেদের জন্য বোর্ডে প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হলো শহরের যে যে জায়গায় পতিতালয় রয়েছে সেগুলো উচ্ছেদ করা এবং প্রত্যেক পতিতাদের পুনর্বাসন করা। এদিকে সুমনের স্বামী গজাধর সন্ন্যাসী হয়ে যায় এবং সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে একটি সেবাসদন প্রতিষ্ঠা করে। সেই সেবাসদনে অবশেষে সুমনের স্থান হয়। এই উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, লেখক এখানে পতিতাদের দুর্দশা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এবং সমাজ সংস্কারের দিকটিও সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

বাজারে-হুসন এর বিষয়বস্তু ছিল পতিতাদের জীবনী কিন্তু প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে পতিতাদের জীবনী বর্ণনা করতে ব্যর্থ হন। এই বিষয়ের উপর উর্দু সাহিত্যে অনেক আগে 'অমরাও জানে আদা' এবং 'শাহেদ রানা' নামে দুটি উপন্যাস রচিত হয়েছিল; যার মোকাবেলায় বাজারে-হুসন সফলতা অর্জন করতে পারেনি।[৩৪] এ প্রসঙ্গে ড. কমর রইস বলেছেন-

"پریم چانداپنی ناول میں اس بلندی کونہ چھوسکے۔امراؤجان ادامیں رسوائےاس موضوع کو جس فن چابکدستی سے اپنایاہے طوائف کی زندگی،اس کے کاروبار،اس کے الجھنوں، محرومیوں اور عیش کوشیوں کوایک زوال آمادہ معاشرت کے پس منظر میں جس دلاویزی سے ابھاراہے۔"[৩৫]

এই উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উপন্যাসে সঠিকভাবে পতিতাবৃত্তি উপস্থাপিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে বাজারে-হুসন উপন্যাসটির মূল প্রতিপাদ্য পতিতাবৃত্তি নয় বরং এর অন্তরালে সমাজ থেকে অশ্লীলতা, বেহায়াপোনা ও যুব সমাজকে এসব কুকর্ম থেকে পরিত্রাণ এবং সমাজকে এর ভয়াবহ প্রভাব থেকে মুক্তি দেওয়া। এছাড়া স্বামী পরিত্যাক্ত, পতিতা ও সহায় সম্বলহীন নারীদের থাকা খাওয়া ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে কোন জায়গা বা বাসস্থান নির্মাণ করে তাদের সহায়তা করা এ উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু।[৩৬] উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, 'বাজারে-হুসন' উপন্যাসটিতে তৎকালীন ভারতীয় নারীদের সমস্যা ও মর্যাদার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

বাজারে হুসন এর পরে প্রেমচাঁদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো گوشۂ عافیت (গোশায়ে আফিয়াত)। প্রেমচাঁদ এই উপন্যাস ২ মে ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে লিখা শুরু করেছিলেন এবং ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে শেষ করেছিলেন।[৩৭] এ উপন্যাসে প্রেমচাঁদ তৎকালীন ভারতবর্ষের মেহনতি মানুষের জীবন প্রবাহ ও তাদের মৌলিক সমস্যাগুলোকে বিষয়বস্তু করেছেন। এ উপন্যাসে প্রেমচাঁদ গ্রামীণ কৃষকদের জীবন প্রবাহ ও তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলীকে তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে তুলে ধরেছেন। মূলত: প্রেমচাঁদ গ্রামের সাধারণ ও মেহনতি মানুষের দুর্গতি ও তাদের শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে তৎকালীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র এ উপন্যাসে সম্পৃক্ত করেন। তাই দেখা যায় যে প্রেমচাঁদের এ উপন্যাসে প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থার বস্তাব চিত্র পাঠকের সামনে এসে যায়।[৩৮] এ উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রেমচাঁদ শুধু ভারতের সমাজ ব্যবস্থাকে তুলে ধরেননি, তিনি সেখানকার কৃষক, কৃষককের ক্ষেতখামার ও তাদের জীবনের সামগ্রিক বিষয়গুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। অর্থাৎ তিনি এ উপন্যাসে গ্রাম্য জীবনের প্রতিচ্ছবিগুলো তুলে ধরেছেন।

এ প্রসঙ্গে সরদার জাফরী বলেছেন-

"اردو ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستانی ادب میں یہ پہلا ناول ہے جس میں دیہاتی زندگی کے بنیادی مسائل بیان کے گئے ہیں اور جاگیرداری نظام کی سچی اور کئی پہلوؤں سے مکمل تصویر کشی کی گئی ہے۔"[৩৯]

'গোশায়ে আফিয়াত' প্রেমচাঁদের প্রথম উপন্যাস, যেখানে লেখক সরাসরি প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে জমিদারদের শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য কৃষকদের প্রতি আহ্বান জানান। এ উপন্যাসে মূলত: জমিদার কর্তৃক প্রজাদের উপর নির্যাতনের প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে। তিনি এ উপন্যাসে বলেছেন যে, জমিদার প্রজাদের উপর শুধু ট্যাক্স বা কর বৃদ্ধি করে না বরং তাদেরকে

অর্থনৈতিকভাবে নিষ্পেশিত করে। প্রেমচাঁদ এ উপন্যাসে জমিদারের নানা অপকর্মের চিত্রও তুলে ধরেছেন। তিনি জমিদার চরিত্র হিসেবে জ্ঞানশংকর, কমলাচন্দ্র ও গায়ত্রীকে উপস্থাপন করেছেন।[৪০]

গোশায়ে আফিয়াত উপন্যাসে এই তিনজন জমিদার বিভিন্নভাবে কৃষকদের উপর অত্যাচার করে। জ্ঞানশংকর পুলিশের সহায়তায় বিভিন্ন কারণে প্রজাদের উপর নির্যাতন চালায়। সে প্রজাদের রাজস্ব বা কর বৃদ্ধি করে দেয়। এতে কৃষকরা অর্থনৈতিকভাবে সংকটে পড়ে যায়। কমলাচন্দ্র ইংরেজদের সহায়তায় তার পৈত্তিক জমিদারি রক্ষা করতে চেয়েছিল। এ কারণেও কৃষকদের বা প্রজাদের খুব সমস্যায় পড়তে হয়। জমিদার গায়ত্রী ইংরেজদের তোষামদ করেও তার জমিদারি ঠিক রাখতে চেয়েছিল এতে কৃষকদের সমস্যা হলেও তার কোন যায় আসে না। এই উপন্যাসে কৃষকদের নেতা হিসেবে লক্ষ্মণপুর গ্রামের মনোহরের পুত্র বলরাজকে দেখানো হয়েছে। সে একজন প্রতিবাদী বালক ছিল। সে গ্রামের কৃষকদের ভালো করার জন্য জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। জমিদাররা রাজস্ব বৃদ্ধি করলে লক্ষ্মণপুর গ্রামের কৃষকগণ প্রতিবাদে মুখরিত হয়। আর প্রতিবাদী বালক বলরাজ এই প্রতিবাদের নেতৃত্ব দেয়। প্রেমচাঁদ এ উপন্যাসে বলরাজকে রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরেছেন। সে একজন সংগ্রামী ও বিপ্লবী ব্যক্তি ছিল। সে কারণে সে কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য জমিদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সে কৃষকদের অনুপ্রেরণা যোগায়। সে কৃষকদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল। সে নিজেও কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। সে জমিদারদেরকে ভয় পায় না। প্রেমচাঁদের ভাষায় বলরাজ বলে-

"سن لے گا تو کیا کسی سے چھپا کے کہتے ہیں جسے بہت گھمنڈ ہوا آکے دیکھ لے ایک ایک کا سر توڑ کے رکھ دوں۔ یہی نہ ہو گا کیا چلا جاؤں گا۔ اس سے کیا ڈر مہاتما گاندھی بھی تو کیا۔ ہو آئے ہیں۔"[৪১]

প্রেমচাঁদ 'গোশায়ে আফিয়াত' উপন্যাসে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ের পাশাপাশি সামাজিক ও নৈতিক দিকটিও তুলে ধরেছেন। যেমন এ উপন্যাসে লেখক গায়ত্রী ও জ্ঞানশংকর চরিত্রের মাধ্যমে সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন। জ্ঞানশংকরের শ্যালিকা ছিল গায়ত্রী। সে রূপ-লাবন্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল; কিন্তু সে বিধবা ছিল। তার প্রতি তার দুলাভাই জ্ঞানশংকরের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল। সে বিভিন্ন ছলচাতুরীর মাধ্যমে গায়ত্রীর কাছে পৌঁছাতে চেষ্টা করে। কিন্তু গায়ত্রী মৃত স্বামীর স্মৃতি ও তার নিজের সতীত্ব রক্ষার্থে সচেষ্ট ছিল। শেষ পর্যন্ত সে তার সতীত্ব রক্ষা করতে পারে না। গায়ত্রী এক সময় নিজের অজান্তে জ্ঞানশংকরকে ভালোবেসে ফেলে। এক রাতে তারা দুইজনে গাড়িতে যাবার সময় সে নিজেকে জ্ঞানশংকরের কাছে বিলিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে প্রেমচাঁদ বলেন-

"اسے اب صرف کرشن لیلا کے دیکھنے ہی سے تسکین نہ ملتی تھی۔ بلکہ وہ خود بھی کوئی نہ کوئی پارٹ کھیلنا چاہتی تھی۔ وہ ان دلی جذبات کو زبان سے حرکات وسکنات سے ظاہر کرنا چاہتی تھی جو اس کے دل کی فضا میں پرندوں کی طرح آزادی سے اڑ رہے تھے۔"[৪২]

এ উপন্যাসে গায়ত্রী চরিত্রের মাধ্যমে প্রেমচাঁদ তৎকালীন ভারতবাসীর সামাজিক অবস্থার চিত্র সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

প্রেমচাঁদ 'গোশায়ে আফিয়াত' উপন্যাসটি প্রধানত: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়বস্তুকে কেন্দ্রীভূত করে রচিত করেছেন। তবে দুই একটি চরিত্রে কিছুটা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতার বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রেমচাঁদ স্বার্থপর, নির্দয় ও অত্যাচারী চরিত্র হিসেবে মুসলিম চরিত্র কাদির খাঁনকে তুলে ধরেছেন। অত্যাচারী গোমস্ত গাউস খানের কাছ থেকে কেউ রক্ষা পায়নি। অপরদিকে মনোহর ও ফয়জুল্লাহ জমিদার শ্রেণির মাধ্যমে অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধ ও মিলনাকাঙ্খ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। আর মুসলিম চরিত্র ইজাদ হোসেন হিন্দু মুসলিম ঐক্য কামনা করে বক্তব্য প্রদান করে এবং সকল ধর্মের লোকের জন্য ই'তিদাদী এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করে। মূলত: এ উপন্যাসে প্রেমচাঁদ ধর্মীয় সম্প্রীতি ও হিন্দু মুসলিম ঐক্যের কামনা করেন।[৪৩]

প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে চরিত্রায়নে এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন যে, এতে নায়ক ও নায়িকা কোনভাবে বোঝা যায় না। তার উদ্দেশ্য ছিল সমাজের সংস্কার। এজন্য তিনি বিভিন্ন চরিত্র রূপায়ন করেছেন, যা উপন্যাসকে প্রভাবিত করে। সৈয়দ মুহাম্মদ আজিম এই উপন্যাসের নায়ক বলরাজের চরিত্র সম্বন্ধে বলেছেন-

"پریم چند نے بلراج کا کردار بڑی ہی حقیقت شعارانہ فنکاری کے ساتھ پیش کیا ہے بلراج کے باغیانہ جذبات اپنے دور کے کسانوں کی عام فضا کو پیش کرتے ہیں۔"[৪৪]

'গোশায়ে আফিয়াত' কোন রোমান্টিক উপন্যাস নয়। এতে প্রেমচাঁদ শুধুমাত্র বাস্তবতা তুলে ধরেননি বরং লাখো হিন্দুস্তানিদের মনের ইচ্ছা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে ভারতীয়দের জীবনের অবস্থা ও ঘটনাকে সফলতার সাথে বর্ণনা করেছেন। এ কারণে এ উপন্যাস শৈল্পিক দিক দিয়ে এক উচ্চ স্থানে উন্নীত হয়েছে। সরদার জাফরী এ উপন্যাস সম্বন্ধে লিখেছেন-

"میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ "گؤدان" کے بعد یہ پریم چند کا سب سے اہم ناول ہے۔"[৪৫]

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, প্রেমচাঁদ এ উপন্যাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এ কারণে এই উপন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস।

প্রেমচাঁদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হলো چوگان ہستی (চৌগান হাস্তি)। প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসটি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে লেখা শুরু করেন এবং ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে তা সমাপ্তি ঘটান।[৪৬] এই উপন্যাসটি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম দারুল আশায়াত লাহোর কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[৪৭] এই উপন্যাস সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ নিজেই একটি চিঠিতে ড. ইন্দোরনাথ মদানকে লিখেছেন-

"چوگان ہستی" کو اپنا بہترین ناول قرار دیا ہے۔"[৪৮]

চৌগান হাস্তি উপন্যাসটি প্রেমচাঁদের এমন একটি সাহিত্যকর্ম, যেখানে ভারতীয় সামাজিক জীবনের মৌলিক ঘটনাবলী চিত্রায়িত হয়েছে। এছাড়া হিন্দুস্তানের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার চিত্রাবলী তার উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। এছাড়া মহাত্মাগান্ধীর নিদর্শন, চিন্তাধারা ও গান্ধীবাদের সমর্থন উপন্যাসকে আরো পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে।[৪৯]

প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে সুরদাসের চরিত্রকে শক্তিশালী চরিত্র হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। তিনি এ চরিত্রকে উপন্যাসের মেরুদণ্ড মনে করেন। সুরদাসের চরিত্রের মাধ্যমে গান্ধীবাদের নির্দশন প্রতিফলিত হয়। প্রেমচাঁদ সুরদাসের চরিত্রটিকে অনেক উচ্চ মর্যাদায় স্থান দিয়েছেন। সুরদাস চরিত্র সম্বন্ধে ড. কমর রইস বলেছেন-

"اس کردار کے خدو خال کو ابھرتے ہوئے انھوں نے زندگی کا جو تصور پیش کیا ہے وہ بڑی حد تک خود ان کے تصور حیات کا ترجمان ہے۔یوں تو سورداس بھی "چوگان ہستی" کے دوسرے کھلاڑیوں کی طرح ایک کھلاڑی ہے۔"[৫০]

সুরদাস গ্রামের লোকজনের কথা এতই ভাবতো যে, তার কাছে একটি পতিতজমি ছিল তা সিগারেট কারখানা তৈরি হবে বলে সে জমি বিক্রি করতে চায় না। সে মনে করে যে, গ্রামে এই কারখানা তৈরি হলে গ্রামের লোকজন অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হবে। গ্রামের যুককেরা বিপদগামী হবে, ধর্মের প্রতি আঘাত আসবে, গ্রামে সহজ-সরল মানুষেরা তাদের নৈতিকতা হারাবে। গ্রামের কৃষকরা তাদের কৃষিকাজ ছেড়ে কারখানায় কাজ নেবে। এতে মালিকেরা তাদের উপর অত্যাচার করবে। কৃষকদের মা, বোন ও কন্যাদের কোন নিরাপত্তা থাকবে না। এছাড়াও কৃষকরা তাদের কৃষিজমি হারাবে। এই সব কথা চিন্তা করে সে কোনওভাবে তার জমি সিগারেট কোম্পানিকে দিতে চায়নি। এ প্রসঙ্গে প্রেমচাঁদের ভাষায় সুরদাস বলে-

"محلہ کی رونق ضرور بڑھے گی۔ روزگاری لوگوں کو فائدہ بھی خوب ہوگا لیکن جہاں یہ رونق ہوگی وہاں تاڑی شراب کا بھی نویر چار بڑھ جائے گا۔ کسبیاں بھی تو آکر بس جائیں گی۔ دیہات کے کسان اپنا کام چھوڑ کر مجوری کے لالچ دوڑیں گے۔ یہاں بڑی بڑی باتیں سیکھیں گے۔۔۔ دیہاتیوں کی بیٹیاں بھی مزدوری کرنے آئیں گی اور یہاں پیسے کے بوبھ میں اپنا دھرم بگاڑیں گی۔"[৫১]

সুরদাস গ্রামবাসীর কথা চিন্তা করে তার জমি দিতে রাজি না হলে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তার জমি ক্রয় করে নেয় এবং নাম মাত্র মূল্যে কৃষকদের জমি কিনে নিয়ে সেখানে সিগারেট কারখানা গড়ে তোলে এবং শ্রমিক কলোনিও নির্মাণ করে।

সুরদাস কারখানা তৈরি হলে যা যা ঘটবে মনে করেছিল তাই হয়েছিল। কারখানার শ্রমিকদের অশোভন আচরণ, মদ্যপান, জুয়ার আড্ডা, পতিতালয় ইত্যাদি পাণ্ডেপুর গ্রামের পরিবেশকে অভিশপ্ত করে তুলেছিল। এ উপন্যাসে প্রেমচাঁদ শোষকশ্রেণীর কাছে গরিব ও অসহায় কৃষকরা যে কতোটা জিম্মি তা সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন।

এ উপন্যাসে দেখানো হয়েছে যে, শোষকশ্রেণি শুধুমাত্র প্রজাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে না তাদের কাছ থেকে উৎকোচও গ্রহণ করে। তাদের অত্যাচারে অনেক কৃষক তাদের পৈত্রিক পেশা ত্যাগ করে কারখানায় কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। লেখক এ উপন্যাসে তৎকালীন ভারতের অর্থনৈতিক চিত্র সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। এ উপন্যাসে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে প্রেমচাঁদ তখনকার যৌথ ব্যবসার ম্যানেজিং এজেন্সির লোভী ও অসাধু চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন। এ উপন্যাসে পুঁজিবাদী হিসেবে জনসেবক ও তার পুত্র প্রভুসেবককে দেখানো হয়েছে। জনসেবকের প্ররোচনায় সুরদাসের জমি কেড়ে নেওয়া হয়। সুরদাস অনেক প্রতিবাদ করলেও তাতে কোন ফল আসে না। অবশেষে জনসেবক সমস্ত গ্রামবাসীকে উৎখাত করে সিগারেট কারখানা তৈরি করে। সুরদাসের উপর সরকারের নির্দেশ বাস্তবায়নের ফলে সে আস্তে আস্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সে মৃত্যুবরণ করার সময় তার প্রতিবাদী ভাষা প্রেমচাঁদ এভাবে তুলে ধরেছেন-

"ہم ہارے تو کیا میدان سے بھاگے تو نہیں۔ ارے روے تو نہیں۔ دھاندی تو نہیں کی۔ پھر کھیلیں گے۔ جو ادم تو لے لینے دو ہار ہار کر تمہیں سے کھیلنا سکیں گے۔ اور ایک نہ ایک دن ہماری جیت ہوگی۔ ضرور ہوگی۔"[৫২]

সুরদাসের পরে এই উপন্যাসে যে চরিত্র দুটি সফলতা অর্জন করেছে তারা হলো বিনয় ও সুফিয়া। এই উপন্যাসে বিনয়কে শিক্ষিত যুবক শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বিনয় একজন মানবদরদী ও জনসেবক ছিল। সে একটি রাজ্যের স্বয়ং উত্তরাধিকারী ছিল। জনগণের কথা চিন্তা করে সে উদয়পুর গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক দল নিয়ে আগমন করে । কিন্তু বিনয়ের আগমনে রাজা ও

রাজকর্মচারীদের মনে আশঙ্কা জাগে। তারা মনে করে যে জমিদারদের মধ্যে বিদ্রোহ শুরু হবে। বিনয় প্রজাদেরকে ভালোবাসত, প্রজাদের বিপদে সে নেতৃত্ব দিতে চেয়েছে। সে কারণে তাকে গ্রেফতার হতে হয়। তার গ্রেফতারের পরে এই স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব দেয় জনসেবকের পুত্র প্রভুসেবক। এই প্রভুসেবক বিনয়ের প্রভাবে সেবক দলে যোগ দিয়েছিল। সে মনে করেছিল বিদ্রোহ ও রক্তপাতের মাধ্যমে প্রজাদের অধিকার ছিনিয়ে আনা যায়। ইংরেজ ও দেশীয় রাজাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে তবেই প্রজাদের অধিকার আদায় হবে এ কথা বিনয়, প্রভুসেবক ও সুরদাস প্রমাণ করে গেছে।

এই উপন্যাসে রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে জনসেবকের চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আবার ডাঃ গাঙ্গুলীকে ভারতীয় রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তারা দুই জনেই ইংরেজদের পক্ষপাতী করেছিল। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারে ভারতবাসীর অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। তখন তারা ইংরেজদের পক্ষ ত্যাগ করে। আর ইংরেজদের প্রতিনিধি হিসেবে মি. ক্লার্ককে প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে চিত্রায়িত করেছেন। আবার সুরদাস ও বিনয় চরিত্রটিকেও প্রেমচাঁদ রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছেন। তারা দুইজনেই গান্ধীবাদের অনুসারী ছিলেন। এই উপন্যাসে আরেকটি রাজনৈতিক চরিত্র হলো প্রভুসেবক। সে ব্যবসা ত্যাগ করে সেবক দলে যোগ দিয়ে নিজেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রাখে। উপরোক্ত বর্ণনার নিরিখে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ উপন্যাসে প্রেমচাঁদ তৎকালীন ভারতের রাজনীতির পুর্ণাঙ্গ চিত্র সার্থকতার সহিত তুলে ধরেছেন। উপন্যাসটি মূলতঃ রাজনৈতিক হলেও এখানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফাঁকে বিভিন্ন চরিত্রের তৎকালীন সামাজিক অবস্থার বর্ণনা স্বল্প পরিসরে উপস্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির পাত্র-পাত্রী অর্থাৎ বিনয় ও সুফিয়ার মধ্যে যে প্রেম ও প্রণয় কাহিনি তা তাৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে বেশ গুরুত্বের দাবিদার।[৫৩]

বিনয় ও সুফিয়া দুইজনে প্রণয়ে আবদ্ধ হয়েছিল। বিনয় হলো এক আভিজাত্য হিন্দু পরিবারের সন্তান। অপরদিকে সুফিয়া খ্রিস্টান ধর্মের এক সুন্দরী মেয়ে। সে একবার অগ্নিকাণ্ডের দুর্ঘটনায় পড়লে বিনয় তাকে রক্ষা করে। এভাবেই তারা দুইজনে প্রেমে পড়ে যায়। তবে তাদের প্রেমের মধ্যে কোন কামনা-বাসনা, আনন্দ-উল্লাস ও ভোগ-বিলাস ছিল না। তাদের প্রেম ছিল পবিত্র ও তাত্ত্বিক। তারা একে অপরকে এতই গভীরভাবে ভালোবাসত যে, কোন এক ঘটনাক্রমে প্রভুসেবক সুফিয়াকে প্রেম থেকে বিরত থাকতে বললে প্রেমচাঁদের ভাষায় সুফিয়া বলে-

"اعتقاد میں عزّت اور عشق میں خدمت والے جذبات کی فروانی ہوتی ہے۔ عشق کے لئے مذہبی تضاد کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کرتا۔ ایسی رکاوٹ اس ارادے کے لئے ہے جس کا نتیجہ شادی ہے نہ کہ اس عشق کے لئے جس کا نتیجہ قربانی ہے۔"[৫৪]

তারা একে অপরকে অনেক ভালোবাসলেও বিনয়ের মা সুফিয়াকে কখনও মেনে নিতে চাননি। তাই সে ইংরেজ অফিসার ক্লার্ককে বিবাহ করতে রাজি হয়। বিনয়কে ভুলে থাকার জন্যই সে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তার মনে বিনয়ের জন্য অগাধ ভালোবাসা ছিল। সে কখনও বিনয়কে ভুলতে পারেনা। অবশেষে তার মনে বিনয়ের জন্য প্রেম জেগে উঠে। তাই যখন বিনয় গ্রেফতার হয় তখন তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করার জন্য ক্লার্কের সঙ্গে সুফিয়া প্রেমের অভিনয় করে। প্রেমচাঁদের ভাষায় সুফিয়া ক্লার্ককে বলে-

"خود مجرم ہو کر تمہیں دیگر مجرموں کو سزا دیتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آتی۔"[৫৫]

সুফিয়া অভিনয় করে এবং তার অনেক প্রচেষ্টায় অবশেষে সে বিনয়কে জেল থেকে বের করে। সে বিনয়ের জন্য তার জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি কিন্তু ক্লার্কের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা মনে পড়লে সে তার কাছ থেকে নিজেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

অবশেষে সুফিয়া ও বিনয় দুজনে সকল দ্বিধাবোধ ছেড়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তারা একটি নির্জন গ্রামে নীড় বেঁধেছিল। সুফিয়া তার সাংসারিক জীবনে কর্মব্যস্ত ছিল এবং সে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। এদিকে বিনয়ের যুবক হৃদয়ে দৈহিক কামনা-বাসনা জাগ্রত হয়। প্রথমে এই ঘটনায় সুফিয়া অস্বীকৃতি জানায়; কিন্তু পরক্ষণেই সামাজিক স্বীকৃতি স্বরূপ তা মেনে নেয়। প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে বিনয় চরিত্রটি খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। সে যেমন জাতির খেদমতের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারে তেমনি তার ভালোবাসার জন্যও নিজের জীবন বিলিয়ে দিতে পারে।

প্রেমচাঁদ এ উপন্যাসে কয়েকটি খ্রিস্টান চরিত্র পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় মনোভাব ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি খ্রিস্টান পরিবারকে কেন্দ্র করে প্রেমচাঁদ উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন চরিত্র। এগুলোর মধ্যে ঈশ্বর সেবক, জনসেবক, মিসেস সেবক, প্রভুসেবক ও সুফিয়া সেবক প্রমুখ। এ সকল চরিত্রের বিন্যাসে তৎকালীন ভারতের খ্রিস্টানদের সঙ্গে হিন্দু সম্প্রদায়ের সম্পর্ক, আচার-আচরণ, খ্রিস্টান সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা, আবার হিন্দু সম্পর্কে খ্রিস্টানদের ধারণা ইত্যাদি এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু। শুধু তাই নয় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণও লক্ষণীয়।[৫৬]

উপরোক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের পাশাপাশি প্রেম-ভালোবাসা ও সাম্প্রদায়িকতা খুব সুনিপুনভাবে তুলে ধরেছেন।

بیوہ (বেওয়া) প্রেমচাঁদের একটি অন্যতম সফল উপন্যাস। এই উপন্যাস হিন্দিতে "প্রতিজ্ঞা" নামে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে প্রেমচাঁদের একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হয়েছিল।[৫৭] এটি তৎকালীন সময়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস এবং মানুষের জীবনের একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এই প্রসঙ্গে ড. কমর রইস বলেছেন-

"یہ ناول اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ اس کا پلاٹ اپنے عہد کی زندگی، اس کی صداقتوں اور حقیقتوں کا آئینہ ہے۔ یہ زندگی "جلوۂ ایثار" سے زیادہ کشادہ ہے۔"[৫৮]

প্রেমচাঁদ বেওয়া উপন্যাসে তৎকালীন ভারতের বিধবাদের বিবিধ সমস্যা ও সমাজে তাদের অবস্থানের চিত্র তুলে ধরেছেন। মূলতঃ বেওয়া উপন্যাসটি তিনি স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ব্যক্তিত্বের আবরণে উপন্যাসটিকে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজে বিধবাদের সামাজিক মর্যাদা ও সমস্যাবলীর চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বেওয়া উপন্যাসটি প্রেমচাঁদের স্বল্প পরিসরে লিখিত একটি ছোট্ট উপন্যাস। এ উপন্যাসটি 'জলওয়ায়ে-ঈছার' উপন্যাসের পূর্বে রচিত হয়েছে। উপন্যাসটি ছোট পরিসরে হলেও শৈল্পিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বের দাবিদার।[৫৯] এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ও প্রধান চরিত্র হলো অমৃত রায়। তিনি ছিলেন শিক্ষিত ও বিজ্ঞ আইনজীবী। এছাড়া তার সবচেয়ে বড় পরিচয় হলো তিনি একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি বিবধা বিবাহ প্রচলনের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিলেন। তার স্ত্রী পরলোক গমন করলে তার শ্যালিকা প্রেমাকে তিনি ভালোবাসতে শুরু করেন। প্রেমাও তাকে ভালোবাসতো। কিন্তু অমৃত রায় বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন বলে প্রেমার বাবা লালে বদরী প্রসাদ তাদের বিয়ে দিতে অস্বীকার করে। অমৃতরায়ও প্রেমাকে বিয়ে করতে চায় না। কারণ তিনি জানেন যে তার পক্ষে একজন কুমারি মেয়ে বিয়ে করা অসম্ভব। তাই তিনি নিজের জীবনের কামনা-বাসনা তুচ্ছ করে সমাজ এবং জাতির কল্যানমূলক কাজে নিজেকে সর্বদা নিয়োজিত রাখেন। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ সারমাসত বলেছেন-

"امرت رائے کا کردار "بیوہ" میں زیادہ متاثر کن بن جاتا ہے۔ محبت میں ناکام ہو کر وہ تن من دھن سے قومی کاموں میں لگ جاتا ہے اور اس طرح "بیوہ" میں اعمال کے پیچھے جو محرکات ہوتے ہیں وہی کردار کی وضاحت کرتے ہیں۔"[৬০]

অমৃত রায় শুধু সমাজে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের পথিকৃত ছিলেন না, তিনি মহল্লায় অনাথ আশ্রয় ও বিধবা আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য মহল্লায় মহল্লায় চাঁদা তোলার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। প্রেমচাঁদ বিধবা আশ্রয় কেন্দ্র এবং অনাথ আশ্রয় কেন্দ্র গড়ে তোলেন। বিধবা ও অনাথ আশ্রম গড়ে

তোলার পরে মন্দির গড়ে তোলার চিন্তাভাবনা করেন। এ কারণে এই উপন্যাসে প্রেমচাঁদের ভাষায় অমৃত রায় বলেন-

"اب مجھے یہاں ایک مندر تعمیر کرانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔"[৬১]

সনাতন হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিপক্ষে অবস্থানকারীরা অমৃত রায়ের বিরুদ্ধাচারণ শুরু করে। এই বিধবা বিবাহ প্রচলনের বিপক্ষে কমলাপ্রসাদও ছিল; কিন্তু সে নিজেই তার বাড়িতে পূর্ণা নামে এক বিধবাকে আশ্রয় দেয় এবং তার প্রেমে আশক্ত হয়। তার লোভ-লালসা চরিতার্থ করার জন্য সে এই উপায় বেছে নেয়। পূর্ণা প্রথমদিকে কমলাপ্রসাদকে ভালোবাসত না। তাই সে পূর্ণাকে আত্মহত্যার হুমকি দেয়। এতে ধীরে ধীরে পূর্ণাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। কিন্তু পূর্ণা নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করে এবং সামাজিক মর্যাদা ও সমাজে তাদের প্রকৃত অবস্থার চিত্র তার সামনে এসে যায়। এছাড়া স্বামীর মৃত্যুর পর তার শ্বশুর বাড়িতে তার কোন ঠাঁই হয়নি। এমনকি তার মাথা গোজার ঠাঁইও কোথাও ছিল না। এই উপন্যাসে পূর্ণার চরিত্র সম্বন্ধে ড. কমর রইস বলেছেন-

"پورنا کا کردار ہندو بیوہ کی کسی مپرسی، اس کی بیچارگی اور محرومیوں کی تصویر ہے۔ وہ ایک نچلے متوسط طبقہ کے گھرانے کی معصوم لڑکی ہے۔ خوبصورت، نیک، ہنس مکھ اور ملنسار، گھر گرہستی کے علاوہ اسے دنیا کی راہ روشن سے کوئی سروکار نہیں۔"[৬২]

পূর্ণা তার জীবন নিয়ে ভাবতে থাকে। সে ভাবতে থাকে যে, আমি যদি মরে যেতাম তাহলে আমার স্বামী কী বিয়ে করতো না? এবং তার কামনা-বাসনা ঠিক সে পূরণ করতো। এই উপন্যাসে প্রেমচাঁদ দেখিয়েছেন যে, মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে পূর্ণার স্বামী বসন্তকুমার মারা গিয়েছে আর পূর্ণার বয়সও খুব কম ছিল। এই উপন্যাসে প্রেমচাঁদ বিধবাদের সামাজিকতা ও বাস্তবতার সাথে সাথে বাল্য বিবাহ হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল সেটিও খুব সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. কমর রইস বলেছেন-

"اس ناول کو پریم چند نے اسی حقیقت یا اسی آدرش کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس ناول میں مصنف نے پورنا کے کردار میں بال بیواؤں کی الم نصیبی اور ہندو سماج میں ان کی کسی مپرسی اور بدحالی کی کامیاب مصوری بھی کی ہے۔"[৬৩]

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পূর্ণা যে চিন্তা-ভাবনা করেছিল তা স্থায়ী হয়নি। সে মুহূর্তের মধ্যে বুঝতে পারে যে, কমলাপ্রসাদ একজন চতুর এবং ইন্দ্রিয় ভোগ-বিলাসের জন্য তাকে তার বাড়িতে আশ্রয় দেয়। এই উপন্যাসে কমলাপ্রসাদের পাষণ্ড হৃদয়ে নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই পূর্ণা তার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিকে অমৃতরায় বিধবা ও অনাথদের জন্য আশ্রম

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই বিধবা আশ্রমে পূর্ণার ঠাঁই হয় এবং সেখানে সে পূজা-অর্চনা করে এবং সবকিছু ভুলে থাকার চেষ্টা করে। এই উপন্যাসে এই প্রসঙ্গে প্রেমচাঁদের ভাষায় পূর্ণা বলে-

"میری پوجا کا کوئی وقت نہیں بابو جی۔ جب دل میں درد پیدا ہوتا ہے یہاں چلی آتی ہوں اور بھگوان کے چرنوں میں بیٹھ کر رو لیتی ہوں کچھ نہیں کہہ سکتی بابو جی کہ اس طرح رو لینے سے میری کسی قدر تشفی ہو جاتی ہے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھگوان کرشن خود ہی میرے آنسوں پوچھتے ہیں۔ مجھے اپنے چاروں طرف ایک پاکیزہ خوشبو اور روشنی کا احساس ہونے لگتا ہے۔"[৬৪]

দাননাথ ছিল অমৃতরায়ের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অবশেষে অমৃতরায়ের প্রেমিকা প্রেমার বিয়ে তার বন্ধুর সাথে হয়। এই বিবাহটা প্রেমার ইচ্ছার পরিপন্থি দেওয়া হয়। কিন্তু বিবাহের পর সে একজন আদর্শ নারী ও সনাতন হিন্দু ধর্মের রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য রেখে দাননাথের সাথে সংসারী হতে চায়। পরবর্তীতে অমৃতরায়ের সঙ্গে প্রেমার সম্পর্কের কথা জানতে পেরে দাননাথের মনে সন্দেহের বীজ বোপিত হয়। কিন্তু এক সময় এই সন্দেহের বীজ ভেঙ্গে যায় এবং দুইজনে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে। এদিকে অমৃতরায় তার বন্ধুর সাথে প্রেমার বিয়ে হওয়াতে খুব খুশি হয়। সে মনে করে তার চাইতে তার বন্ধু প্রেমাকে বেশি ভালোবাসে। এ প্রসঙ্গে এই উপন্যাসে প্রেমচাঁদের ভাষায় অমৃতরায় বলেন-

"آج کئی ماہ کی کشمکش کے بعد میں نے اپنے اوپر یہ فتح پائی ہے۔ مجھے پریما سے جتنی محبت ہے۔ اس سے کی گئی محبت میرے ایک دوست کو اس سے ہے۔ اس شریف آدمی نے کبھی بھول کر بھی اپنی مجبت کا اظہار نہیں کیا لیکن میں جانتا ہوں اس کی محبت کتنی جان سوز، کتنی گہری اور کتنی پاکیزہ ہے۔ میں تقدیر کی کتنی چوٹیں سہہ چکا ہوں ایک چوٹ اور بھی سہہ سکتا ہوں۔ لیکن میرے اس دوست نے ابھی ناکامی کی چوٹ بھی نہیں سہی ہے۔"[৬৫]

এই উপন্যাসে আর একজন বিধবা সুমিত্র চরিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। সুমিত্র তার স্বামী কমলাচরণকে ভালোবেসে সংসার করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার ভাগ্যে স্বামীর ভালোবাসা জোটেনি। পূর্ণার বিধবা জীবনের চাইতেও সুমিত্রার বিধবা জীবন আরো কঠিন ছিল। সে স্বামীর বাড়িতে থাকলেও তার কোন সামাজিক মর্যাদা ছিল না। সে নিজেই কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতো। যে আশা করে পুনরায় বিবাহ করেছিল সে আশা তার পূর্ণ হয়নি। হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে তাকে তার জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

غبن (গবন) প্রেমচাঁদের একটি অন্যতম উপন্যাস। ড. কমর রইসের মতে এটি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছিল; কিন্তু মদন গোপাল বলেছেন প্রেমচাঁদ এই উপন্যাস ১৯২৬ অথবা ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে লেখা শুরু করেছিলেন এবং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে লিখা শেষ করেছিলেন। প্রেমচাঁদ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ময়দানে আমল উপন্যাস লিখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।[৬৬] অতএব উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বলা যায় যে, মদন গোপালের মতামতটি সঠিক। অর্থাৎ গবন উপন্যাসটি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গবন মূলত: সমাজ সংস্কারমূলক উপন্যাস। এতে পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যার চিত্র উন্মোচন করা হয়েছে। বিশেষ করে তৎকালীন ভারতীয় সমাজে নারীদের অংলকারের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের স্বর্ণালংকার পরিধানের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে।[৬৭] গবন একটি পারিবারিক ও সামাজিক উপন্যাস। রামরতন ভাটনাগীর এই উপন্যাসকে অশকারের ট্র্যাজেডি বলেছেন। এই উপন্যাসে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের স্বর্ণালংকারের পরিধানের রীতিনীতির প্রচলন রয়েছে।[৬৮]

গবন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো রমানাথ। তাকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাসে বিষয়স্তু প্রস্ফুটিত হয়েছে। সে একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হয়েও তার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা ছিল উচ্চবিত্ত পরিবারের মতো। সে তার অভাব অনটন ও দারিদ্রতাকে গোপন রেখে তার স্ত্রী জালিয়ার নিকট নিজেকে জমিদার হিসেবে পরিচয় দিয়েছিল এবং বলেছিল যে, তার হাজার হাজার টাকা ব্যাংকে আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার কোন অর্থ ও সম্পদ ছিল না। এই উপন্যাসে নায়ক রমানাথের উচ্ছাকাঙ্ক্ষার ও লিপ্সার প্রমাণ পাওয়া যায়। তার স্ত্রী জালিয়া তার কাছে চন্দনহারের দাবি করলে সে ঋণ করে তার স্ত্রীকে চন্দনহার উপহার দেয়। এই উপন্যাসে নারীদের যে অলংকারের প্রতি লোভ-লালসা রয়েছে তা প্রেমচাঁদ খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। রমানাথের যে অর্থ ও সম্পদ নেই তা সে সহজে কাউকে বুঝতে দিতো না। সে ছলচাতুরী করে তার জীবন চালানোর চেষ্টা করতো। সে ঋণ করে স্ত্রীর জন্য অলংকার কিনেছিল তা সম্পূর্ণ তার স্ত্রীর কাছে গোপন রেখেছিল। সে ঋণ থেকে কোন মুক্তির উপায় না পেয়ে কলকাতায় পালিয়ে যায় এবং সেখানে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে। কিন্তু কোন একটি মামলায় মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ায় পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। জালিয়া যখন প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে তখন সে স্বর্ণালংকারগুলো বিক্রি করে দেয় এবং এর অর্থ অফিসে জমা দেয়। জালিয়া ও রমানাথের ভুল বোঝাবুঝির জন্য এ ধরনের ঘটনার উৎপত্তি হয়েছিল। রমানাথ জেল থেকে বের হয়ে কলকাতায় এক নর্তকী জুহরার কাছে আশ্রয় নেয়। জালিয়া রমানাথকে খোঁজার উদ্দেশ্যে কলকাতায় যায় এবং দেবীদীনের মাধ্যমে রমনাথের সাথে দেখা হলে জালিয়ার অবস্থা যা হয় তা প্রেমচাঁদ এভাবে বর্ণনা করেছেন-

"جالپا کی آنکھوں میں کبھی اتنا سرور نہ تھا۔ جسم میں کبھی اتنی چستی نہ تھی۔ رخساروں پر کبھی اتنی چمک نہ تھی سینے میں کبھی اتنا ارتعاش نہ تھا۔ آج اس کی تمنا پوری ہوئی۔"[৬৯]

এই উপন্যাসে রমানাথের জীবনকে ঘিরেই উপন্যাসের প্লট তৈরি হয়েছে। তবে সব চরিত্রের চেয়ে রমানাথের চরিত্র একটু ভিন্ন। এ প্রসঙ্গে ড. কমর রইস বলেছেন-

"رماناتھ ناول کا ہیرو ہے ناول کا پلاٹ اس کی زندگی کے گرد بنا گیا ہے۔ لیکن یہ ہیرو پریم چند کے دوسرے ناولوں مثلاً 'بیوہ' 'جلوۂ ایثار' اور 'پردۂ مجاز' کے ہیرو سے بہت مختلف ہے۔"[৭০]

এই উপন্যাসে আরো একটি উল্লেখ করার মতো চরিত্র হলো দেবীদীন। তিনি বেশি দামে স্বদেশী জিনিস কিনে স্বদেশকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়, স্বদেশী আন্দোলনে তার দুই পুত্র নিহত হলেও তার স্বদেশের প্রতি বিন্দুমাত্র ভালোবাসা কমেনি। এই উপন্যাসে রমানাথ ও দেবীদীনের কথোপকথনের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র ফুটে উঠেছে। তাদের কথোপকথনের এক পর্যায়ে দেবীদীন রমানাথকে উদ্দেশ্য করে বলেন-

"بڑے بڑے دیش بھگتوں کو بلائتی سراب کے بغیر چین نہیں آتا۔ ان کے گھر میں جا کر دیکھو۔ تو ایک بھی دیسی چیز نہ ملے گی۔ دکھانے کو دس بیس کرتے گاڑھے کے بنوا لئے۔۔۔ دعوی یہ ہے کہ ہم دیس کے لئے مرتے ہیں۔ ارے تو کیا دیس کا ادھار کروگے پہلے اپنا ادھار تو کر لو۔"[৭১]

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রেমচাঁদ তৎকালীন ভারতের মধ্যবিত্ত পরিবারের উচ্ছাকাঙ্ক্ষার এক ভয়ানক পরিণতির চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে দেবীদীন ও রমানাথের চরিত্রের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতের রাজনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছেন অত্যন্ত সুনিপুনভাবে।

প্রেমচাঁদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হচ্ছে میدانِ عمل (ময়দানে আমল)। প্রেমচাঁদ এই উপন্যাস ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লিখা শুরু করেন এবং ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে লিখা শেষ করেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সরস্বতী প্রেস থেকে এই উপন্যাস প্রকাশিত হয়।[৭২] কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন এই উপন্যাস ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে লিখা শুরু করেছিলেন এবং ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে লিখা শেষ করেন।[৭৩]

প্রেমচাঁদ সমাজ বাস্তবতার আলোকে ময়দানে আমল উপন্যাসে কৃষকদের অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও দুরাবস্থার কারণে কৃষকদের দুর্দশাগ্রস্থতার চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এ উপন্যাসের জমিদার একজন মহান্ত। জমিদারদের ন্যায় মহান্ত প্রজা নিপীড়নে ছিল অত্যন্ত দক্ষ। অন্যান্য এলাকার তুলনায় তার এলাকার রাজস্ব আয় ছিল অতিরিক্ত। এ কারণে রাজস্ব আয় কমানোর দাবীতে প্রজাদের পক্ষ থেকে

গণআন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় অমরাকান্ত ও আত্মানন্দ। এ আন্দোলনের সহিত যুক্ত হয়েছিল অমরাকান্তের পিতা লালা সমরাকান্ত ও সরকারি চাকরিচ্যুত সেলিম।[৭৪] এই উপন্যাস সম্বন্ধে ড. ইউসুফ সারমাসত বলেছেন-

"اگرچہ گئودان پریم چند کا شاہکار ہے۔ لیکن اس میں پریم چند نے جدوجہد آزادی کو پیش نہیں کیا ہے۔ ان باتوں کے لحاظ سے 'میدان عمل' پریم چند کے بہترین ناولوں میں سے ایک ہے۔"[৭৫]

এই উপন্যাসে কৃষক ও মজদুরদের অধিকার আদায়ের কথা বলা হয়েছে। কৃষকরা তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়না অথচ তাদেরকে অধিক কর বা রাজস্ব দিতে হয় জমিদারদেরকে। এই রাজস্ব কমানোর জন্য প্রজাদের পক্ষ থেকে আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয় এবং দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত এই আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, ইংরেজরা কৃষকদের কথা কখনও ভাবে না। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দিবে। এর ফলে অমরাকান্তকে গ্রেফতার করা হয়। প্রজাদের উপর জুলুম অত্যাচার বাড়তে থাকে। এই উপন্যাস কোন ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, এটি মানুষের অধিকার আদায়ের স্বরূপ কাহিনি। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ সারমাসত বলেছেন-,

"میدان عمل' بھی تاریخ نہیں ہے بلکہ انسانوں کی داستان ہے۔"[৭৬]

এই উপন্যাসে প্রেমচাঁদ ভারতীয় সাধারণ জনতার ও কৃষকদের অর্থনৈতিক সমস্যা শুধু তুলে ধরেননি তার পাশাপাশি রাজনৈতিক অবস্থাও তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে প্রথম থেকেই অমরাকান্ত চরিত্রকে প্রেমচাঁদ গান্ধীবাদের আদর্শ হিসেবে চিত্রায়িত করেছেন। প্রেমচাঁদের উপন্যাসটি মূলত: রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের আন্দোলনও চিহ্নিত হয়েছে এই উপন্যাসে।[৭৭] এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অমরাকান্তের পিতা একজন ব্যবসায়ী। কিন্তু অমরাকান্ত ব্যবসা পছন্দ করতো না। সে মনে করে ব্যবসা করা মানে গরিবদের শোষণ করা। তাই সে দিনে দুই ঘন্টা চরকায় সুতা কাটতো। এ নিয়ে তার পিতার সাথে তার মতবিরোধও দেখা দেয়। তার পিতা মনে করেন অর্থই সব আর অমরকান্ত মনে করে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ হলো আত্মশুদ্ধির উপায়। প্রেমচাঁদ এ উপন্যাসে অমরাকান্তের চরিত্রের মাধ্যমে গান্ধীজীর অহিংসনীতির চিত্র প্রস্ফুটিত করেছেন। তার মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনাবোধ ছিল অসীম। সে কংগ্রেসের নগর কমিটির একজন সদস্য ছিল। সে কৃষক ও জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করতো এবং তা দূরীকরণের প্রচেষ্টা চালাতো । অমরাকান্ত গভীরভাবে সবকিছু সহজেই বুঝতে পারে যে, পরাধীনতাই ভারতবাসীর অবনতির কারণ। আর এই পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গতেই সে প্রতিবাদ করতে থাকে। সে

চিন্তাভাবনা করে এবং যুক্তির মাধ্যমে সমস্যার সমাধানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এই উপন্যাসে প্রেমচাঁদ অমরাকান্তের চরিত্রটি বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন।

প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পাশাপাশি ভারতীয় সামাজিক অবস্থাও নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. ইউসুফ সারমাসত বলেছেন-

"پریم چند ہندوستان کی پوری سیاسی سماجی اور معاشی زندگی کو اس ناول میں جس طرح سمیٹ لیتے ہیں۔ اس کی مثال کسی دوسرے ناول میں نہیں۔"[৭৮]

অমরাকান্তের প্রথম স্ত্রী ছিল সুখদা। সে ছিল অহংকারী, বিলাসি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী। অমরাকান্তের সঙ্গে সুখতার বৈবাহিক জীবন সুখের ছিল না। বিবাহের পর থেকেই সুখদার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে অমরাকান্তের মন ভেঙ্গে যায়। তাদের মধ্যে মিলন অসম্ভব ছিল। সুখদার যদিও অমরাকান্তের সঙ্গে বিবাহ জীবন সুখের ছিল না তবুও সে তার স্বামীর যে কোন আন্দোলনে যুক্ত ছিল। সে একজন প্রতিবাদী নারী ছিল। তার মধ্যে ইংরেজ বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ময়দানে আমল উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে সুখদাকে দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাসে সুখদার চরিত্র সম্বন্ধে ড. কমর রইস বলেছেন-

"سکھدا کا کردار امر کانت سے زیادہ تاہنک ہے۔ وہ بھی عمل کے سانچ میں ڈھل کر نکھرتی ہے۔ اس کا کردار "غبن" کی جالیا سے ملتا جلتا ہے یا پھر اس کا موازنہ نیگور کے مشہور ناول "کمودنی" (۱۹۲۶ء) کی ہیروین کمودنی سے کیا جا سکتا ہے۔"[৭৯]

সুখদা ময়দানে আমল উপন্যাসে সরকার এবং সরকারি কার্যকলাপের নিন্দা করতো। সরকারি কাজে বাধা দেওয়ায় তার উপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। সে সব সময় গরিব কৃষকদের কথা ভাবতো। তাদের ব্যথায় সে ব্যথিত হতো। গরিব কৃষকদের উদ্দেশ্য করে প্রেমচাঁদের ভাষায় এই উপন্যাসের কিছু উদ্ধৃতাংশ তুলে ধরা হলো-

"یکایک جنسوں کا بھاؤ گر گیا اور اس حد تک جا پہنچا جتنا چالیس سال پہلے تھا۔۔۔ جب دو اور تین کی جنس ایک میں بکے تو (کسان) غریب کیا کرے۔ کہاں سے لگان دے کہاں سے دستوریاں دے کہاں سے قرض چکا۔۔۔ اور یہ حالت کچھ اس علاقے کی نہ تھی سارے صوبے، سارے ملک یہاں تک کے ساری دنیا میں یہی کساد بازاری تھی۔"[৮০]

সুখদা গরিব কৃষকদের কথা চিন্তা করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লেও তার স্বামী অমরাকান্তের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক খারাপ ছিল। তার আচরণে অমরাকান্ত অতিষ্ঠ হয়ে সকিনার দিকে আকৃষ্ট হয়। সকিনা হচ্ছে এই উপন্যাসে আরো একটি চরিত্র যেখানে লেখক তাকে মায়াবী,

সুন্দরী ও ইসলাম ধর্মের একজন প্রাণবন্ত নারী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তার সুন্দর আচরণের জন্য অমরাকান্ত সহজেই তার প্রেমে পড়ে যায়। সকিনার চরিত্র সম্বন্ধে ড. কমর রইস বলেছেন-

"سکینہ کے کردار میں پریم چند نے اسی آدرش محبت کی ترجمانی کی ہے۔ جو اس سے قبل منورما اور صوفیا کے کرداروں میں نظر آتی ہے۔ وہ مسلمانوں کے نچلے متوسط گھرانے کی ایک مہذب معصوم اور سیدھی سادی لڑکی ہے۔"[৮১]

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় সকিনা চরিত্রটিকে প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে আদর্শ নারী হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন। সকিনাকে অমরাকান্ত যেমন ভালোবাসত তেমনি সকিনাও তাকে ভালোবাসত। অমরাকান্ত সকিনাকে বিয়ে করবে বলে তার বাবাকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়। সে সকিনাকে বিয়ে করার জন্য ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু তাদের প্রেমের পরিণতি বিবাহ পর্যন্ত গড়ায়নি। সকিনা মনেপ্রাণে অমরাকান্তকে ভালোবাসত, বিনিময়ে সে কিছুই চায়নি। অপরপক্ষে সে অমরাকান্তের সঙ্গে সুখদার মিলনও কামনা করতো। এই উপন্যাসে সকিনার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা প্রমাণিত হয়। অমরাকান্ত সকিনার সঙ্গে ঘর বাঁধতে না পেরে গোপনে গৃহত্যাগ করে পাহাড়ি একটি গ্রামে আশ্রয় নেয়। সেখানে মুন্নি নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়। ঘটনাক্রমে সে মুন্নিকে ভালোবাসতে শুরু করে। মুন্নিও তাকে ভালোবাসে। এদিকে মুন্নি অমরাকান্তকে ভালোবাসলেও তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায় না। কারণ সে একদিন সিপাহী দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিল। তাই সে নিজেকে কলঙ্কিনী মনে করে। সে মনে করে কারো সাথে সে বিয়ে করলে তাকে ঠকানো হবে, তার স্বামীকে সে সুখী করতে পারবে না। মুন্নির প্রেমের মধ্যে বিশুদ্ধতা ছিল। সে নিঃস্বার্থভাবে অমরাকান্তকে ভালোবাসতে এবং তার দাসী হয়ে জীবন কাটাতে চায়। মুন্নির চরিত্র সম্বন্ধে সৈয়দ মুহাম্মদ আজিম বলেছেন-

"منی کا کردار میدان عمل کا سب سے بلند انسانی فطرت سے قریب اور مکمل کردار ہے اس کردار کے ذریعہ پریم چند نے ہندوستانی عورت کی زندگی کے کئے اہم پہلو پیش کئے ہیں۔"[৮২]

প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে অমরাকান্ত সকিনা ও মুন্নিকে ভালোবাসলেও তার স্ত্রী সুখদার সঙ্গে মিল ঘটিয়েছেন। প্রথম থেকেই সুখদা তার স্বামীকে তোষামোদ করতে পছন্দ করতো না। তবে সকিনা এবং মুন্নিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কখনও ভাবেনি। সে মনে করতো তারা পুরুষ শাসিত সমাজের শিকার। মুন্নি ও সকিনার প্রতি তার মমত্ববোধ ছিল। সে কখনও তাদেরকে দোষী মনে করেনি। এক সময় তার স্বামীর প্রতি তার কোন ভালোবাসা ছিল না বলে সে নিজেকে দোষী মনে করে এবং এ কারণে সে অনুতপ্ত হয়।

এই উপন্যাসে সুখদার চরিত্রকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যে, সে স্বামী সংসারের চিন্তা-ভাবনার চেয়ে কৃষক ও মজুদরদের চিন্তা-ভাবনায় মশগুল থাকতো । এ কারণে তার সংসার ভাঙ্গার আশংকা ছিল। প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে সুখদা ও অমরাকান্তকে কৃষক ও শ্রমিকদের সমর্থক হিসেবে তুলে ধরেছেন এবং বৈবাহিক জীবনের মিলন ঘটিয়েছেন।

প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও সাম্প্রদায়িকতার চিত্র চিত্রায়িত করেছেন। এখানে মুসলিম একটি মেয়ে সকিনার প্রেমে আসক্ত হয় সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী অমরাকান্ত। সে সকিনাকে ভালোবেসে মুসলিম ধর্মে দীক্ষিত হতে চেয়েছিল কিন্তু পক্ষান্তরে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার কারণে তাকে ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আরো দুইটি চরিত্র ছিল সেলি ও তার পিতা, যারা ভারতের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলিম শ্রেণি হিসেবে ভূমিকা পালন করে। তারা দুইজনেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এই উপন্যাসে প্রেমচাঁদ যেমন হিন্দুদের মনে মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধবোধ জাগিয়ে তোলেন। তেমনিভাবে মুসলমানদের মনেও হিন্দুদের প্রতি শদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে তৎকালীন ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার চিত্র খুব নিপুনভাবে চিত্রায়িত করেছেন।

প্রেমচাঁদ উর্দু গদ্যসাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি উপন্যাস অঙ্গনে অসামান্য অবদান রেখে উর্দু গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার রচিত উপন্যাসগুলোর মধ্যে কয়েকটি উপন্যাস বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। উপরোক্ত উপন্যাস ছাড়াও তার আরো উপন্যাস রয়েছে। সেগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া হলো। প্রেমচাঁদের অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস اسرار معابد (আসরারে মুয়াবিদ) উর্দু ভাষায় বানারসের উর্দু সাপ্তাহিক "আওয়াজ- এ খলক" পত্রিকায় ১৯০৩-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এলাহাবাদের হংস প্রকাশনা থেকে হিন্দি ভাষায় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে বেবিস্থান-এ রহস্য নামে প্রকাশিত হয়। মোহাত্ম পুরুষদের অপরাধের কাহিনি ও ধর্মের নামে ভণ্ডামির কাহিনি এই উপন্যাসে তিনি তুলে ধরেছেন।[৮৩] ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে "যামানা" পত্রিকায় উর্দু ভাষায় ہم خرما و ہم ثواب (হাম খুরমা ওয়া হাম ছওয়াব) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এই উপন্যাসটি হিন্দি ভাষায় প্রেমা নামে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ইণ্ডিয়ান প্রেস এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের নায়ক এক বিধবা তরুণীকে ভালোবাসার কারণে বড়লোকের সুন্দরী মেয়ের প্রেমকে উপেক্ষা করে।[৮৪] প্রেমচাঁদ বানারসের মেডিক্যাল হ্যালো প্রেস থেকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে উর্দু ভাষায় کشنا

(কিশনা) উপন্যাসটি রচনা করেন। মেয়েরা গহনার প্রতি কতোটা আকৃষ্ট তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।[৮৫] যামানা পত্রিকায় ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে روٹھی رانی (রোঠী রানি) উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। লেখক এই উপন্যাসে একজন রাজপুত রানির স্বামীর প্রতি যে প্রেম-ভালোবাসা তা তুলে ধরেছেন।[৮৬] উর্দু ভাষায় پردۂ مجاز (পরদায়ে মাজায) এবং হিন্দিভাষায় কায়াকল্প নামে উপন্যাসটি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রেমচাঁদ রচনা করেন। উপন্যাসে হিন্দু-মুসলমান আগ্রা শহরে কিভাবে দাঙ্গায় লিপ্ত হয়েছিল তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।[৮৭] نرملا (নির্মলা) উপন্যাসটি হিন্দিভাষায় ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে এবং উর্দুভাষায় ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাল্যবিবাহ ও এর ক্ষতিকর পরিণতির বর্ণনা উপন্যাসটিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে করা হয়েছে।[৮৮] প্রেমচাঁদের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস گئودان (গোদান) ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে উর্দুভাষায় রচনা করেন এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ভারতবর্ষের কৃষকদের ঋণ সমস্যা এবং সমাজের শোষিত ও সম্মানহীন নারীর জীবনচিত্রের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।[৮৯] منگل سوتر (মঙ্গল সূত্র) প্রেমচাঁদের সর্বশেষ উপন্যাস। তার মৃত্যুর পর ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।[৯০] প্রেমচাঁদের গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

কৃষণচন্দ্রঃ প্রগতিশীল আন্দোলনের সময় উর্দু সাহিত্যে যে সকল ছোটগল্পকারের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে কৃষণচন্দ্র সম্ভবত সর্বাধিক বিখ্যাত ছিলেন। প্রেমচাঁদ এর পরে উর্দু সাহিত্যে সফল ঔপন্যাসিক হলেন কৃষণচন্দ্র। কৃষণচন্দ্র ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে নভেম্বর তৎকালীন অবিভক্ত ভারতবর্ষের পশ্চিম পাঞ্জাবের গোজরাওয়ালা জেলার ওয়াজিরাবাদ নামক একটি ছোট্ট শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।[৯১] তার পুরো নাম কৃষণচন্দ্র শর্মা। জন্মসূত্রে তিনি কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। তার পিতার নাম গোরীশংকর চোপড়া। তার পিতা একজন চিকিৎসক।[৯২] তার মায়ের নাম ছিল পরমেশ্বরী দেবী এবং তার মা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু।[৯৩] কৃষণচন্দ্র লেখাপড়া করেন পুঞ্জো মাধ্যমিক স্কুলে। পুঞ্জ হাইস্কুল পাঠ শেষ করে তিনি লাহোরে ফার্মন খ্রিস্টান কলেজে ভর্তি হন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম এ এবং এল এল বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই মহান সাহিত্যিক ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মার্চ মুম্বাইতে নিজের ঘরে লেখার টেবিলে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[৯৪] শৈশব থেকেই নাটক ও যাত্রাপালার প্রতি তার প্রবল অনুরাগ ছিল। শৈশব থেকে সাহিত্যের প্রতি তার আগ্রহ গড়ে ওঠে। তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন। তিনি ৫০টিরও বেশি উপন্যাস লিখেছেন।[৯৫] প্রথমে তার উপন্যাসগুলো ছিল আধ্যাত্মিক। পরে তার উপন্যাসের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রোমান্টিক দিকগুলো ফুঁটে উঠেছে। কৃষণচন্দ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মিরের

জলবায়ুতে বড় হয়েছেন। তার গল্প ও উপন্যাসে অনেক রোমান্টিকতা পাওয়া যায়। কৃষণচন্দ্র কেবল ভারতে বিখ্যাত এবং সুপরিচিত নয়, অন্যান্য দেশের লোকেরা তার উপন্যাস পড়েছেন এবং পছন্দ করেছেন। তার নির্বাচিত উপন্যাসগুলো ইংরেজি, রুশ, ডাচ, জ্যাক, রোমানিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান, কোরিয়ান এবং জাপানি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। কৃষণচন্দ্রকে কেবল ভারতে নয় গোটা এশিয়া জুড়ে একজন মহান লেখক হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং এটি গর্বের বিষয় যে তিনি উর্দু ঔপন্যাসিক এবং শক্তিমান লেখক ছিলেন। তার প্রথম উপন্যাস شکست (শিকাস্ত) যা তিনি কাশ্মিরে অবস্থানকালে মাত্র ২১ দিনে লিখেছিলেন তা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল।[৯৬]

কৃষণচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস ‘শিকাস্ত’ ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে হাভানায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৯৭] সমালোচকরা কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও ‘শিকাস্ত’ এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। বিখ্যাত সমালোচক ওকার আজীম এই উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন-

"شکست نئے دور کے انتشار میں ایک نئی اور دلکش دنیا کی تلاش و جستجو کا ترجمان ہے۔"[৯৮]

এই উপন্যাস সম্বন্ধে মোহাম্মদ আহসান ফারুকী বলেছেন-

"کرشن چندر کا ناول نگاری کے سلسلہ میں کارنامہ "شکست" ہے ۔"[৯৯]

আজীজ আহমেদ ‘শিকাস্ত’ উপন্যাসকে উর্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন-

"غالباً وہ (شکست) اردو کا بہترین ناول ہے"[১০০]

লেখক এ উপন্যাসে আমাদের সমাজে যে ভূমিকা রয়েছে তার সাধারণ বিষয়গুলো খুবই সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘শিকাস্ত’ উপন্যাসটি সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসের মধ্যে একটি। উর্দু সাহিত্যে এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে আজীজ আহমেদ বলেছেন-

"کم سے کم ایک اردو ناول ترقی پسند تحریک نے ایسا پیدا کیا جو اردو زبان کے بہترین ناولوں میں شمار کئے جانے کا مستحق ہے یہ ناول کرشن چندر کا 'شکست' ہے۔"[১০১]

এ উপন্যাসের দুইরকম কাহিনি রয়েছে। এ উপন্যাসের নায়ক হচ্ছে সিয়াম এবং নায়িকা বিন্তি। তারা একে অপরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। এই উপন্যাসে সিয়াম এবং বিন্তি ভালোবাসার প্রতিজ্ঞা স্বরূপ একে অপরকে কৃষণচন্দ্রের ভাষায় বলে-

"جب تک زندہ ہوں۔ تمہارا ساتھ کبھی نہ چھوڑونگا۔"[১০২]

সিয়ামের অনুমতি ছাড়া বিয়ে ঠিক হয়ে যায়, এদিকে বিন্তিরও এক সাধারণ ছেলে দুর্গাদাসের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু সিয়ামের বিয়ের কথা শুনে নায়িকার খুব কষ্ট লাগে। এই কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সে নিজের প্রাণ দিয়ে দেয়। অপরদিকে এই উপন্যাসে চন্দ্রা ও মোহন সিং এর ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে। মোহন সিং হচ্ছে রাজকুমার। চন্দ্রা জানে যে তার গ্রামবাসী এবং তার মা কখনোই তাদের ভালোবাসা মেনে নেবে না। কিন্তু সে এমন একটি মেয়ে যে গ্রামবাসীর কাছে মাথা নত করার নয়, সদা সত্যের পথে বলিয়ান এবং তার মায়ের কথাও শোনার মেয়ে নয় এবং সমাজকেও সে কিছু মনে করে না। চন্দ্রার চরিত্র এই উপন্যাসে একটি শক্তিশালী চরিত্র। এই উপন্যাসে তার চরিত্র সম্বন্ধে সালহা জারিন বলেছেন-

"ناول میں چندراکا کردار سماجی حقیقت نگاری کی عکاسی کرنے میں ایک مضبوط کردار ہے وہ ایک باہمت اور صحت مند ذہن رکھنے والی عورت ہے۔ اور اکیلی سماج سے فکر لینے اور لڑنے کو تیار ہے۔ اس کے اندر خوداعتمادی اس کا سب سے بڑا جوہر ہے۔"[১০৩]

কিন্তু নায়কের প্রতি সন্দেহ হলে সে নায়ককে বলে তোমার জন্য আমি সবকিছু করতে পারি; কিন্তু তুমি মনে রেখো! তুমি যদি মিথ্যা প্রমাণিত হও তাহলে আমি এমন এক মেয়ে যে তোমাকে আমি নিজের হাতে গলা টিপে মেরে ফেলবো। এই কথা শুনে নায়ক বলে তোমার মা যদি রাজি না থাকে তবে তুমি কি করবে? চন্দ্রা বলে, আমি আমার মায়ের দিকটি দেখে নেব এবং পণ্ডিতের ব্যাপারটিও দেখব। এদিকে চন্দ্রাকে পণ্ডিত কিশন অপমান করে। আর এই অপমানের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মোহন সিং কিশনের ওপর আক্রমণ করে এতে সে হাসপাতালে ভর্তি হয়। হাসপাতালে মোহন সিংকে দেখতে গেলে চন্দ্রাকে কেউ ঢুকতে দেয় না। তারপরও চন্দ্রা বসে থাকার মেয়ে নয়। সে অনেক চেষ্টা করে নায়কের খোঁজ খবর নিতো। চন্দ্রা অবশেষে হাসপাতালে মোহন সিংকে দেখাশোনার দায়িত্ব পেল। সে মোহন সিংকে ভালো করে তোলার জন্য সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকতো । এমন সময় সিয়াম মোহন সিংকে দেখতে গিয়ে কৃষণচন্দ্রের ভাষায় মোহন সিংকে বলে-

"تمہیں فکر کی کیا ضرورت ہے، جس مرد کو چندرا جیسی نڈر، بہادر، اور بے خوف بیوی مل جائے، اسے زندگی کی الجھنوں سے کیا ڈر۔"[১০৪]

নায়ক হাসপাতালে মারা যায়, একথা শুনে নায়িকা চন্দ্রা পাগল হয়ে যায়। এই উপন্যাসে সমাজের কঠোরতা, নিষ্ঠুরতার কারণে দুই জোড়া প্রেমিক প্রেমিকার ভালোবাসা সফল হয়নি। এই উপন্যাসে

শুধু প্রেমের কথাই তুলে ধরা হয়নি। একটি নিম্নবর্ণের কথাও বলা হয়েছে, যা মানবেতর সভ্যতার অংশ। এ উপন্যাসটিতে চন্দ্রা এবং বিন্তির সাথে যা ঘটেছিল তা কেবল একটি সভ্যতার কারণে ঘটে। সমাজে ছোট জাতের কোন পুরুষ বা নারী কোন মহান বর্ণের পুরুষ বা নারীর সাথে প্রেম করতে পারে না। সমাজে সম্প্রদায়ের নামে ভারতে নারীদের যেভাবে শোষণ করা হয়েছে, তা এই উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে সমাজের খারাপ দিক যেমনভাবে দেখানো হয়েছে, তেমনিভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। এখানে কাশ্মিরের দৃশ্যাবলী খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এই উপন্যাসের দৃশ্যাবলীর মুল্যায়ন করতে গিয়ে সাহিল বুখারি লিখেছেন-

"اونچی اونچی پہاڑی چوٹیاں، گہری گہری وادیاں ابشار، مرغزار، چشمے، پگڈنڈیاں، گلیشیر، ندیاں، جھلیں سب کے سب منہ بولتی تصویریں بن گئی ہیں۔ان کی کامیاب مصورّی نے "شکست" کے رومان کو جھلکانے اور چمکانے میں بڑی مدد دی ہے اور پورے قصّے میں نغمے کا سا کیف اور رس بھر دیا ہے۔"[১০৫]

এই উপন্যাস থেকে জানা যায় যে, কৃষণচন্দ্রের প্রারম্ভিক যে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা থেকে একটি সুন্দর বিষয় তৈরি হয়েছে। তিনি এতে দেখাতে চেয়েছেন যে, অন্যায় আদেশ কখনো মানা যায় না।

উপন্যাসে কৃষণচন্দ্র চরিত্রগুলোকে খুব রোমান্টিক পরিবেশে সাজিয়েছেন। এই উপন্যাসটি পড়লে বোঝা যায় যে চরিত্রগুলো বাস্তব ও জীবন্ত। এই উপন্যাস থেকে জানা যায় যে এটি একটি রোমান্টিক উপন্যাস। কিন্তু এই রোমান্টিকতা সমাজ এবং সাম্প্রদায়িকতার কারণে সফলতা পায়নি। এই প্রসঙ্গে খলিলুর রহমান আজমী বলেছেন-

"کرشن چندر اس ناول میں بھی رومانیت ہی کے راستے آئے ہیں۔اس کا ہیرو شیام سرتاپا شاعرانہ مزاج رکھتا ہے اور اس کی زندگی کا سب سے اہم مسئلہ موجودہ معاشی اور طبقاتی نظام میں محبت کی ناکامی کا مسئلہ ہے۔"[১০৬]

এই উপন্যাসকে শৈল্পিক দৃষ্টি থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাস সম্বন্ধে ওকার আজীম এর উদ্ধৃতি দিয়ে ড. আসলাম আজাদ লিখেছেন-

"شکست"، "گودان" کی طرح زندگی سے بھرپور نہیں لیکن وہ ایک ایسی چھوٹی سی دنیا ہے جو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے صرف اپنا بنا لیتی ہے۔اور ہم اس میں کھو جاتے ہیں فن کے نزدیک یہی ایک ایسی چیز ہے جو "شکست" کو ممتاز بنا دیتی ہے"[১০৭]

‘শিকাস্ত’ এর পরে কৃষণচন্দ্রের আরেকটি বিদ্রোহের উপন্যাস *جب کھیت جاگے* (জব খেত জাগে) উর্দু গদ্য সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এই উপন্যাস ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে শুধু তিনি প্রেম-ভালোবাসা দেখাননি রবং বিদ্রোহও দেখিয়েছেন এবং সে সময়ের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে লিখেছেন। এ উপন্যাস সম্পর্কে সাহিল বুখারি লিখেছেন-

"یہ ناول مصنف کے استعمالی رجحانات کا مکمل طور پر آئینہ دار ہے اور مصنف کا بہترین ناول ہے۔"[১০৮]

এই উপন্যাসে জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিদ্রোহের চিত্র খুব সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। শুধু তেলেঙ্গানা গ্রামের চিত্রই নয় এটি একটি বাস্তবধর্মী উপন্যাস। এর সারাংশ হচ্ছে তেলেঙ্গানা গ্রামের কৃষকরা জমিদারি প্রথা শেষ করতে চেয়েছিল; কিন্তু কৃষকদের এই বিদ্রোহ শেষ করতে কংগ্রেসও যোগ দিয়েছিল এবং কৃষকদের উপর জুলুম ও অত্যাচার চলিয়েছিল। আজকের সময়েও মজলুম যখন জালিমদের অত্যাচারে আওয়াজ তোলে তখন তাদেরকে যেভাবে হোক দাবিয়ে রাখা হয়। কিন্তু মানুষের কল্পনা ও আবেগকে শেষ করা অসম্ভব। কিছু সময়ের জন্য তারা হয়তো থেমে থাকে; কিন্তু পরে এমন শক্তি সঞ্চয় হয় যে বড় বড় শক্তিও তাদের সামনে ছোট হয়ে যায়। এ উপন্যাসে জগন্নাথ রেডি ও প্রতাব রেডিকে জমিদার হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে এবং এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রাঘুরাও যে কৃষকদের প্রধান হয়ে জমিদারদের সাথে বিদ্রোহ করে। এজন্য তাকে জেলখানায়ও যেতে হয়। আর সেখান থেকে এই উপন্যাসের কাহিনি শুরু হয়।

এই উপন্যাসের মাধ্যমে কৃষণচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন যে মানুষ ভাগ্যের গোলাম নয় রবং ভাগ্য মানবের সৃষ্টি। এতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষ পরিশ্রমের মাধ্যমে ভাগ্যকে বদলাতে পারে। এই উপন্যাসে কৃষণচন্দ্র নায়ক রাঘুর চরিত্রকে একটু ভিন্নভাবে দেখিয়েছেন। ছোটবেলা থেকে সে জমিদারদেরকে দেখতে পারতো না, তাদের প্রতি তার ঘৃণা ছিল। তার ঘৃণা আজকালের ঘৃণা নয়, বহু বছরের ঘৃণা। কারণ তার বাবার জমি ছিল, হাল চাষ করার গরু ছিল, তার কাছে সবকিছু ছিল; কিন্তু আলিশান বাড়ির জমিদার সবকিছু নিয়ে নিয়েছে। তাকে মানুষ থেকে জানোয়ার বানিয়েছে। জমিদার উঁচু বাড়ি তার বংশের দুশমন। তার বাবা তাকে এই ঘৃণা তার ওপর অর্পণ করেছে। রাঘুরাও গ্রাম ছেড়ে শহরে সুরিয়া পিট আসে। শহরে এসে ছোট্ট একটি চাকরি করে যা থেকে সে জীবিকা নির্বাহ করে। এভাবে কখনো কারো বাড়িতে কাজ করে কখনো বা ফুল বিক্রি করে। তারপর একদিন সুরিয়া পিট থেকে হায়দ্রাবাদ আসে। সেখানে সে রিকশা চালায় এবং সে মকবুল নামে এক ব্যক্তির সাথে পরিচিত হয়। সেখান থেকে তার বিদ্রোহ শুরু হয়। মকবুলের কাছে লেখাপড়া শিখে সে কাগজের মিলে চাকরি পায়। এই উপন্যাসের লেখক বোঝাতে চেয়েছেন গ্রামের জমিদার আর শহরের ধনাঢ্য বা মালদার লোকেরা একই জাতের। এদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। মিলের চাকরি করা অবস্থায় সে হরতালের ডাক দেয় এতে করে তাকে জেলে যেতে হয়। সেখানে গিয়ে তার গ্রামের নাগেশ্বর এর সঙ্গে দেখা হয়। তার মাধ্যমে সে জানতে পারে গ্রামের কৃষকরা আর বসে থাকে না তারা তাদের অধিকারের জন্য লড়াই করতে শিখেছে। জমিগুলো কৃষকদের আয়ত্বে চলে আসে এবং জমিদাররা

গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে থাকে। রাঘুরাও জেল থেকে ফিরে এসে কৃষকদের নিয়ে জমিগুলো ঠিকঠাক করার কাজ শুরু করে এবং যার জমি তাকে ফেরত দেওয়া হয়। কৃষকরা খুশি হয়ে যায়; কিন্তু তাদের খুশি বেশিক্ষণ থাকে না। কংগ্রেসের আদেশে আবার জুলুম অত্যাচার শুরু হয় এবং রাঘুরাওকে গ্রেপ্তার করে আবার জেলখানায় দেওয়া হয় এবং তার ফাঁসির সাজা হয়। কৃষকদের বিদ্রোহ বিনা কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়; কিন্তু তাদের মনে বিদ্রোহের যে আগুন জ্বলে তা পরবর্তীতে বিপ্লবের আকার ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে ডাক্তার সৈয়দ মোহাম্মদ আকিল এর উদ্ধৃতি দিয়ে ড. হায়াত ইফতেখার এম. এ যথার্থ বলেছেন-

"راگھاؤ کی پھانسی ہندوستان کے اس نئے کسان کو پھانسی دینے کی کوشش ہے جو آج نئی امنگوں کے ساتھ اندھرا اور تلنگانہ بلکہ پورے ہندوستان میں بیدار ہو رہا ہے۔"[১০৯]

এই উপন্যাসে কৃষণচন্দ্র বৈপ্লবিক চিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। লেখক এখানে তেলেঙ্গানা গ্রামের দৃশ্যাবলী, সমাজ, কৃষক এবং মজদুর এসব বিষয় এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন তিনি নিজ চোখে সেগুলো অবলোকন করেছেন; কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে তার মনের খেয়ালে এগুলো লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে খলিলুর রহমান আজমী বলেছেন-

"اس ناول میں کرشن چندر نے سب سے بڑی ٹھوکر یہ کھائی کہ تلنگانہ کی جن کسانوں کی زندگی انھوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اسے انھوں نے دور سے بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی ہے تخیل کی مدد سے انھوں نے جو پلاٹ بنایا اس میں بنیادی طور پر کئی ایسی خامیاں ہیں کہ یہ تلنگانہ خود کرشن چندر کی ایک خیالی دنیا معلوم ہونے لگتا ہے۔"[১১০]

কৃষণচন্দ্রের বিখ্যাত তৃতীয় উপন্যাস হলো طوفان کی کلیاں (তুফান কি কালিয়া)। এই উপন্যাস ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।[১১১] এই উপন্যাস সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেছেন-

"ایک عرصے سے میں ناولوں کا ایک سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جو کشمیر سے متعلق ہوں جس میں اس کی ساری زندگی اور ساری روح اور سارا فطر کھینچ کر آجائے اس کے لیے مجھے چار پانچ ناولوں کا ایک سلسلہ لکھنا پڑے گا جس کے کردار انفرادی ہوں، ان کی حرکت، ارتقا، اغطراب، سوچنے سمجھنے کا طریقہ بھی انفرادی معلوم ہو لیکن اس کے باوجود وہ ایک اپنے سے بڑی تصویر کا حصہ ہوں اور اس کے تاریخی مقام کو متعین کرتا ہوں "طوفان کی کلیاں" اس سلسلے کا پہلا قدم ہے۔"[১১২]

এটি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। উর্দুতে এ ধরনের উপন্যাস খুব কম আছে; কিন্তু কৃষণচন্দ্র ইতিহাসকে মাথায় রেখে এই উপন্যাস রচনা করেছেন। এতে সামাজিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। কৃষণচন্দ্র এ উপন্যাসে কাশ্মিরের ডুগরি শাহির আদেশে গরিব কৃষকদের কিভাবে অত্যাচার এবং তার বিরুদ্ধে কৃষকদের লড়াই এবং এই লড়াই শেষ করার জন্য তার কি ধরনের আদেশ সে সম্বন্ধে

আলোকপাত করেছেন। এর সারাংশে বলা হয়েছে, কৃষক যখন তার ফসল কাটতে যায় তখন জুলুমকারীরা বলে যে, এর এক অংশ আমার। কারণ জমি আমার। দ্বিতীয় অংশ সরকারের, তৃতীয় অংশ বীজ প্রদানকারীর, চতুর্থ অংশ ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানকারীর।[১১৩] অর্থাৎ কষ্ট করে ফসল ফলানোর পরে তাদের ভাগ্যে আর কিছুই থাকেনা যা থাকে তা হলো শুধু কষ্ট। এটাই তারা তাদের ভাগ্য মনে করে আসছে বছরের পর বছর যা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তুফান কি কালিয়া উপন্যাসের লেখক বলেছেন-

"ہزار سال سے یہی ہوتا چلا آرہا ہے کہ آدمی محنت کرتا ہے اور حاکم اس کی محنت کھاتے ہیں جیسے ٹڈی فصل کو اور امر بیل درخت کو کھا جاتی ہے ٹڈی کو فصل کھانے سے کام ہے اسے کیا معلوم کہ فصل کس طرح اگتی ہے مکتی کا ایک دانہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔"[১১৪]

এই উপন্যাসে জমিদারের অনেক খারাপ চেহারা দেখানো হয়েছে। যেখানে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য গরিব কৃষকদের ওপর জুলুম ও অত্যাচার করে। গরিব কৃষক ও মজদুরদের সামান্য ভুলের জন্য এমন সাজা দেয় যাতে মানুষের মন কাঁপতে থাকে। ডুগরি শাহি শুধু একাই এ কাজ করে না তার পেছনে অনেক বড় বড় লোকের হাত রয়েছে। এ কারণে সে অনেক বড় হয়েছে আগে সে শুধু একজন লবণ বিক্রেতা ছিল। এ উপন্যাসে লেখক কৃষকদের সরলতা ও দুর্বলতা সম্বন্ধে বলেছেন যে, তাদের মনোবল এত কম যে তারা যেকোন ছলচাতুরীর শিকার হয়। কারণ তারা শিক্ষিত নয়, তাদের কাছে আবেগ আছে, তারা পরিশ্রমী, তাদের কাছে মা বাবার দো'আ আছে। তারা গান ও কবিতা বলতে পারে। সর্বোপরি তাদের কাছে তাদের কান্না রয়েছে। অর্থাৎ গরিব কৃষকরা কখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তারা যখন মাথা তুলতে চায় তখন জমিদারদের চালাকি জুলুম-অত্যাচার এবং লাঠিয়াল বাহিনীর কাছে তারা মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়।

কৃষণচন্দ্রের চতুর্থ উপন্যাস হচ্ছে غدّار (গাদ্দার)। এই উপন্যাস ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এর মূল বিষয়বস্তু সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারতভাগ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় সংঘটিত দাঙ্গা।[১১৫] ভারত বিভাগ বিষয়ক তার রচিত এই উপন্যাস প্রসঙ্গে হায়াত ইফতেখার এম. এ. বলেছেন-

"کرشن چندر نے اس موضوع کے متعلق ایک ناول بھی لکھا جو "غدّار" کے نام سے مشہور ہے جس میں انھوں نے خالص انسانی نقطۂ نظر سے ۱۹۴۷ء میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کا جائزہ لیا ہے۔"[১১৬]

এই উপন্যাসের প্রথমে লেখক মুসলমান, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীদের বসবাসের সংখ্যা এভাবে তুলে ধরেছেন-

"دو اگست ۱۹۸۴ء کو میں اپنے ننہال میں تھا۔ میرا ننہال لالے گاؤں میں ہے۔ لالہ گاؤں قلعہ سوتھا سنگھ اسٹیشن کے قریب ہے۔ اسٹیشن سے کوئی پون میل سوا میل فاصلہ ہو گا۔ لالے گاؤں میں ہم براہمنوں کی آبادی زیادہ ہے۔ اس کے بعد کھتریوں کے گھر ہیں۔ سب سے کم آبادی مسلمانوں کی ہے۔"[১১৭]

এই উপন্যাসটির মূল ধারণাটিও বিভক্তিগত এবং স্থানান্তরগত। যেখানে ভারতে মুসলমানদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছিল, সেখানে পাকিস্তানে হিন্দু ও শিখদের পক্ষে মানুষের হৃদয়ে কোন স্থানই রইল না। শত শত বছর ধরে একত্রে বসবাসকারী হিন্দু মুসলিম উভয় জাতির মধ্যে ঘৃণার বীজ বোপন করা হয়। উপন্যাসের মূল চরিত্রটির নাম দেওয়া হয়েছিল বিজয়নাথ। সে বিবাহিত ছিল এবং তার সন্তান-সন্তাদি থাকা সত্ত্বেও সে এক মুসলিম মেয়ে শাদানের প্রেমে পড়ে। তবে দেশ ভাগের সময় তাদের সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটে। দেশ ভাগের সময় শাদান বিজয়নাথকে স্টেশন অবদি পৌঁছে দেয় এবং সেখান থেকে তার ভূমিকা শেষ হয়ে যায়। লাহোরে তার কিছু মুসলমান বন্ধু ছিল, সমস্যায় পড়লে তারাও তাকে ছেড়ে চলে যায়। মুসলমানরা তাদের শিক্ষাগুলো ভুলে গিয়েছিল। তারা হিন্দু এবং শিখদের হৃদয় রক্তপাত করেছিল। মুসলমানরা শুধু এই রক্ত পাতের সূত্রপাত করেছিল তা নয়। উভয় পক্ষের গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল। আমরা সর্বদা পাকিস্তান ও মুসলমানদের ওপর নৃশংসতার গল্প শুনেছি এবং পড়েছি, তবে কৃষণচন্দ্র এই উপন্যাসে ভারত বিভাগের সময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে সংখ্যালঘুদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ ও সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা চমৎকারভাবে চিত্রায়িত করেছেন।

উপন্যাসটিতে আরো একটি চরিত্র ছিল পার্বতী। সে তার ভালোবাসা এবং স্নেহের জন্য পাকিস্তান যাচ্ছিল, সেখানে গিয়ে দেখল তার ভালোবাসার মানুষটি আর নেই বিধায় তাকে ইমতিয়াজের মায়ের সাথে বিধবা হিসেবে থাকতে হয়েছিল এবং যা আশা ছিল তা মোমবাতির আলোর মতো নিভে গেল। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিজয়নাথের প্রেমিকা যে দেশ ভাগের সময় আলাদা হয়ে গিয়েছিল তাতে সে খুব কষ্ট পেয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজয়নাথের সাথে ছিল এক কুকুর যে তাকে অনেক বিপদের সময়ও সঙ্গ দিয়েছিল, হাজার বিপদেও তাকে ছেড়ে চলে যায়নি। বিজয়নাথ এই উপন্যাসে কুকুরকে উদ্দেশ্য করে কৃষণচন্দ্রের ভাষায় বলে -

تو کتیا ہے تجھے کوئی ڈر نہیں۔۔۔ تو انسان تھوڑی ہے کہ تجھے اپنی جان کا ڈر ہو یہ سب تہذیب کی باتیں ہیں۔ اونچے مذہب اور اخلاق کے جھگڑے ہیں۔ یہ تلوار تو بہت بلند اصولوں کی حمایت میں نکلی ہے۔۔ شکر کر کہ تیرا گلا اس سے کاٹا نہ جائے گا۔ شکر کر تو غیر مہذب ہے، جاہل اور بے اخلاق ہے۔ شکر کر کہ تجھے یہ نہیں معلوم مذہب کیا ہے۔ تو نے کبھی سندھیا نہیں کی۔

کبھی پانچ وقت نماز نہیں پڑھی۔ تو کبھی کسی گرجے، مندر، مسجد نہیں گئی۔ تو نے کبھی آزادی کا مفہوم نہیں سمجھا۔ کبھی کسی سیاسی لیڈر کی تقریر نہیں سنی۔ شکر کر کہ تو کتیا ہے۔۔۔ انسان نہیں ہے۔"[১১৮]

"গাদ্দার" কৃষণচন্দ্রের এমন একটি উপন্যাস, যাতে তিনি দাঙ্গার পটভূমিতে একটি করুণ কাহিনি তৈরি করেছেন এবং এই গল্পের মাধ্যমে তিনি মানবতা, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বের একটি দর্শন উপস্থাপন করেছেন। এই উপন্যাসে লেখক নিজেই বলেছেন-

دنیا سے ایک باب اٹھ گیا ایک نسل اُٹھ گئی، ایک خاندان اٹھ گیا، جس کو صرف پیار کرنا سکھایا گیا ہے۔ اردو ادب اور تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے احباب کو یہ ناول ضرور پسند آئے گا۔"[১১৯]

এই উপন্যাসের শেষের দিকে লেখক মনে করেন যে কোনো দেশ আলাদা হতে পারে না। দেশের সব মানুষই সমান, সকলের অধিকার একই। এই প্রসঙ্গে লেখক এই উপন্যাসে কিছু উদ্ধৃতাংশ এভাবে তুলে ধরেছেন-

"جب ہندوستان ہوتے ہوئے بھی کوئی ہندوستان نہ ہوگا اور پاکستان ہوتے ہوئے بھی کوئی پاکستان نہ ہوگا۔ کوئی ایرانی نہ ہوگا۔ اور کوئی افغانستان نہ ہوگا۔ کوئی امریکہ نہ ہوگا۔ اور کوئی روس نہ ہوگا۔ کوئی چین نہ ہوگا۔ اور کوئی جاپان نہ ہوگا۔ جب یہ ساری دھرتی اس دنیا کے سارے انسانوں کے لئے ایک چھوٹا سا گاؤں بن جائے گی۔ جس میں تمام انسان اپنی اپنی گلیوں میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے محبت اور الفت ہمسائیگی اور آزادی اور برابری کا برتاؤ کرتے ہوئے امن و چین سے رہیں گے۔"[১২০]

কৃষণচন্দ্রের পঞ্চম সফল উপন্যাস হচ্ছে ایک عورت ہزار دیوانے (এক আওরাত হাজার দিওয়ানে)। এই উপন্যাস ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে লেখক এক নারীর জীবনী অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।[১২১] মেয়েরা সৌন্দর্যের প্রতীক, তারা শুধু চার দেওয়ালের মধ্যে থাকবে। আজ শুধু সে প্রেমিকা নয়, সে মা, বোন ও বেগম হয় এবং সমাজে তার কি অবস্থান সে সম্বন্ধে সে জানে। কৃষণচন্দ্র নারীদের নিয়ে অনেক উপন্যাস লিখেছেন। তার অনন্য উপন্যাস শিকাস্ত এ চন্দ্রার চরিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেমনি আরেকটি উপন্যাস এক আওরাত হাজার দিওয়ানে এর মধ্যে এমন এক নারীর কথা উল্লেখ করেছেন, যে সকল পরিস্থিতি সে মোকাবেলা করতে সক্ষম। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হচ্ছে লাচি, যে হোসেন খানার কেল্লায় ছিল। এই উপন্যাসে সেখানকার জীবন এবং লড়াকু এক মেয়ের কাহিনি ফুটে উঠেছে। সে খুবই সুন্দরী ছিল কিন্তু ভাগ্য ও পরিবেশ ছিল তার প্রতিকুল। এ প্রসঙ্গে লেখক নিজেই বলেছেন-

"قدرت نے اسے عورت بنایا تھا اور ماحول اور اتفاق نے اسے خانہ بدوش بنا دیا تھا۔ اور یہ تینوں چیزیں جی ایسی ہیں کہ کبھی انسان سے انصاف نہیں کرتیں۔ قدرت، ماحول، اتفاق ان تینوں چزوں کے زبردست ہاتھوں سے انصاف کو چھینتا پڑتا ہے۔"[১২২]

উপন্যাসের লেখক লাচির লড়াইয়ের কথা তুলে ধরেছেন, যেখানে সে তার ইজ্জত ও সম্মান বাঁচানোর জন্য লড়াই করে। তার অজান্তে লাচির নিজের মা লাচিকে সাড়ে তিনশো টাকা দিয়ে এক ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়। যখন সে জানতে পারে তখন তা অস্বীকার করে। কিন্তু তার মা টাকা ফেরত দিতে চায় না, তাই তাকে সেই ব্যক্তির সঙ্গে যেতে হয়। শর্ত ছিল তিন মাসের মধ্যে তার টাকা ফেরত দিলে সে মুক্ত হয়ে যাবে। এ কারণে লাচি টাকা জোগাড় করতে গিয়ে নিজের সম্মান হারিয়েছে। কারণ সমাজে মেয়েদের কেউ টাকা দিলে তার বিনিময়ে কিছু দিতে হয়। তাই সে নাচ গান করে অন্যদের মনোরঞ্জন করতো। অপরদিকে গুল নামে এক ছেলে লাচির প্রেমে পড়ে। এ কারণে গুল নিজের বাড়ি ও ধন-সম্পদ ছেড়ে লাচির কাছে চলে আসে। কারণ নায়কের বাবা লাচিকে কখনো মেনে নেবে না। এই প্রেম এক তরফা নয়, লাচিও নায়ককে পছন্দ করতো। লাচি এত দিনে সাড়ে তিনশো টাকা জোগাড় করেছিল; কিন্তু সে টাকা চুরি হয়ে যায়। বিধায় তাকে সেখানে নাচ-গান করে থাকতে হয় এবং এক সময় লাচি জেলখানায় যায়। গুল জেলখানায় তাকে দেখতে যায় এবং সে একটি আবেদন করে; কিন্তু সে আফগানি হওয়ার জন্য তার আবেদনটি বিবেচনা করা হয় না। সে কারণে তাকে পাকিস্তান চলে যেতে হয়। পাকিস্তান থেকে অনেক কষ্ট করে আবার হিন্দুস্তানে আসে। এদিকে লাচির শরীর খুব খারাপ হয়ে যায়, চোখ অন্ধ হয়ে যায়। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে এক গলি দিয়ে যাওয়ার সময় এক মুসাফিরের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। মুসাফির তাকে গালি দেয় আর সে জন্য লাচি তাকে থাপ্পড় মারে এবং হাঙ্গামা শুরু হয়। লেখকের ভাষায়-

"اس نے مسافر کی گالی سن کر اسی وقت اس کا بازو پکڑ کر دو طمانچے رسید کر دیئے تھے۔ غم اور غصے سے اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔"[১২৩]

লোকেরা লাচির উপর পাথর ছুড়তে থাকে, নায়ক তা দেখতে পায়। নায়ক তাকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায় এবং সে ভালো হয়ে যায়। নায়ক কাজের সন্ধানে অন্য জায়গায় চলে যায় এবং আবার ফিরে আসার ওয়াদা করে যায়। কিছুদিন পর একটি মানি অর্ডার আসে তাতে কিছু লিখা না দেখে নায়িকা খুব কষ্ট পায়। সে আরেকটি মানি অর্ডার পাঠিয়ে বলে এটি একটি অন্ধ মেয়ের জন্য, আমার জন্য নয়। লেখক এখানে দেখাতে চেয়েছেন যে, কোন অবস্থাতেই সে নতি স্বীকার করবে না। তার মনে লড়াইয়ের একটি জিদ রয়েছে। কিন্তু সে তার প্রেমিককে এখনো ভালোবাসে। তার ভালোবাসায় কোন খুঁত নেই। এ প্রসঙ্গে আলী সরদার জাফরী বলেছেন-

"ترقی پسند ادب کی عورت کی محبت اس کی زندگی اور جدوجہد کا ایک حصہ ہوتی ہے وہ اگر اپنے محبوب کے لئے سب کچھ قربان کر سکتی ہے اور عمر بھر اس کے انتظار میں اپنی محبت کو تر و تازہ رکھ سکتی ہے۔ تو اپنے غدار اور بے ایمان شوہر سے کنارہ کاش بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ اس کی محبت میں صرف اعصاب نہیں بلکہ اس کا دل بھی شامل ہوتا ہے اور ترقی پسند ادب کی عورت کا دل پاک ہے۔"[১২৪]

লেখক এই উপন্যাসের মাধ্যমে এমন সমাজকে ধিক্কার জানিয়েছেন, যেখানে পুরুষদের আদেশই প্রধান, মেয়েদের কোন প্রধান্য নেই। মেয়েরা যতই ভালো করুক না কেন সেটি পুরুষদের চোখে পড়ে না। এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক নারীকে ধৈর্যশীল, সহনশীল এবং সাহসী বলে স্বীকৃতি প্রদান করেছেন।

কৃষণচন্দ্রের আরো একটি সফল উপন্যাস *دل کی وادیاں سو گئیں* (দিল কি ওয়াদিয়া সো গায়ে), যা ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১২৫] এই উপন্যাসের শুরুতে কৃষণচন্দ্র লিখেছেন-

"اس ناول کے مرکزی خیال کا آغاز میرے عزیز دوست رمیش سہگل سے ایک بحث کے دوران میں ہوا۔ وہ ریلوے ٹرین کے حادثے کو ایک موضوع بنا کر اس پر ایک فلم بنانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا ایک ریلوے ٹرین میں ایک مسافر نہیں بارہ تیرہ سو مسافر سفر کرتے ہیں۔ اس لئے ایک نہیں، اس موضوع پر تو بارہ تیرہ سو کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں۔ اتنے ہی ناول اور اتنے ہی قلم تیّار ہو سکتے ہیں۔ وہ بولے تم ناول لکھو میں اسے فلماؤں گا۔ چند کرداروں کے امکانات پر بھی بحث رہی۔"[১২৬]

এই উপন্যাসের কাহিনি একটি ট্রেনকে নিয়ে। ট্রেনটির রাস্তায় এক দূর্ঘটনা ঘটে; এতে ট্রেনের ধাক্কায় যাত্রীদের কেউ গুরুতর আঘাত পেয়েছিল, কেউ মরে গিয়েছিল এবং কেউ বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু সকল যাত্রী বিপদে পড়ে যায়, তাদের মাল ও জিনিসগুলো ট্রেন থেকে নামিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে, তারা তিনদিন সেখানে অবস্থান করে। কারণ তাদেরকে সাহায্য করার মতো আশেপাশে কোন ট্রেন স্টেশন ছিল না। এই ট্রেনে সব ধরনের লোকজন ছিল। ট্রেনে এক রাজকুমার ছিল, তাকেও তিনদিন অবস্থান করার জন্য শুকনো রুটি খেতে হয়েছিল। এছাড়া এই ট্রেনে বারো বা তেরোজন মুসাফির ছিল, যারা বিভিন্ন পেশার ছিল। মৌলবি, শেঠ, মজদুর, জমিদার, ফকির, কবি, ডাক্তার, কৃষক, এমনকি জেলে সাজাপ্রাপ্ত ডাকাতও ছিল। এই সব লোকজন প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে, একে অপরকে মহব্বতের সাথে আপন করে নিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল। সবার মধ্যে ভালোবাসার মেলবন্ধন তৈরি হয়েছিল। এই উপন্যাসে কৃষণচন্দ্র গরিবদের জীবন কীভাবে কাটে তা চিত্রায়িত করেছেন এবং যে রাজকুমার ছিল তা এই তিনদিনে জীবনের কষ্ট কেমন তা বুঝতে পেরেছিল। এই উপন্যাসটি কৃষণচন্দ্রের একটি মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

باون پتے (বাওন পাত্তে) কৃষণচন্দ্রের আরেকটি উপন্যাস, যা ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১২৭] এই উপন্যাসে সমাজের এমন কিছু রীতিনীতি দেখানো হয়েছে, যেখানে জন্মের সাথে সাথেই মেয়েদের বোঝানো শুরু হয় যে তারা গরুর মতো। এইভাবে মেয়েরা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা ঐতিহ্যকে মেনে নিয়েছে এবং তারা কোন বিরোধিতা ছাড়াই সব ধরনের নিপীড়ন সহ্য করতে অভ্যস্ত

হয়ে গেছে। এই বিষয়টি কৃষণচন্দ্র তার এই উপন্যাসে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। মূলতঃ এই উপন্যাসে একটি নারীর অসহায়ত্ব ও নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

ایک گدھے کی سرگزست (এক গাধে কি সারগুজাস্ত) কৃষণচন্দ্রের আর একটি মাস্টারপিস উপন্যাস। এটি ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে 'শাম্মা' পত্রিকায় নয়াদিল্লীতে প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার জন্য বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।[১২৮] এই উপন্যাসে তিনি একটি পৃথক পরিচয় প্রদান করেন। দেশের রাজনীতি সরকার ও বে-সরকারি অফিসের ভূমিকা নিয়ে তিনি অনেক আকর্ষণীয়ভাবে তৈরি করেছেন এই উপন্যাস। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র একটি গাধা যা দ্বারা তিনি শ্রমিক শ্রেণিকে বুঝিয়েছেন।

برف کی پھول (বরফ কি ফুল) কৃষণচন্দ্রের আরো একটি উপন্যাস যা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১২৯] এতে কৃষণচন্দ্র সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রেমের ব্যর্থতা কাজে লাগিয়েছেন। কাশ্মিরের রোমান্টিক পরিবেশে সাজিদ এবং জয়নবের ভূমিকা এই উপন্যাসে তিনি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। বরফের পাহাড়ের কোলে কাশ্মিরের রোমান্টিক দৃশ্যগুলো এ উপন্যাসে অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। এই উপন্যাস সম্বন্ধে কৃষণচন্দ্র নিজেই লিখেছেন-

"برف کے پھول کی ساری فضا رومانی ہے مگر حقیقت سے دور نہیں تھے۔ اسے رومانی ناولوں کے لکھنے میں مزہ آتا ہے۔ جن میں رومان کا خمیر زندگی کی کسی سچی سرگزشت سے اٹھایا جائے۔ برف کے پھول ایک ایسی ہی داستان ہے۔"[১৩০]

কৃষণচন্দ্রের *پیار ایک خوشبو* (পিয়ার এক খুশবু) নামে একটি উপন্যাস যা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩১] এ উপন্যাসে কৃষণচন্দ্র সমাজ ও কাশ্মিরের উপত্যকায় বসবাসকারী উপজাতির বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। এটি এমন একটি উপজাতি যারা দেব-দেবী, অন্যান্য উপজাতির থেকে পৃথক ভূমি, স্বর্গ, মৃত্যু, জীবন এবং আত্মা সম্পর্কে তাদের বিশ্বাসে বলিয়ান। এই উপন্যাসটি রোমান্টিক পরিবেশে লালিত একটি সুন্দর মেয়ে আনজি এবং তার প্রিয় চেনানের প্রেমের গল্প। আনজির বাবা তার পুরনো বন্ধু চেনানোর বাবার সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, যদি তার ঘরে কোন মেয়ে জন্মে, তবে সে চেনানোর স্ত্রী হয়ে উঠবে। তিনি তার প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেননি। কারণ তারা দুজনে এক সাথে মারা গিয়েছিলেন।

آسمان روشن ہے (আসমান রোওশন হ্যা) কৃষণচন্দ্রের আরো একটি সফল উপন্যাস, যা ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩২] 'আসমান রোওশন হ্যা' এমন একটি কাহিনি যেখানে নায়ক তার প্রেমিকাকে

না পেয়ে আত্মহত্যার ইচ্ছা পোষণ করে এবং আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যে সে বোম্বে থেকে খাণ্ডালে যায়। এক হোটেলে সে সাত দিন আরাম আয়েশে থাকার পরে আত্মহত্যা করতে যায়; কিন্তু হোটেলে এক জার্মানি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয় সে তাকে আত্মহত্যা করা থেকে বিরত রাখে এবং সে বলে জীবন অনেক সুন্দর এবং এই সুন্দরজীবন ধ্বংস করা কারো উচিত নয়। কৃষণচন্দ্র এই উপন্যাসে মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় শত্রু যুদ্ধকে আখ্যায়িত করেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন যে, এই যুদ্ধ মানুষকে এবং মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয়।[১৩৩]

চলচ্চিত্রের সাথে সম্পর্কিত কৃষণচন্দ্রের আরেকটি উপন্যাস چاندی کا گھاؤ (চান্দি কা ঘাও) যা ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩৪] এই উপন্যাসে কৃষণচন্দ্র নতুন চলচ্চিত্র জগতের একটি সত্য চিত্র উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। এতে এমন একটি মেয়ের হৃদয় বিদারক কাহিনি রয়েছে যা চলচ্চিত্রের দুনিয়াতে সে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। তার এই খ্যাতি ধরে রাখার জন্য তাকে কত ত্যাগ স্বীকার করতে হয় তা লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে সে গলা টিপে হত্যা করে এবং সে প্রায়শই অসহায় হয়ে পড়ে। তারপরও সে শেষ পর্যন্ত চলচ্চিত্র জগতের সাথে সংযুক্ত থাকে।[১৩৫]

گدھے کی واپسی 'গাধে কি ওয়াপাসী' কৃষণচন্দ্রের এমন একটি উপন্যাস যার প্রধান চরিত্র গাধা- অর্থাৎ নির্বোধ ব্যক্তি, যা ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩৬] এই উপন্যাস দ্বারা তিনি গল্পের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। এই উপন্যাসে 'গাধা' তার দেশে পুনরায় ফিরে আসে এবং চাকরি করতে থাকে। তাকে এক ইহুদি কিনে নিয়ে যায় এবং মদের ব্যবসায়ে তাকে ব্যবহার করে। পুলিশ তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় এবং পুলিশের ভয়ে সে পালাতে থাকে। এভাবে পালাতে পালাতে তার প্রেমবালার সাথে প্রেম হয়ে যায়। তার টাকা পয়সা যতদিন থাকে ততদিন তার ভালোবাসা থাকে। তারপর টাকা পয়সা ফুরিয়ে গেলে, প্রেমও ফুরিয়ে যায়। 'এক গাধে কি সারগুজাস্ত' উপন্যাস যেমন সফলতা অর্জন করতে পেরেছিল তেমনভাবে 'গাধে কি ওয়াপাসী' সফলতা অর্জন করতে পারেনি।

ایک گدھا نیفا میں (এক গাধা নিফা মে) কৃষণচন্দ্রের 'গাধা' ধারাবাহিকতার ৩নং উপন্যাস। এটি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩৭] এই উপন্যাসে 'গাধা' হিন্দুস্তান থেকে চীনে সফর করেছিল। ঐ সময় চীন ও ভারতের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো যে, 'গাধা' চীনের উজির 'আজীম চো ইন লায়ে' এর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল এবং ভারত ও চীন প্রসঙ্গে কথাবার্তা

বলেছিল। 'এক গাধা নিফা মে' উপন্যাসও 'গাধে কি সারগুজাস্ত' এর মতো খ্যাতি অর্জন করতে পারেনি।

دادرپل کے بچے (দাদরেপল কে বাচ্চে) কৃষণচন্দ্রের আরো একটি সফল উপন্যাস, যা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩৮] এই উপন্যাসে ঈশ্বরকে প্রকৃত অর্থে তুলে ধরা হয়েছে। সমাজ ও সভ্যতার কারণে ছেলেমেয়েরা স্কুলে না গিয়ে তারা দিনের বেলা ভিক্ষা করে এবং রাতে খারাপ কাজে লিপ্ত থাকে। ঈশ্বর তাদের জিজ্ঞাসা করলে তাদের মধ্যে কেউ বলে আমি বি.এ, কেউ বলে এম. এ, কেউ বলে মাধ্যমিক আবার কেউ বলে পঞ্চম শ্রেণিতে পাস করেছি। আসলে এই উপন্যাসে শিশুরা অনুভব করেছিল যে, তারা বাল্যত্ব হারিয়েছে এবং পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

কৃষণচন্দ্রের میری یادوں کے چنار (মেরি ইয়াদুঁ কে চুনার) একটি আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস যা ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষণচন্দ্র তার প্রথম জীবনের স্মৃতি ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ড এই উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। এই উপন্যাসের অধ্যয়ন থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, কৃষণচন্দ্রের মানসিক বিকাশ তার প্রাথমিক পরিবেশের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।[১৩৯]

درد کی نہر (দারদ কি নহর) কৃষণচন্দ্রের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস যা ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাস দিলীপ নামে এক যুবকের গল্প, যে সান্ধিয়া নামে এক মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং তার পরিবারের পুরুষদের বিলাসিতা ও অহংকার এবং তার সাহসী মায়ের আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে লড়াই করে।[১৪০]

کاغذ کی ناؤ (কাগজ কি নাও) কৃষণচন্দ্রের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস যা ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে দশ টাকা নোটের যাত্রার একটি আকর্ষণীয় গল্প রয়েছে এবং এতে কৃষণচন্দ্র ঘুষ, জালিয়াতি, চোরাচালান, বে-আইনি, মদ এবং এ জাতীয় অনেক কর্মকাণ্ডের আলোকপাত করেছেন। এই উপন্যাসটিতে দশ টাকার নোট সমাজের বিভিন্ন বিভাগের লোকের কাছে পৌঁছে। এই নোট ফুটপাতের লোকের কাছে যায় আবার বড়লোকের কাছেও যায়, মদখোরের কাছে যায়, পতিতার কাছেও যায়, কাজের মেয়ের কাছেও যায় আবার ঠিকাদারদের কাছেও যায়। এই বিষয়টিকে কৃষণচন্দ্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।[১৪১]

پانچ لوفر (পাঁচ লোফার) কৃষণচন্দ্রের এই ধারাবাহিকতার প্রথম উপন্যাস যা ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে কৃষণচন্দ্র ফুটপাতে বসবাসরত যুবকদের জীবনী তুলে ধরেছেন। তাদের

জীবন নির্বাহের জন্য তারা খারাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে; কিন্তু তাদের হৃদয় ছিল পরিস্কার ও পরিমার্জিত।[১৪২]

دوسری برف باری سے پہلے (দোসরি বরফ বারি সে পেহলে) কৃষণচন্দ্রের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস যা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাস এক রাজপুত রাজার শিকারি ঠাকুর সিংহের গল্প যাকে রাজা শিকার করে এবং তার রূপবতী স্ত্রীকে নিজের রাজপ্রসাদে রাখে। এই উপন্যাসটিতে কৃষণচন্দ্র যৌন অনুভূতিগুলো খুব চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন এবং এই উপন্যাসে কৃষণচন্দ্রের শিকার সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।[১৪৩]

কৃষণচন্দ্রের উপন্যাস گنگا بہے نہ رات (গঙ্গা বেহে না রাত) সম্ভবত ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল যা খুব বেশি জনপ্রিয় হয়নি। শামসুর রহমান ফারুকীর মতে এই উপন্যাস ছোট গল্পের মতো শুরু হয়েছিল। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র ছিল নাসিমা। তাকে ঘিরেই কৃষণচন্দ্র এই উপন্যাস রচনা করেছেন।[১৪৪]

مشینوں کا شہر (মেশিনোঁ কা শহর) কৃষণচন্দ্রের একটি ব্যতিক্রমধর্মী উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক বিজ্ঞানের বিপদজনক অবস্থার দিকটি তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসটি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষণচন্দ্র এই উপন্যাসে দেখাতে চেয়েছেন যে, রক্ত ও মাংসের মানুষ আর কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানীরা মানুষের মতোই রোবট তৈরি করছে শুধু তাদের মধ্যে জান দিতে পারে না। বিজ্ঞানীরা এই রোবট দিয়েই মানুষের মতো সব রকম কাজ করাচ্ছে।[১৪৫]

آئینے اکیلے ہیں (আয়নে একেলে হ্যায়) কৃষণচন্দ্রের একটি ভিন্নধর্মী উপন্যাস যা ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসে এক হিন্দুস্তানি যুবক প্লাস্টিক সার্জন কানুয়ালের গল্প তুলে ধরা হয়েছে। সে একজন খুব সুন্দরী মডেল মেয়ে জুলীর প্রেমে পড়েছিল; কিন্তু জুলী তাকে ঘৃণা করতো। জুলীর মাধ্যমে কৃষণচন্দ্র এই উপন্যাসে এক পাশ্চাত্য মেয়ের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।[১৪৬]

آدھا راستہ (আধা রাস্তা) কৃষণচন্দ্রের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস যা ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। 'আধা রাস্তা' উপন্যাসকে 'আয়নে এ্যাকেলে হ্যায়' উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই উপন্যাসে ড. কানুয়াল এক মুসলমান সুন্দরী মেয়ে শায়েস্তার প্রেমে পড়ে যায়। শায়েস্তা তার মায়ের বিপক্ষে গিয়ে কানুয়ালকে ভালোবাসতে থাকে; কিন্তু কানুয়ালের প্রথম স্ত্রী জুলি তাদের প্রেমে বাধা সৃষ্টি করে।[১৪৭]

উপরের আলোচিত উপন্যাসগুলো ছাড়াও কৃষণচন্দ্র আরো অনেক উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসগুলোর নাম নিচে প্রদত্ত্ব হলো-

سڑک واپس جاتی ہے(সড়ক ওয়াপস জাতি হ্যায়) لندن کی سات رنگ (লণ্ডন কি সাত রং) ایک دمکن سمندر کے کنارے(এক দামকন সমুন্দর কে কিনারে) ১৯৬১ খ্রি., بمبئی کی شام (মুম্বাই কী শাম), بوربن کلب (বরবান কল্ব) ১৯৬২ খ্রি., جنت اور جہنم (জান্নাত অওর জাহান্নাম), گوالیار کا حجام (গুয়ালিয়ার কা হাজাম) ১৯৬৯ খ্রি., ایک کروڑ کی بوتل (এক কারোড় কী বোতল) ১৯৭১ খ্রি., محبت کی رات (মহাব্বাত কী রাত), حسینوں کا شہر (হাসিনুঁ কা শহর) ১৯৭১ খ্রি., مہارانی (মহারানি) ১৯৭১ খ্রি., چندا کی چندنی (চান্দা কী চাঁদনী) ১৯৭১ খ্রি., چنبل کی چنبلی (চাম্বল কী চাম্বলি) ১৯৭৩ খ্রি., روٹی کپڑا اور مکان (রোটি কাপড়া অওর মাকান) ১৯৭৪ খ্রি., محبت بھی قیامت بھی (মুহাব্বাত ভি কিয়ামাত ভি) ১৯৭৪ খ্রি., اس کا بدن میرا چمن (উস্কা বাদন মেরা চামন) ১৯৭৪ খ্রি., سونے کا سنسار (সোনে কা সংসার) ১৯৭৬ খ্রি., فٹ پاتھ کے فرشتے (ফুটপাত কে ফারিস্তে) ১৯৭৭ খ্রি., ادھے سفر کی پوری کہانی (আধে সফর কী পুরি কাহানি)زرگاؤں کی رانی (জার গাঁও কী রানি) پانچ لوفار اور ایک ہیروین (পাঁচ লোফার অওর এক হিরোইন) کارنیوال (কারনেয়াল) مٹی کے صنم (মিট্টি কে সনম) ।[১৪৮]

উপন্যাসে শিল্পের পরিপূর্ণতা এবং সৌন্দর্যের জন্য চরিত্রের সঠিক চিত্রায়ন অপরিহার্য। কৃষণচন্দ্র তার উপন্যাসে চরিত্র চিত্রায়নে কলম সৈনিকের পরিচয় দিয়েছেন এবং তার উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে সহানুভূতির সাথে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. আসলাম আজাদ লিখেছেন-

"اس میں شبہ نہیں کہ کرشن چندر اپنے ناول کے کرداروں سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کے خال وخط کو نمایاں کرنے کی کاوش بھی کرتے ہیں۔"[১৪৯]

কৃষণচন্দ্রের চরিত্রায়নে তার উপন্যাসগুলোতে নারীবাদী চরিত্রটি সুস্পষ্ট। যাই হোক তিনি তার উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রগুলোও খুব আকর্ষণীয় এবং প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপন করেছেন। তার উপন্যাসগুলোতে পুরুষ চরিত্রগুলো উত্তেজনাপূর্ণ ও প্রাণবন্তভাবে চিত্রিত করেছেন। জব খেত জাগে উপন্যাসের ‘রাঘুরাও’ শিকাস্ত উপন্যাসের ‘সিয়াম’ এক গাধে কি সারগুজাস্ত উপন্যাসের ‘গাধা’ এর জলন্ত উদাহরণ।

কৃষণচন্দ্রের উপন্যাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তার সুন্দর সাহিত্য শৈলির মূল কারণ হলো উপযুক্ত শব্দ, আকর্ষণীয় কৌশল, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার সুক্ষ্ম রূপক এবং এর চমৎকার ব্যবহার। তার উপন্যাসের বাক্যগুলো সংক্ষিপ্ত, তবে কখনো কখনো এই বাক্যাংশগুলো মীরের কবিতার মতো তীরের

মতো কাজ করে। হাস্যরসিকতাও কৃষণচন্দ্রের সাহিত্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি তার জীবনের বৈচিত্র্যময় বাস্তবতাকে যেভাবে দেখেছেন সেভাবেই তার উপন্যাসের মধ্যে উপস্থাপন করেছেন। মোহাম্মদ হাসান আসকারীর মতে-

"کرشن چندر میں سب سے مقدم چیز ان کا منفرد نقطۂ نظر ہے۔ وہ سب سے پہلے بھی کرشن چندر ہے اور سب سے آخر میں بھی کرشن چندر۔ اس نے کسی مخصوص تحریک یا نقطۂ نظر کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیا ہے۔ نہ تو پرولتاریت کو نہ جنس کو، نہ رومانیت کو۔ محض ترقی پسندی کو بھی نہیں۔ وہ زندگی کو دیکھنے کے لیے کسی مخصوص رنگ کے شیشوں کی مدد نہیں لیتا۔ اسے اپنی آنکھوں پر پورا اعتماد ہے اور اس کے نزدیک حقیقت نگاری کے صرف ایک معنی ہیں۔ زندگی کی حقیقت کو جیسا کچھ اس نے سمجھا ہے اسے بیان کر دیا۔"[১৫০]

منظر نگاری বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রায়ন যে কোন উপন্যাসের জন্য অত্যন্ত জরুরী। আর কৃষণচন্দ্র তার উর্দু উপন্যাসগুলোতে প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রায়ন খুব সুক্ষ্ম ও চমৎকারভাবে চিত্রায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. আখতার অরণী বলেছেন-

"کرشن چندر منظر و ماحول نگاری میں کمال کر دکھاتے ہیں۔ وہ صرف خارجی خصوصیات ہی کو پیش نہیں کرتے بلکہ منظر و ماحول کی روح بھی پیش کر دیتے ہیں۔ وہ داخلی کوائف کو پیش کرنے کے ماہر ہیں۔ روح فطرت ان کے سامنے عریاں نظر آتی ہے اور سماج کی آتما کی بھی بہت اچھی طرح جھلک دکھلا دیتے ہیں۔"[১৫১]

কৃষণচন্দ্র কাশ্মিরের সুন্দর পরিবেশে বেড়ে উঠেছিলেন। এই কারণে তার উপন্যাসে কাশ্মিরের চিত্র খুব সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। তার বেশিরভাগ উপন্যাসেই কাশ্মিরের দৃশ্য ছবির ফ্রেমের মতোই বাঁধানো আছে। দৃশ্যের বর্ণনা কৃষণচন্দ্র তার উপন্যাসে যেভাবে তুলে ধরেন অন্য কবি ও সাহিত্যিকরা সেভাবে তুলে ধরতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক আজীজ আহমেদ বলেছেন-

"منظر کشی میں کرشن چندر کا مقابلہ اردو کا کوئی نثر نگار نہیں کر سکتا۔ کسی ادیب یا شاعر نے کشمیر کے پہاڑوں وادیوں، چشموں، ندیوں اور جھیلوں مرغزاروں، قصّوں اور دیہاتوں کی اچھی تصویریں نہ کھینچی ہوں گی۔"[১৫২]

রতন নাথ সরশারঃ উর্দু গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে রতন নাথ সরশারের নাম অবিস্মরণীয়। তিনি উর্দু গদ্যসাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার আসল নাম পণ্ডিত রতন নাথ দর এবং উপাধি সরশার।[১৫৩] তিনি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মিরের ব্রাক্ষণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১৫৪] তার বাবা পণ্ডিত বেজ নাথ দর লক্ষ্মৌতে ব্যবসা করতেন। যখন সরশারের চার বছর বয়স তখন তার বাবা ইন্তেকাল করেন।[১৫৫] তারপর থেকে তিনি তার মায়ের কাছে লালিত-পালিত হন। প্রথমে তিনি স্থানীয় মক্তবে আরবি ও ফারসি শিখেছিলেন। সরশার তার পড়াশোনার জন্য ক্যানিং কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন তবে

ডিগ্রী না নিয়ে চলে যান।[১৫৬] ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্পাদক হিসাবে "আউধ" পত্রিকায় যোগদান করেন।[১৫৭] ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে সরশার হায়দ্রাবাদে চলে আসেন, যেখানে তিনি তার গদ্য রচনা ও কাব্য রচনাকে সংশোধন ও উন্নত করতে মহারাজা স্যার প্রসাদের সাথে নিযুক্ত হন।[১৫৮] তিনি অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে জানুয়ারি হায়দ্রাবাদে মারা যান।[১৫৯] উর্দু উপন্যাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন সরশার। সরশারের উপন্যাসের বিষয় লক্ষ্ণৌর ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম অভিজাত শ্রেণি, ক্ষয়শীল সমাজে বিশৃঙ্খলা, বিলাসিতা, ভীরুতা, জড়তা ও তার পাশপাশি অন্তপুরের সম্ভ্রান্ত নারীদের চারিত্রিক গাম্ভীর্য, স্বামী প্রবণতা ও ঐতিহ্য পরায়ণতা। মুসলিম অন্তপুরের বেগম, সেখানকার দাসী বাদী, বাইরের পতিতা, চুড়ি বিক্রেতা, ধাত্রী, পুরুষদের মধ্যে নবাব, তোষামোদকারী, পণ্ডিত, লুচ্চা, চোর, আফিমখোর এসব বিচিত্র চরিত্রের মানুষ তার উপন্যাসে উপজীব্য বিষয়। আলে আহমেদ সরুর এর উদ্ধৃতি দিয়ে ড. সৈয়দ লতিফ হুসাইন বলেছেন-

"لکھنؤ کی نثر کو عظمت صرف سرشار کے یہاں حاصل ہوئی ہے۔اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرشار ایک عاشق کا دل رکھتے ہوئے بھی حکیمانہ شعور رکھتے تھے اور جس تہذیب میں انھوں نے آنکھیں کھولیں اس سے محبت رکھنے کے باوجود اس پر تنقیدی نظر ڈال سکتے تھے۔"[১৬০]

সরশারের সর্বউৎকৃষ্ট নামকরা উপন্যাস ফাসানায়ে আজাদ। ফাসানায়ে আজাদ ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে সরশার লেখা শুরু করেন এবং তা ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত করেন। এই উপন্যাস নওল কিশোর প্রতিষ্ঠিত "আউধ" পত্রিকায় ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে ছাপা হয়।[১৬১]

ফাসানায়ে আজাদের নায়ক আজাদ ও নায়িকা হুসনে আরা। আজাদ লক্ষ্ণৌর নবাব পরিবারের যুবকদের মতোই বিলাসী, সৌখিন, প্রেমিক স্বভাব, কবি প্রকৃতি, মদ্যপায়ী ও রসিক স্বভাবের মানুষ ছিলেন। অপরদিকে হুসনে আরা সুন্দরী, শিক্ষিতা ও স্বাধীনচেতা। লেখক লক্ষ্ণৌর সামাজিক পটভূমিতে এর চিত্র চিত্রায়িত করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি লক্ষ্ণৌর সামাজিক জীবনের রংগুলো ব্যবহার করেন। লেখক এই উপন্যাসে লক্ষ্ণৌর বর্ণনা এভাবে তুলে ধরেছেন-

"لکھنؤ کا محرم الحرام ہے۔ لکھنؤ کی سوزخوانی۔ لکھنؤ کی خوش بیانی، لکھنؤ کی عزاداری، لکھنؤ کی سوگواری، از شام تا دم، مشہور ہر مرز بوم ہے۔ تعزیہ خانوں میں دھوم، امام باڑوں میں ہجوم ہے۔ اور ان سب میں حسین آباد مبارک کا بدر فی النجوم ہے۔"[১৬২]

এই উপন্যাসে সামাজিক জীবনের সব দিকের সাথে এত গভীর সংযোগ রয়েছে যা অন্য কোন উপন্যাসে কম দেখা যায় এবং উর্দু উপন্যাসের পরিবর্তে এটিকে একটি আধুনিক গল্প বলা বেশি উপযুক্ত। এই প্রসঙ্গে ড. কমর রইস বলেছেন-

"فسانۂ آزاد" میں انسانی زندگی کاایک سمندر رہے جو ٹھاٹھیں مارتا نظر آتا ہے۔ مصاحب، جوتشی، فقیر، شاہ جی، مانجھی، تلنگے، داروغہ، مولوی، پنڈت، شاعر، مغنی، بنوائے، لونڈیاں، خدمت گار الغرض لکھنؤ کے ہر طبقہ، ہر پیشہ ہر سطح اور ہر مذاق وفن کے لوگ فسانہ آزاد میں اس عہد کی پوری تہذیب کو لے کر سامنے آتے ہیں۔"[১৬৩]

এই উপন্যাসে তিনি লক্ষ্মৌর ও সামাজিক জীবনের নিঃসঙ্গতা তুলে ধরেছেন। একটি নতুন সভ্যতার দাবি উপস্থাপন করেছেন এবং তাদের সাথে নিজেকে একত্র করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক ওকার আজীম বলেছেন-

"فسانۂ آزاد، اردوناول کی تاریخ میں اسی لئے زندہ رہے گا کہ ایک خاص عہد کا لکھنؤ اس کی بدولت زندہ ہے اور اس لئے زندہ ہے کہ ناول نگار نے اس کا پوری طرح مشاہدہ کیا ہے۔"[১৬৪]

ফাসানায়ে আজাদ রতন নাথ সরশারের একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এই উপন্যাসে লেখক রোমান্টিকতার দৃশ্যাবলী খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এছাড়া তিনি রোমান্টিকতার পাশাপাশি লক্ষ্মৌ সমাজের ভালো ও খারাপ দিকগুলো সুনিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে সালিহ আবিদ হোসেন যথাযথ বলেছেন-

"فسانۂ آزاد اگرچہ ایک رومانی داستان ہے اور ایک نہیں بیسوں حسن وعشق کی کہانیاں اس میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک مقصدی ناول ہے۔ مصنف کا مقصد اس ناول کو لکھنے سے یہ تھا کہ اپنے زمانے کی معاشرت اور تہذیب کی خامیاں اجاگر کردے اور لوگوں کو نئے زمانے کے تقاضوں سے آگاہ اور نئی چیزوں سے روشناس کرائے۔ اس لیے اسے ایک اصلاحی معاشرتی ناول کہنا بے جانہ ہوگا۔"[১৬৫]

লক্ষ্মৌর সামাজিক জীবন পুরোপুরি ফাসানায়ে আজাদে উপস্থাপিত হয়েছে। চরিত্রায়ন এর ক্ষেত্রেও উপন্যাসটির একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। লেখক এখানে যুবক আজাদের বিচিত্র চরিত্র এবং হুসনে আরার আকর্ষণ খুব সুন্দরভাবে চিত্রায়ন করেছেন। এ উপন্যাস সম্পর্কে প্রফেসর আলে আহমেদ সুরুর বলেছেন-

"سرشار نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں مگر فسانۂ آزاد ہی ان کا شاہکار ہے۔ اسکی کی وجہ سے وہ زندہ ہیں۔ ان کی دوسری کتابیں ان کی وجہ سے زندہ ہیں۔"[১৬৬]

ফাসানায়ে আজাদের একটি চমৎকার বৈশিষ্ট্য হলো এতে অসংখ্য চরিত্রের সমন্বয় রয়েছে। এই উপন্যাসে আজাদের চরিত্র সম্পর্কে প্রেম পাল অশোক বলেছেন-

"فسانۂ آزاد میں سرشار نے خاص کردار میاں آزاد کا پیش کیا ہے۔ یہ فسانۂ آزاد کا ہیرو ہے۔ اور تمام قصہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ آزاد ایک آوارہ اور کھمگڑ انسان ہے۔ جہاں جاتا ہے اپنی لچھے دار زبان سے لوگوں کو گرویدہ بنالیتا ہے۔"[১৬৭]

এই উপন্যাসে চরিত্রগুলো আত্মনিয়োগের শক্তি হিসেবে যথার্থ। আজ অবধি কোন ঔপন্যাসিক এ জাতীয় চরিত্র তৈরি করতে পারেননি। এ ধরনের চরিত্র লক্ষ্মৌর সামাজিক জীবনের প্রতিধ্বনি পুরোপুরি উপস্থাপন করতে সহায়তা করে। ফাসানায়ে আজাদ একটি বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি, এটিতে হাস্যরস ও জীবনের একটি অনন্য চেহারা ফুটে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই উপন্যাসে মানবীয় জীবন নিয়ে যে প্রাণবন্ত করা হয়েছে তা কোন উর্দু উপন্যাসে জুড়ি মেলা ভার। এই প্রসঙ্গে বাসন নারায়ণ দর এর উদ্ধৃতি দিয়ে ছালহা জারিন বলেছেন-

"فسانۂ آزاد" میں چیزوں کی نہیں بلکہ انسانوں کی تصویریں کھینچی ہے،"[১৬৮]

ফাসানায়ে আজাদ এমন একটি উপন্যাস যার ভাষা অনবদ্য ও প্রাণবন্ত। ড. আফরোজী জায়েদী এই উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন-

"اس میں (فسانۂ آزاد میں) لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ فسانۂ آزاد ایک ایسا لازاول ناول ہے جس میں لکھنؤ کی انحطاط پذیر معاشرت کی پیستوں اور مضحکہ خیز اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ متحرک نظر آتے ہیں۔اس ناول کی اچھوتی ظرافت اور زبان کے فن کارانہ استعمال نے اسے افسانوی ادب میں زندہ جاوید بنادیاہے۔"[১৬৯]

রতন নাথ সরশার এই উপন্যাসের উপর নির্ভর করে তার খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। এমনকি তিনি "ফাসানায়ে আজাদ" ব্যতীত অন্য কিছু না লিখলেও উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন। এই প্রসঙ্গে ড. কমর রইস বলেছেন-

"اگروہ فسانۂ آزاد" کے علاوہ کچھ نہ لکھتے تب بھی اردو ادب کی تاریخ میں شہرت دوام کے مالک ہوتے۔"[১৭০]

রতন নাথ সরশারের আরো অনেক উপন্যাস রয়েছে তার মধ্যে جام سرشار 'জামে সরশার' উল্লেখযোগ্য। এটি রতন নাথ সরসারের ২য় উপন্যাস। এই উপন্যাস ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মৌতে প্রকাশিত হয়।[১৭১] অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মতো এই উপন্যাসটিও বস্তুনিষ্ঠ এবং সামাজিক। এই উপন্যাস সম্বন্ধে এই উপন্যাসের প্রথমে বদর আলম বলেছেন-

"مجموعی حیثیت سے "جام سرشار" ایک تعمیری ناول ہے جس میں سرشار نے کچھ صحت مند مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ایک بیمار معاشرت کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ بیماری ذہنی بھی تھی اخلاقی بھی اور جسمانی بھی یہ ناول ناول کم ہے ایک تہذیب کا نوحہ ہے جسے پڑھ کر آنسو نہ بھی نکلیں آنکھیں کم ضرور ہو جاتی ہیں اس کے تاریخی حقائق دل کے تاروں کو چھوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔"[১৭২]

তার এই উপন্যাসে তিনি মদ্যপানের নিন্দা করেছেন। বস্তুত মনে হয় তিনি এই উপন্যাসের মাধ্যমে সামাজিক ও নৈতিক প্রতিকার করার চেষ্টা করেছেন। এটি খারাপ পরিবেশকে চিত্রিত করেছে, যেখানে খারাপ অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে তাদের সম্মান এবং সম্পদ নষ্ট হয়। অন্যান্য উপন্যাসগুলোর চেয়ে এর প্লটটি আরো সুসংহত। এই উপন্যাসে ঘটনার সাথে মিল রেখে চরিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ লতিফ হুসাইন বলেছেন-

"بحیثیت مجموعی جام سرشار کو ایک بھرپور ناول کہا جاسکتا ہے۔ اس میں پلاٹ ملتا ہے اور واقعات میں مناسب ترتیب کا خیال رکھا گیا ہے، کردار بھی واضح ہیں وحدت تاثر بھی ہے۔ زمانی و مکانی بعد بھی نہیں ہے۔ پھر ایک مقصد بالکل واضح ہے۔"[১৭৩]

এই উপন্যাসটি লক্ষ্মৌর রাজকুমারদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনকে উপস্থাপন করে। এই উপন্যাসের মূল চরিত্র নবাব আমির হায়দার। নায়ক তার বাবার তত্ত্বাবধানে বেঁচে থাকে এবং এ জন্য সে বিভিন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পায়। এই উপন্যাসের নায়ককে বোকা ও ভীরু দেখানো হয়েছে। যেমন ঘটনাচক্রে তার গাড়িটি একটি ছোট খাটো দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং কুমার আহত হয়। তখন তিনি সামান্য ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তিনি মনে করেছেন তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। প্রত্যক্ষদর্শীরা নবাবের উদ্বেগ আতঙ্কের সুবিধা নেয় এবং নবাবকে মদ পান করতে দেয়। মদ পানে আসক্ত হওয়ার পর নবাবের ভূমিকায় বিরাট পরিবর্তন আসে, যেখানে মদ্যপান একটি মারাত্মক সমস্যা। যদিও উপন্যাসটির উদ্দেশ্য হলো মদ্যপানের নিন্দা করা এবং মদ্যপানের বিপর্যয়মূলক প্রভাব তুলে ধরা। কোথাও একটুও বোঝা যায়নি যে ঔপন্যাসিক তার উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। বিপরীতে উপন্যাসটি ধনী ও বিলাসী মানুষের জীবনের সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি। তিনি প্রতিদিনের ঘটনাগুলো একটি পরিচিত উপায়ে উপস্থাপন করেছেন যা তার সফল উপন্যাসের প্রমাণ।

"জামে সরশার" ফাসানায়ে আজাদের মতো সফল না হলেও উর্দু গদ্যসাহিত্যে এর গুরুত্ব কম নয়। এ উপন্যাস প্রসঙ্গে প্রেম পাল অশোক লিখেছেন-

"یہ ناول سیر کوہسار کے مقابلے میں دو اعتبار سے مختلف ہے۔ اول یہ کہ اس ناول کا نواب مے نوش ہے۔ اس میں شراب نوشی کے برے نتیجے ظاہر کیے گئے ہیں۔ اس سرشار کا اپنا خاص کردار راوی زیادہ دیر تک سامنے نہیں آتا اور اگر آتا بھی ہے تو اپنے ماحول کا صحیح جائزہ لیتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ ناول بیک وقت لکھنے کے باوجود رتن ناتھ سرشار کے ناول 'جام شرشار' کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ فسانۂ آزاد کے مقابلے میں صحافت کا رنگ نہیں آتا۔ اس کے ایک باب میں شرابیوں کی فطرت کو بڑی خوبی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور اس باب میں سرشار کی کردار نگاری اپنے جوہر دکھاتی ہے اور زبان نے بھی اس ناول کے کرداروں کا پورا ساتھ دیا ہے۔ لیکن زبان وبیان کا جو زور فسانۂ آزاد میں نظر آتا ہے اس ناول میں نہیں ملتا۔"[১৭৪]

'জামে সরশার' একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপন্যাস। এ উপন্যাসে লেখক সামাজিক সমস্যাগুলো তুলে ধরার জন্য একটি সুস্পষ্ট আহ্বান জানিয়েছেন এবং কিছু জায়গায় এর সমাধান ও ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।

রতন নাথ সরশারের তৃতীয় উপন্যাস হলো- سیر کوہسار (সায়রে কোহসার)। উর্দু গদ্যসাহিত্যে এই উপন্যাসটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এই উপন্যাস ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১৭৫] এই উপন্যাস সম্বন্ধে প্রেমপাল অশোক বলেছেন-

"تکنیک کے اعتبار سے سرشار کاناول فسانۂ آزاد کے مقابلے میں زیادہ موثر اور پختہ ہے۔البتہ اس کی زبان کمزور ہے۔اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مصنف نے کہانی کے پورے پلاٹ کو اپنی گرفت میں رکھا اور کہیں بھی اِدھر اُدھر نہیں بھٹکے اور نہ ہی کہیں جھول نظر آتا ہے۔"[১৭৬]

এই উপন্যাসের মূল নায়ক নবাব মোহাম্মদ আশকারি। এই উপন্যাসে লেখক মধ্যবিত্ত পরিবারের নবাবদের বিলাসবহুল জীবন খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। নবাব বেগম একজন পবিত্র ও পূন্যবান নারী। একবার বশির উদ্দৌলা নামক এক ব্যক্তি তার সম্মানের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে সে তার উরুতে ছুরি ধরে, তবে নবাবকে এই সম্বন্ধে কিছু বলে না। নবাবের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও নবাব কামরীন নামে এক মেয়ের প্রেমে আবদ্ধ হয়। অবশেষে কামরীন নবাবকে ছেড়ে পালিয়ে যায়; কিন্তু তারপরে সে আবার নবাবের কাছে ফিরে আসে। ঘটনাচক্রে সে নবাবের সঙ্গ ত্যাগ করে পুনরায় পতিতালয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এদিকে নবাবের বেগম একজন সহজ-সরল ও ধৈর্যশীল নারী। সে হাসি মুখে এই সবকিছু সহ্য করে। অবশেষে কামরীন গুরুতর অসুস্থ্য হয়ে পড়লে সে পতিতালয় ছেড়ে নবাবের কাছে আশ্রয় নেয়। নবাব কামরীনকে পুনরায় আশ্রয় দেয়। এক সময় কামরীন মারা যায় এবং বেগমের সংসারে আবার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসে। এই উপন্যাসটিতে সরশার লক্ষ্মৌর সামাজিক জীবনের গুণাবলী ও দূর্বলতাগুলো তুলে ধরেছেন যা লক্ষ্মৌর পুরো পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছিল। এই উপন্যাসে নবাবদের মদ্যপানের কথাও তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসে রতন নাথ সরশার নবাবের মদ্যপান সম্বন্ধে বলেছেন-

"نواب محمد عسکری نے تین بار اپنے ہاتھ سے انڈیل کے پی اور نشے میں چور ہو گئے۔"[১৭৭]

এই উদ্বৃতাংশটুকু থেকে বোঝা যায় যে নবাব শুধু মদ্যপায়ী ছিলেন না বিলাসবহুল জীবন যাপনও করতেন। বিপুল পরিমাণ সম্পদ থাকার পরও খারাপ সহচর্যে মানুষ বিপদগামী হয়। স্পষ্টতই এই উপন্যাসে লেখক নবাবের অভিজাত, নবাবদের বিলাসবহুল জীবনের মানচিত্র অঙ্কন করেন। এই

উপন্যাসটিতে লেখক নবাবের ভূমিকার বিবর্তন দেখান। সুতরাং এই উপন্যাসটি সামাজিক বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা এবং চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সফল হয়েছে।

রতন নাথ সরশারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো کامنی 'কামিনী'। এই উপন্যাস ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১৭৮] কামিনী হিন্দুসমাজের একমাত্র উপন্যাস, যেখানে হিন্দু সমাজ এবং হিন্দুদের সামাজিক জীবনের বিষয়গুলো চিত্রিত হয়েছে। তবে হিন্দু সমাজের সাথে সম্পর্কীত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে এতে ঘাটতি রয়েছে। এই উপন্যাস সম্বন্ধে প্রেমপাল অশোক বলেছেন-

"اس ناول میں ایک بڑی کمزوری ہے سرشار کو بیگماتی زبان پر قدرت حاصل ہے لیکن اس ناول کا ماحول ہندوانہ ہے۔اس لیے بیگماتی زبان ہندوانہ ماحول کا ساتھ نہیں دیتی۔اسی لیے ناول کے تمام کرداروں میں تصنع اور بناوٹ کا پہلو نمایاں رہتا ہے۔"[১৭৯]

এই উপন্যাসের নায়ক রণবীর সিং এবং নায়িকা কামিনী। রণবীর সিং ছিল খুব সুন্দর, শিক্ষিত এবং সাহসী যোদ্ধা। লেখকের ভাষায়-

"ایسا خوبصورت لڑکا پڑھا لکھا اور لائق اور ملنسار اور خوبصورت لڑکا ہے۔"[১৮০]

নায়িকা ছিল অনুপম সুন্দরী ও শিক্ষিত। রতন নাথ সরশার এই উপন্যাসের নায়িকা কামিনী সম্বন্ধে এভাবে উদ্ধৃতাংশ তুলে ধরেছেন-

"اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ہم نے لاکھوں لڑکیاں دیکھیں مگر یہ ان بان کہاں۔یہ پان کھائی ہو گی تو سچ مچ گلے سے سرخی نمودار ہو جاتی ہو گی۔ان سب پر طرہ یہ کہ بڑی ذی شعور بڑی سلیقہ شعار،انتظام خانہ داری میں برق ماں باپ بھائی بھاوج،بہن سب اس سے خوش سب کی تیلیوں کا تارا اور نئی بات اس میں یہ تھی کہ پڑھی لکھی ایسی کہ ہندو یا مسلمان کی لڑکی کے پاسنگ کو نہیں پونچتی تھی۔"[১৮১]

এই উপন্যাসের নায়ক রনবীর সিং সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। ঐ সময়ে ৬ থেকে ৭ বছরের মেয়েরা নির্দোষ বিধবা হয়ে যায়। তারা আর বিয়ে করে না। এই অবস্থা দেখে নায়ক সোচ্চার হয়। আবার তিনি তাবিজ, বজ্রধ্বনি, পীর ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাসের নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি শিক্ষিত হয় তবে সে এ জাতীয় বিশ্বাস করে না। এ কারণে তিনি সমাজের এই রীতি নীতির বিরোধিতা করেন এবং মানুষকে তাদের হৃদয় থেকে এই ধরনের চিন্তাভাবনা বিতাড়িত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। এই উপন্যাসে নায়ক ও নায়িকা দুজনে বিয়ে করে এবং বিয়ের পর রণবীর সিং সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে যায়। সম্মুখযুদ্ধে ভুল বোঝাবুঝির কারণে রণবীর সিং নিহত হয়। এই উপন্যাসটি এমন একটি উপন্যাস যা হিন্দু পরিবারকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে। এই উপন্যাসে লেখক বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে পুরাতন ঐতিহ্যের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। তিনি সামাজিক বিশ্বাস এবং আদর্শের প্রতি আলোকপাত করেছেন। এই উপন্যাসের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি দূর করার চেষ্টা করেছেন।

রতন নাথ সরশারের আরেকটি উপন্যাস হলো طوفان بے تمیزی (তুফান বেতামিযি। এই উপন্যাস সম্পর্কে প্রেমপাল অশোক বলেছেন-

"بحیثیت مجموعی کہا جاسکتا ہے کہ 'طوفان بے تمیزی" سرشار کے زوال پزیر دور کی ایک عمدہ مثال پیش کرتا ہے۔"[১৮২]

এই উপন্যাসটির উদ্দেশ্য এই যে, গুজব ছড়িয়ে পড়ার ফলে সমাজে তার প্রভাব। এই উপন্যাসের কাহিনিটি হলো একটি নদীর তীরে একটি হিন্দু উৎসব উদযাপিত হয়েছিল। মেলায় হিন্দু পতিতা এসেছিল, সে কোন মন্দিরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো। এই পতিতাকে একটি মুসলমান গুণ্ডা অনুসরণ করতে থাকে। পতিতার সঙ্গে এক হিন্দু শক্তিশালী পুরুষ ছিল যে তাকে বাঁচাতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যদিকে একটি গ্রামের কাছাকাছি একটি মুসলমান উৎসব উদযাপিত হয়েছিল। এই সমাবেশে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে আর শেষ পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়। সর্বোপরি গুজব পুরো শহরে বনের আগুণের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হিন্দু মুসলমানদের হত্যা করা হয়েছিল। রতন নাথ সরশারের ভাষায়-

"ہندو مسلمانوں میں بے وجہ بے سبب جنگ کی آگ بھڑک گئی او نوبت بایںجار سید کہ گھاٹ والوں نے مسلمانوں کو مارتے مارتے بیدم کر دیا اور گھاٹ والوں کو جولاہوں اور قسائیوں نے خوب مارا اور ناگے و حشیون نے اُنسے بدلا لیا۔"[১৮৩]

এই হত্যাযজ্ঞে পুলিশ ঘুষ নিয়ে একদিকে সরে গেলে সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠানো হয়। এই উপন্যাসে গুজবের সামাজিক কুফল এবং এই সামাজিক সমস্যার পরিণতি কতোটা ধ্বংসাত্মক তা নিয়ে আলোচনা এবং তা নিরসনে প্রচেষ্টা চালানো হয়।

پی کہاں (পি কাহাঁ) রতন নাথ সরশারের আরেকটি ছোট উপন্যাস। এই উপন্যাসে এমন এক রাজপুত্রের গল্প বলা হয়েছে যিনি যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে জীবনের শেষ দিনগুলো গণনা করেছিলেন। তিনি তার প্রিয়তমার সাথে দেখা করতে চান, তবে শেষ পর্যন্ত দেখা হয় না। তিনি হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শেষ পর্যন্ত অজানা জগতে পাড়ি জমান। 'পি কাহাঁ' আসলে উপন্যাস নয়, একটি ছোটগল্পও নয়, এই দুটির মাঝামাঝি একটি গল্প। এই উপন্যাসটি একটি চরিত্রের উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা হয়েছে এবং সেই চরিত্রটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে এর অভিনবত্ব শেষ হয়। এই উপন্যাসে হতাশা এবং অসহায়ত্বের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে।[১৮৪]

রতন নাথ সরশারের 'পি কাহা' উপন্যাসের মতো ہشّو (হাশু)ও একটি ছোট উপন্যাস। এই উপন্যাসটিও এক কেন্দ্রীয় চরিত্রের উপন্যাস, যেখানে এক হিন্দু শেঠ-এর চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসের নায়ক একজন মাতাল এবং নেশার কারণে বেশির ভাগ সময় অসুস্থ্য থাকে। এই উপন্যাসে নায়ক এক সময় মদ পান করা ছেড়ে দেয় এবং সে ভালো মানুষ হয়ে যায়। এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য হলো মদ্যপানের খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা। অর্থাৎ এটি একটি মদ্যপান বিরোধী উপন্যাস।[১৮৫]

পণ্ডিত রতন নাথ সরশারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো 'کڑم دھم' (কড়ম ধম)। এই উপন্যাসের হিরোইন নোশাবা 'কামিনী' উপন্যাসে কামিনীর মতো সমাজের পুরনো রীতিনীতি এবং ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। নোশাবা একজন শিক্ষিত মেয়ে, সে নবাবের অবাধ্য, মাতাল এবং লুচ্চা ছেলেকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। নোশাবার বাবা তার মেয়ের চালচলনে অসন্তুষ্ট ছিল। তাই তার মেয়েকে তার এক আত্মীয়ের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। এই উপন্যাসে নায়িকা শিক্ষিত ছিল বলেই নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে মাতাল ও খারাপ ছেলেকে বিয়ে করতে চায়নি। এই উপন্যাসে লেখকের উদ্দেশ্য হলো যে, বাবা মা বিয়ের ক্ষেত্রে কোনও ভুল পদক্ষেপ নিলে তবে তারা এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে যেন ভয় না পায়।[১৮৬]

উপরের উপন্যাসগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরশার তার উপন্যাসে যতগুলো চরিত্র তুলে ধরেছেন, সেগুলো মানুষের জীবনের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। তার উপন্যাসে তিনি কিছু কিছু চরিত্রকে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরেছেন। যেমন ' ফাসানায়ে আজাদ' উপন্যাসে আজাদ ও হুসনে আরার' চরিত্র সৌন্দর্যের এবং প্রেমময় একটি চরিত্র। হুসনে আরা ও আজাদের চরিত্র সম্বন্ধে প্রেমপাল অশোক লিখেছেন-

"حسن آرا اور آزاد کے کردار ہمیں اس عہد کے نہیں۔ بلکہ آج کے زمانے کے نمائندے نظر آتے ہے۔"[১৮৭]

আবার কিছু কিছু চরিত্রকে তিনি শিক্ষিত হিসেবে তুলে ধরেছেন। যেমন 'কামিনী' উপন্যাসে কামিনী এবং 'কড়ম ধম' উপন্যাসে নোশাবা উল্লেখযোগ্য। রতন নাথ সরশার তার উপন্যাসে যেমন ভালো চরিত্রগুলো তুলে ধরেছেন তেমনি খারাপ চরিত্রগুলোও তুলে ধরেছেন। যেমন মদ্যপায়ী হিসেবে 'হাশু' উপন্যাসে নায়ক লালা, জামে সরশার' উপন্যাসের নায়ক নবাব আমিন উদ্দৌলা এবং 'সায়রে কোহসার' উপন্যাসের নায়ক নবাব মোহাম্মদ আশকরী এই চরিত্রগুলোকে লেখক তার উপন্যাসে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

রতন নাথ সরশারের উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি লক্ষ্মৌর পরিবেশ এবং লক্ষ্মৌর দৃশ্যাবলী চিত্রায়িত করেছেন। তিনি দৃশ্যাবলীর সাথে চরিত্রগুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যাতে তা জীবন্ত মনে হয়। এ প্রসঙ্গে প্রেমপাল অশোক বলেছেন-

"انھوں نے اپنے طرز بیان سے منظر نگاری کی ایک لاثانی پیش کی۔ ان کی منظر نگاری میں چلتے پھرتے۔ بھاگتے دوڑتے، کھلتے کودتے اور ہنستے بولتے انسان نظر آتے ہیں۔"[১৮৮]

রতন নাথ সরশারের উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণ করলে আরো দেখা যায় যে, তার ভাষাগুলো ছিল সহজ-সরল, সাবলীল ও প্রাঞ্জল। তিনি তার উপন্যাসে বাগধারা এবং কবিতাও ব্যবহার করেছেন যেন পাঠক মনে তা সহজে উপলব্ধি হয়।

রাজেন্দ্র সিং বেদিঃ উর্দু গদ্য সাহিত্যে রাজেন্দ্র সিং বেদি এক সমুজ্জ্বল ঔপন্যাসিক। তিনি তার লেখনী দিয়ে উর্দু সাহিত্যে তার একটি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছেন। এই প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ১ সেপ্টেম্বর লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন।[১৮৯] তার মায়ের নাম শিবা দেবী, ব্রাক্ষ্মণ বংশের ছিলেন। বাবার নাম হীরা সিংহ খতবী সিং ছিলেন ।[১৯০] তার বাবা ডাক বিভাগে চাকরি করতেন। বেদির ভাইয়ের নাম হরবানস সিং।[১৯১] পাঁচ বছর বয়সে তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের গল্পের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। ছোটবেলায় তার মা অসুস্থ্য থাকায় তিনি স্কুলে যেতেন না। তবে বাড়িতে অনেক বই, ম্যাগাজিন ও উপন্যাস ছিল তা তিনি তার বাবার কাছ থেকে মনোযোগ সহকারে শুনতেন। তিনি লাহোরে উর্দুতে পড়াশুনা করেন। তিনি একজন পাঞ্জাবি পরিবারের ছিলেন। তিনি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ১১ নভেম্বর ভারতের মুম্বাই-এ মৃত্যুবরণ করেন।[১৯২] রাজেন্দ্র সিং বেদি ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য রচনা শুরু করেছিলেন।[১৯৩] তিনি একটি মাত্র উপন্যাস লিখে উর্দু গদ্যসাহিত্যে অবদান রেখেছেন। তার উপন্যাসটির নাম হলো- ایک چادر میلی سی (এক চাদর মেলী সী)। লেখকই এই উপন্যাসে হিন্দুস্তান ও হিন্দুস্তানী মানুষের জীবনী খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।[১৯৪] এই উপন্যাস শুধুমাত্র দেড়শ পাতার একটি সংক্ষিপ্ত উপন্যাস।[১৯৫] এটি প্রথমে লাহোরে "নুকুশ" পত্রিকায় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৯৬] এই উপন্যাসটি একটি গ্রামীণ জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র হলো মঙ্গল ও রানু। রানুর একটি সাজানো সংসার ছিল যার সদস্য ছিল তার স্বামী, ছেলে, মেয়ে, শ্বশুর, শ্বাশুড়ি ও দেবর। তার স্বামী ঘোড়ার গাড়ি চালাতো। স্টেশনে যারা আসতো তাদেরকে থাকার জন্য ধর্মশালায় নিয়ে আসতো। ধর্মশালার মালিক ছিল চৌধুরি যে অবৈধ ব্যবসা করতো, তার সাথে ছিল এক পণ্ডিত নামধারি লম্পট। রানুর স্বামী ছিল মদ্যপায়ী এবং সে স্টেশন থেকে লোকজনকে নিয়ে চৌধুরির ধর্মশালায় নিয়ে যেতো এবং এর জন্য সে কিছু টাকাও পেতো।

একদিন সে একটি মেয়েকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে তুমি কোথায় যাবে? মেয়েটি বললো, আমার ভাই আগের স্টেশনে থেকে গেছে। সে কালকে আসবে। এ কথা শুনে রানুর স্বামী মেয়েটিকে চৌধুরির ধর্মশালায় নিয়ে আসে। চৌধুরি ও পণ্ডিত তার সাথে অসামাজিক আচরণ করে এবং মেয়েটি মারা যায়। তারপর সেই মেয়েটিকে রানুর স্বামী তার ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যেতে থাকে। এদিকে মেয়েটির ভাই সেই গাড়িটিতে তার বোনকে মৃত অবস্থায় দেখে সে রানুর স্বামীকে মারামারির এক পর্যায়ে হত্যা করে। এতে ছেলেটির দুই বছর জেল হয়। এদিকে রানুর স্বামীর মৃতদেহ বাড়িতে আনলে সবাই কাঁদতে থাকে এবং রানু পাগলের মতো মাতম করতে থাকে। মঙ্গল এখন তাদের বাড়ির একমাত্র উপার্জনক্ষম ছেলে। সে তখন তার ভাইয়ের ঘোড়ার গাড়ি চালাতো। মঙ্গলের সাথে রাজি নামে একটি মেয়ের সাক্ষাত হয়েছিল এবং সে তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল।

রানুর স্বামীর মৃত্যুর পরে রানুকে তার শ্বাশুড়ি দেখতে পারতো না, তাকে ডাইনি বলে ডাকতো, তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে চাইতো।

মঙ্গল ও রানুর সম্পর্ক ছিল দেবর ও ভাবি। তাদের সম্পর্কও ভালো ছিল। একদিন মঙ্গল ঘোড়ার গাড়ি চালাতে যায় সেখানে একজন লোক তার ভাইয়ের নামে খারাপ কথা বললে সে মারামারির এক পর্যায়ে পুলিশ তাকে জেলখানায় ধরে নিয়ে যায়। এদিকে রানুর সংসারে রোজগারের আর কেউ নেই। তাদের অনেক অভাব। অভাবের তাড়নায় রানু ছেলে মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে দোকানে ধার করতে গেলে তাকে সবাই কটুক্তি করে। তারপর সে ইটের ভাটায় কাজ করে। সেখানে একজন খারাপ লোক তার সাথে অশোভন আচরণ করে। সেটি মঙ্গল দেখতে পেয়ে তার ভাবিকে উদ্ধার করে বাসায় নিয়ে আসে এবং সে কাজ করে সংসার চালাতে থাকে। একদিন গ্রামে পঞ্চায়েত ডেকে বলে, রানু ও মঙ্গলের বিয়ে দিতে হবে। একথা শুনে তারা কেউই রাজি ছিল না। গ্রামের গুরুজনদের কথা শুনে তার বাড়ির পাশের একটি মেয়ে চিনু রানুকে বলল, তুমি মঙ্গলকে বিয়ে করো। রাজেন্দ্র সিং বেদি তাদের দু'জনের কথোপকথন এভাবে তুলে ধরেছেন-

"نہیں چنوں نہیں رانو نے اس کے سامنے دکھڑا روتے ہوئے کہا۔ وہ بچہ ہے میں نے کبھی اسے ان نظروں سے نہیں دیکھا۔"
چنوں بولی۔ دیکھ۔ تجھے اس دنیا میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا؟ اس پیٹ کا نرک بھرنا ہے کہ نہیں بھرنا، اپنی اس شرم کو ڈھانپنا ہے کہ نہیں ڈھانپنا؟ بڑی آئی ہے نظروں والی۔"[১৯৭]

তারপর গ্রামের গুরুজনরা তাদের দুজনকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়ের দিন তাদের মাথার উপর একটি চাদর মেলে দিয়েছিল। মঙ্গল এ বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। কারণ সে রাজিকে ভালোবাসত। রাজি যখন শুনতে পায় যে, মঙ্গল বিয়ে করেছে, তখন সে মঙ্গলকে ছেড়ে চলে যায়।

মঙ্গল নেশা করে একরাতে বাসায় ফিরে। সেই রাতে অনেক ঝড় বৃষ্টি হয়। ঝড়ের রাতে তারা দুজনে একে অপরের কাছাকাছি আসে এবং তারপর থেকে তাদের সংসারের জন্যই সবকিছু তারা মেনে নেয়। এদিকে যে ছেলেটি রানুর স্বামীকে হত্যা করেছিল সে তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয় এবং রানুর মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। প্রথমে রানু তার স্বামীর হত্যাকারীর সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি ছিল না, তারপর সবার কথা শুনে রাজি হয়ে যায়। এই উপন্যাসে লেখক গ্রামের চিত্রগুলো খুব সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তুলেছেন। গ্রামের মেয়েরা অসহায় এটি তিনি এ উপন্যাসে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসে রানুর যাওয়ার কোন জায়গা ছিল না এবং শ্বশুর বাড়িতে কোন পরিচয় ছাড়া থাকতে পারবে না বলে গ্রামবাসী তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার দেবরের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেয়। এই উপন্যাস থেকে জানা যায় যে, সে সময় নারীদের কোন ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না।

উপেন্দ্র নাথ অশোকঃ উপেন্দ্র নাথ অশোক উর্দু গদ্যসাহিত্যে এক বিশিষ্ট নাম। তিনি ১৪ ডিসেম্বর ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের জালন্ধরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের এলাহাবাদে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি হিন্দি, উর্দু এবং সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন।[১৯৮] তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। তার সাহিত্যিক জীবন কবিতা দিয়ে শুরু হলেও পরবর্তীতে গদ্য লিখার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটকে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তার রচিত উপন্যাসগুলো হলো- ستاروں کے کھیل (সিতারোঁ কে খেল), پتھر ال پتھر (পাথ্থর আল পাথ্থর), گرتی دیواریں (গিরতি দেওয়ারেঁ), گرم راکھ (গরম রাখ), بڑی بڑی آنکھیں (বাড়ি বাড়ি আঁখে), ایک ننھی قندیل (এক নান্নী কাদিল), شہر میں گھومتا آئینہ (শহর মে ঘোমতা আয়না)।[১৯৯]

জমনা দাস আখতারঃ জমনা দাস আখতার ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ২রা নভেম্বর পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে ইহলোকে আসেন এবং ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তিনি উর্দু ছাড়া হিন্দি ও ইংরেজিতেও লিখতেন। তিনি সনাতন ধর্ম হাই স্কুল তারপর ডিএবি কলেজ এবং রাওয়ালপিণ্ডিতে পড়াশোনা শেষ করেন। তিনি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে সাংবাদিকতায় যোগদান করেন। তিনি ১৯৩১ খ্রি. থেকে ১৯৫৬ খ্রি. পর্যন্ত বন্দেমাতারাম এবং সনাতন ধর্মের প্রচারক ছিলেন।[২০০] তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগের খণ্ডকালীন প্রভাষক হিসেবে কাজ করেছিলেন। তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় পদচারণা করেছিলেন। তবে উপন্যাসে তার অবদান বেশি ছিল। তিনি অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছেন। তার প্রথম উপন্যাসগুলোতে দেশভাগের কারণে পাঞ্জাবিদের বেদনা ও কষ্ট এবং

তাদের সাহস ও ধৈর্য উপস্থাপিত হয়েছে। তার শিল্পকলা ও লেখার ধরনটিও সমৃদ্ধ ছিল। এখনো অবধি তার উপন্যাসের সংখ্যা ৩৬টিরও বেশি।[২০১] তার উপন্যাসগুলো হলো-

آنسو (আঁসু), آگ (আগ), کرنیں (কেরনেঁ), اوس اور نگارے (উস অওর নিগারে), اور وہ بکتی رہی (অওর ওহ বাকতি রাহী), کشمیر کی بیٹی (কাশ্মির কি বেটি), بارہ مولا (বারাহ মূলা), رادھا ایلزابتھ (রাধা ইলিজাবেধ), کالے دھنے گورے بدن (কালে ধনে গোরে বদন), جلن (জ্বলন), پائل (পায়েল), بگولے (বাগুলে), کالے سائے (কালে ছায়ে), کالی گوری (কালি গোরি), بھوانی جنکشن (ভবানি জ্যাঁকশন), دیکھی تیری دنیا (দেখি তেরি দুনিয়া), بلیک میلر (বালিক মাইলর), نیل گگن (নীল গগন), کچھ دھاگے (কুছ ধাগে), عجیب لڑکی (আজিব লাড়কি), پتلی (পুতলি), نیل کنٹھ (নীল কণ্ঠ), چھوٹی سڑک (ছোটি সড়ক), قاتل (কাতিল), پھانسی کی کوٹھری سے (ফাঁসি কি কোঠরি সে) [২০২]

বালুনাত সিং ঃ বালুনাত সিং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের গুজরানওয়ালায় জন্ম নিয়েছিলেন। তার বাবার নাম সরদার লাল সিং। তার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামেই হয়েছিল। তারপর তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করেন।[২০৩] তিনি ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে মৃত্যুবরণ করেন।[২০৪] তিনি হিন্দি ও উর্দু উভয় ভাষাতেই লিখতেন। তার উপন্যাসগুলোতে দেশপ্রেম, স্বাধীনতা, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও দাসত্ব, রোমান্টিকতা, রাজনৈতিক জাগরণ,বর্ণবৈষম্য, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয় পরিণত করা হয়েছে। তার উপন্যাসগুলো হলো-

کالے کوس (কালে কোস), رات چور اور چاند (রাত চোর অওর চাঁদ), اجالا (উজালা), چک پیراں کا جنا (চক প্যারাঁ কা জিনা), ایک معمولی لڑکی (এক মামুলী লাড়কি), عورت اور آبشار (আওরাত অওর আবশার), راوی بیاس (রাবি বিয়াস), آگ کی کلیاں (আগ কি কালিয়া), باسی پھول (বাসি ফুল), راکا کی منزل (রাকা কি মাঞ্জিল) [২০৫]

কৃষণ গোপাল আবিদঃ কৃষণ গোপাল আবিদ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন।[২০৬] তার সাহিত্য জীবন কলেজ থেকে শুরু হয়েছিল। তার কিছু উপন্যাস সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি মিন্টো, বেদি এবং আসমত চুগতায়ির মতো বিখ্যাত লেখক হওয়ার আগ্রহী ছিলেন। তার উপন্যাসগুলোতে তিনি ভারতীয় পরিবারগুলোর পারস্পরিক ব্যবধান এবং মানবিক মূল্যবোধের পতন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেছেন। তার উপন্যাসে একজন ভারতীয় নারীর জীবনের দুঃখগুলো বিশদে বর্ণিত হয়েছে। তিনি তার জীবনে অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছেন। তার উপন্যাসগুলো হলো-

دھرتی کے پھول (ধরতী কে ফুল), برہمن (ব্রাক্ষ্মণ), مسافر (মুসাফির) ১৯৬০ খ্রি., ارموہی (আরমুহি), لکشمی (লাকশমি), کلنک (কলঙ্ক), پوجا (পূজা), ایک ہنسی ہزار آنسو (এক হাঁসি হাজার আঁসু), محبوب کی قسم (মাহবুব কি কসম), دیواری (দিওয়ারী), بوند اور سمندر (বুন্দ অওর সামুন্দর), میرے دشمن میرے دوست (মেরে দুশমান মেরে দোস্ত), تیرا میرا غم (তেরা মেরা গাম)।[২০৭]

Note: the first line reads: دلدل (দিল দিল), گھائل (ঘায়েল) ১৯৫৫ খ্রি., جلن (জ্বলন) ১৯৫৫ খ্রি., ستم (সিতম), دھرتی کے پھول

ঠাকুর পুঞ্ছিঃ ঠাকুর পুঞ্ছি ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ৩১ই ডিসেম্বর কাশ্মিরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন।[২০৮] তিনি জম্মু প্রিন্স অফ দিলজার কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। প্রথমে তিনি রাষ্ট্রীয় খাদ্য ও সরবারহের কেরানি হিসেবে কাজ করেন। পরে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে যোগ দেন। তিনি অসংখ্য উপন্যাস লিখে জনপ্রিয় হয়েছেন। তার উপন্যাসগুলোতে কেবল গ্রামীণ নয় বরং শহরের জীবনযাত্রাও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও আধুনিক ও পুরাতন মূল্যবোধের বিরোধও স্থান পেয়েছে। তার উপন্যাসগুলো কৌতুহল এবং কৌতুহলের পাশাপাশি রোমাঞ্চে পরিপূর্ণ। তার উপন্যসাগুলোতে তিনি জীবনের ছোট ছোট বিষয়ও বর্ণনা করেছেন। ড. মনসুর আহমেদ মনসুর ঠাকুর পুঞ্ছির উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেন-

"ٹھاکر پونچھی نے متعدد ناول لکھے وہ صحیح معنوں میں ناول کے فنکار ہیں۔انھیں ناول کے فن پر بھی عبور ہے اور زبان وبیان پر بھی دسترس حاصل ہے۔وہ انسانی نفسیات کی باریکیوں کو بڑی چابکدستی سے پیش کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔وہ بڑی خوبصورتی سے دیہاتی وشہری زندگی کے مرقعے پیش کرتے ہیں۔اہم سماجی ونفسیاتی مسائل بھی ان کے ناولوں سے جھلک رہے ہیں۔"[২০৯]

ঠাকুর পুঞ্ছি একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। তার উপন্যাসগুলো হলো-

وادیاں اور ویرانے (ওয়াদিয়া অওর বিরানে), یادوں کے کھنڈر (ইয়াঁদু কে খণ্ডর), شمع ہر رنگ میں جلتی ہے (শাম্মা হার রঙ মে জলতি হে), زلف کے سر ہونے تک (জুলফ কে সার হোনে তক), اداس تنہائیاں (উদাস তানহায়িয়া), پیاسی بادل (পিয়াসি বাদল), چاندی کے سائے (চাঁদনি কে ছায়ে), بادل برسے (বাদল বরসে), رات کے گھونگھٹ (রাত কে ঘুংঘট), ڈیڈی (ডেডি), دادیاں اور دیوانے, (দাদিয়া অওর দিওয়ানে), پت جھڑے کے بچھڑے (পত ঝড়ে কে বিছড়ে), قفس اداس ہے (কেফস উদাস হে), یہ رشتے یہ لوگ (ইয়ে রেস্তে ইয়ে লোগ), یہ من بڑا چنچل ہے (ইয়ে মন বড়া চাঞ্চল হে), سورج سمندر میں ڈوبتا ہے (সুরাজ সমন্দর মে ডুবতা হে), اب وہاں نہیں رہتا (আব উহা নেহি রেহতা)[২১০]

মহেন্দ্র নাথঃ মহেন্দ্র নাথ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ভরতপুরে পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ২০শে মার্চ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। তিনি পাঞ্জাবি খত্রী ছিলেন।[২১১] তিনি পাঞ্জাব বিশ্বদ্যালয় থেকে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেছেন। মহেন্দ্রনাথ কবিতা দিয়ে তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। তবে উপন্যাসেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার উপন্যাসগুলোর বিষয় ছিল দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির সমস্যা। মহেন্দ্রনাথ অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছেন। তার উপন্যাসগুলো হলো-

آدمی اور سکے (আদমি অওর সিক্কে), *رات اندھیری ہے* (রাত আন্ধেরি হে), *سورج ریت اور گناہ* (সুরাজ রীত অওর গুন্নাহ), *وعدہ* (ওয়াদা) , *پیار کا موسم* (পিয়ার কা মৌসম), *ایک شمع ہزار پروانے* (এক শাম্মা হাজার পরয়ানে), *منزل ایک مسافر دو* (মাঞ্জিল এক মুসাফির দো), *تیری صورت میری آنکھیں* (তেরি সুরাত মেরি আঁখে), *روپا* (রূপা), *درد کا رشتہ* (দার্দ কা রেস্তা). *ارمانوں کی سیج* (আরমানোঁ কি সিজ) , *دو دل ایک کہانی* (দো দিল এক কাহানি), *زیرو سے ہیرو تک* (জিরো সে হিরো তক), *پیاسا بادل* (পিয়াসা বাদল), *داستان میری ذکر تیرا* (দাস্তান মেরি জিকর তেরা)[২১২]

নর সিং দাস নার্গিসঃ নর সিং দাস নার্গিস ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আকবর ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস করেন। তিনি একজন দক্ষ সাংবাদিক ছিলেন। তিনি ছোট বেলা থেকে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি *نرملا* (নির্মলা) ও *پاربتی* (পার্বতী) এবং *جانکی* (জানকি) নামে তিনটি উপন্যাস লিখেছেন।[২১৩] তার উপন্যাসগুলো চাঁদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রেমচাঁদের অনুকরণে তিনি উপন্যাস লিখতেন। নিপীড়িত মানুষের দারিদ্রতা, অজ্ঞতা এবং সেই সময়ের নিপীড়ন ও শোষণকে কেন্দ্র করে তিনি অনেক উপন্যাস লিখেছেন। তিনি সামাজিক বিষয়গুলো তার উপন্যাসগুলোর বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন এবং সমাজের উদ্ভাবনগুলোকে চিত্রিত করেছেন। পার্বতী উপন্যাসের মেজাজটি মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাসগুলোর মেজাজের সাথে মিলে যায়। "নির্মলা" উপন্যাসটিতে নিপীড়িত এবং গ্রামীণ নারীদের জীবনী চিত্রায়ন করা হয়েছে। নার্গিস তার জীবনের বেশিরভাগ সময় গ্রাম অঞ্চলে কাটিয়েছেন। সুতরাং গ্রামীণ জীবনের চিত্রগুলো তার উপন্যাসে দেখা যায়।

পণ্ডিত বদরীনাথ সুদর্শনঃ পণ্ডিত বদরীনাথ সুদর্শন ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম পণ্ডিত বদরীনাথ শর্মা এবং সুদর্শন তার কলমি নাম। তিনি ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর হার্ট অ্যাটাক হয়ে মারা যান। তিনি কাশ্মিরী ব্রাক্ষ্মণ ছিলেন। তিনি বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে বাটালা জেলার গুরুদাসপুরে লায়লাবতীকে বিবাহ করেন। প্রথমদিকে

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে কর্মসংস্থানের জন্য কানপুরে গিয়েছিলেন, কিন্তু ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে ফিরে আসেন। মাসিক পত্রিকা চন্দন, ভারত, হক এবং জাট গেজেট এর সম্পাদক ছিলেন। সুদর্শন সাধারণ জনগণের জীবন ভালো করার স্বপ্ন দেখতেন। প্রেমচাঁদের প্রায় আট থেকে দশ বছর পরে সুদর্শন তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। যদিও সুদর্শন প্রেমচাঁদের অনুসারী ছিলেন, তবুও তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। তিনি তার উপন্যাসে শহরের মধ্যবিত্তদের নিয়ে লিখেছেন। তিনি তার জীবনে অনেকগুলো উপন্যাস লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার উপন্যাসগুলো হলো-

بے گناہ مجرم (বেগুনাহ মুজরিম), گناہ کی بیٹی (গুনাহ কি বেটি), اوبے سنگھ (ওবে সিং), پتھروں کا سوداگر (পাথরোঁ কা সওদাগর), راج سنگھ (রাজ সিং), گنج عافیت (গঞ্জে আফিয়াত)।[২১৪]

রমানন্দ সাগরঃ রমানন্দ সাগর ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার পিতামহ পেশোয়ার থেকে পাড়ি জমান এবং কাশ্মিরে স্থায়ী হন। তিনি বিখ্যাত ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনি রামায়ণ সিরিয়াল তৈরি করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি ১২ ডিসেম্বর ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২১৫] তিনি একজন দুর্দান্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবেও পরিচিত। তিনি প্রায় ৪০ বছর সিনেমায় যুক্ত ছিলেন اور انسان مر گیا (অওর ইনসান মর গিয়া) রামানন্দ সাগরের একটি মাস্টারপিস উপন্যাস। এ উপন্যাসটি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসটিতে তিনি দেশ বিভক্ত হওয়ার সময়টিকে তুলে ধরেছেন। তিনি মানুষ ও মানবতা দুটোকে মরতে দেখেছেন। উপন্যাসে একের পর এক মৃত্যুর পরেও জীবিত যারা কল্পিত হয়েও সত্যিকারে চরিত্রগুলোতে স্থান পায়। এই উপন্যাসের প্রথমে খাজা আহমেদ আব্বাস বলেছেন-

"رامانند ساگر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے انسان اور انسانیت کو مرتے دیکھا۔ مگر ساگر کی انسانیت ختم نہں ہوئی۔ یہ انسانیت، یہ انسان دوستی آپ کو اس ناول کے ہر باب ہر صفحے اور ہر سطر میں نظر آئے گی۔ ان کرداروں میں نظر آئے گی جو فرضی ہونے کے باوجود اصلی ہیں۔ جو ناول میں یکے بعد دیگر سے مر جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔"[২১৬]

কাশ্মিরী লাল জাকিরঃ কাশ্মিরী লাল জাকির ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ৭ এপ্রিল পাকিস্তানের গুজরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একসাথে উর্দু, হিন্দি এবং পাঞ্জাবি ভাষায় উপন্যাস লিখতেন। তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। কাশ্মিরী লাল জাকির একজন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক। তিনি উর্দু সাহিত্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস লিখেছেন। সেগুলো হলো-

سیندور کی راکھ (সিন্দুর কি রাখ), سمندر (সমন্দর), صلیب اور وہ (সালিব অওর ওহ), انگوٹھے کا نشان (আঙ্গুঠে কা নিশান), دھرتی سدا سہاگن (ধরতী সদা সুহাগান), لمحوں میں بکھری زندگی (লমহোঁ মে বিখ্রি জিন্দেগী),

کرمان والی (করমান ওয়ালি), آدھی رات کا چاند (আধি রাত কা চাঁদ), ڈوبتے سورج کی کتھا (ডুবতে সুরাজ কি কথা) ।[২১৭]

এক উপন্যাসগুলোর বেশিরভাগই গ্রাম অঞ্চলের চাল চিত্র ও সেখানকার মানুষের জীবনের নানাবিধ সমস্যার কথা উপস্থাপন করা হয়েছে । তার উপন্যাস সম্পর্কে আব্দুল মুগন্নি মন্তব্য করে লিখেছেন-

ان ناولوں کے موضوعات پر ایک نظر ڈالنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ناول نگار ایک بہت حساس، باشعور اور فلاح پسند انسان ہے۔ وہ اپنے زمانے کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے، تاریخ پر اچھی نظر رکھتا ہے، موجودہ سماج کے مسائل سے اس کی دلچسپی بہت گہری ہے اور وہ ان کے حل کے لیے بے قرار ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اعلی انسانی و تہذیبی قدریں بے حد عزیز ہیں۔ لیکن یہ سب خوبیاں محض رومانی جذباتیت پر مبنی نہیں، بلکہ اس کا سرچشمہ ایک زبردست حقیقت پسندی ہے، جو ایک پسندیدہ آدرش کو روبہ عمل میں لانا چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناول نگار اپنی زمین سے بڑی مضبوطی کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ نہ صرف دیہات کی کھلی، صاف اور روشن فضا کا شیدائی ہے، بلکہ گاؤں کی مشکلات سے بھی واقف ہے۔[۲۱۸]

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মিরী লাল জাকিরের শেষ উপন্যাস لال چوک (লাল চোক) প্রকাশিত হয় । উপন্যাসটিতে বহু শতাব্দী ধরে বিদ্যমান সামজিক আন্দোলন এবং হিন্দু মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সাধারণ মূল্যবোধের অবক্ষয়কে চিত্রায়ন করা হয়েছে ।[২১৯]

তেজ বাহাদুর ভানঃ তেজ বাহাদুর ভান ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি একজন বুদ্ধিমান ঔপন্যাসিক ছিলেন । তেজ বাহাদুর سیلاب اور قطرے (ছয়লাব অওর ফিত্রে) শীর্ষক একটি উপন্যাস লিখেছেন, যা ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল ।[২২০] তার উপন্যাসের বিষয় হলো কাশ্মিরী সমাজের দারিদ্র্যে ভরপুর একটি জীবন, যা শাসকশ্রেণির শোষণমূলক ব্যবস্থা দ্বারা শোষণ ও পদদলিত হয় ।

মালিক রাম আনন্দঃ মালিক রাম আনন্দ ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ৫ মে জন্মগ্রহণ করেন । তিনি পড়াশুনা শেষ করে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন ।[২২১] তিনি ছাত্র জীবন থেকে সাহিত্যে আগ্রহী হন । তিনি তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে এবং তারপরে কথাসাহিত্যে এবং শেষে উপন্যাসের দিকে ঝুঁকে পড়েন । তার উপন্যাসগুলো হলো-

نئے خدا (নয়ে খোদা), بہکتے پھول شبنم آنکھیں (বেহেক্তে ফুল শবনম আঁখে), صلیب اور دیوتا (সালিব অওর দেবতা), اپنے وطن میں اجنبی (আপনে ওয়াতান মে আজনবী) ।[২২২]

বিজয় সুরীঃ বিজয় সুরী ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের মীরপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে ৫ই মার্চ জম্মুতে মৃত্যুবরণ করেন। দেশ ভাগের কারণে তাকে জম্মুতে যেতে হয়েছিল এবং সেখানে তিনি মেট্রিক পাস করেন। প্রথমে তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। তারপর তিনি নাটক বিভাগে আন্তঃমহাদেশীয় হিসেবে যোগদান করেন। তিনি একজন সফল ঔপন্যাসিক। তার প্রথম উপন্যাস ایک ناؤ کاغذ کی (এক নাও কাগজ কী)। এটি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২২৩] এই উপন্যাসটিতে এমন সব উপাদান রয়েছে যা অবশ্যই একটি সফল উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায়। এই উপন্যাসটি প্রেম বিষয়ে রচিত। এই উপন্যাসের নায়িকা জোয়ালা এবং নায়ক পাল। তারা দুজনে কলকাতায় পালিয়ে বিয়ে করে; কিন্তু নায়িকার বাবা তাকে জোর করে নিয়ে এসে নায়কের ধোকাবাজ বন্ধু দর্শনের সঙ্গে বিয়ে দেয়। ফলে নায়িকা আত্মহত্যা করে।

জ্যোতিশ্বর পথকঃ জ্যোতিশ্বর পথক ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর জম্মুতে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম জ্যোতি প্রকাশ গণ্ডোত্রা এবং কলমি নাম জ্যোতিশ্বর পথক। তিনি ইংরেজিতে এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন। জ্যোতিশ্বর পথক উর্দু উপন্যাসগুলোর বিবর্তনে একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। তিনি ہجوم (হিজুম) এবং میلی عورت (মেলি আওরাত) নামে দুইটি উপন্যাস লিখেছেন।[২২৪] তার উপন্যাসের বিষয় হলো সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়।

আনন্দ লেহেরঃ আনন্দ লেহের একজন সুপরিচিত ঔপন্যাসিক। তিনি ২ জুলাই ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে পুঞ্চুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সরকারি কলেজ থেকে বি. এস. সি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল. এল. বি ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর তিনি ওকালতি পেশায় যোগদান করেন।[২২৫] তার উপন্যাসগুলোতে তিনি মানবিক মূল্যবোধের প্রচার এবং পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বোধকে প্রসারিত করার উপর জোর দিয়েছেন। আনন্দ লেহেরের نمدیو (নমদিয়ো) একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। এই উপন্যাসের কারণে তিনি জম্মু ও কাশ্মির সংস্কৃতি একাডেমি থেকে একটি পুরস্কারও পেয়েছেন। তিনি একটি বিশেষ পরিবেশ তৈরি করেছেন, বিশেষত মানবজীবন এবং যৌন মনোবিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। 'নমদিয়ো' উপন্যাস ছাড়া তার অন্যান্য উপন্যাস হলো- اگلی عید سے پہلے (আগলি ঈদ সে পেহেলে), سرحدوں کے بیج (সারহাদোঁ কে বীজ), مجھ سے کیا ہوتا (মুজ সে কেয়া হোতা), یہی سچ ہے (ইয়েহি সাচ হে)।[২২৬]

দীপক কানুলঃ দীপক কানুল তার সাহিত্যিক নাম এবং তার আসল নাম দীপক কুমার কোল। তিনি ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ১৯ জানুয়ারি কাশ্মিরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীনগরে তার পড়াশোনা শেষ করেন। দীপক কানুল একজন গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক। دردانہ (দর্দানা) শিরোনামে তার উপন্যাসটি এমন একটি উপন্যাস যেখানে কাশ্মিরী পরিবেশ এবং সীমান্ত অঞ্চলগুলোর উল্লেখ আছে। উপন্যাসের প্লটটি গুলমর্গ এর পার্বত্য অঞ্চল থেকে শুরু করে পাকিস্তানের সীমান্তের পল্লী পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। এই উপন্যাসটি স্থানীয় পরিবেশ এবং বায়ুমণ্ডলের বৈচিত্রময় দৃশ্যের বর্ণনা সম্বলিত । দীপক কানুল দর্দানা ছাড়া আরো অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছেন। সেগুলো হলো-کشمکش (কাশমাকাশ) ১৯৭১ খ্রি., تماشہ (তামাশা) ১৯৮০ খ্রি. , نیا سفر (নয়া সফর) ১৯৮৫ খ্রি., ترنگ (তরঙ্গ) ১৯৮৪ খ্রি. ।[২২৭]

দত্ত ভারতীঃ দত্ত ভারতী ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে মে ধরনীতে আসেন এবং ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ধরনী ছেড়ে চলে যান। তার আসল নাম ব্রাহ্মদেবী দত্ত এবং সাহিত্যিক নাম দত্ত ভারতী। তিনি আরিয়া হাই স্কুল লুধিয়ানা পাঞ্জাব থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে সেন্ট্রাল অর্ডিন্যান্স ডিপোতে চাকরি করতেন। শৈশবকাল থেকে ভারতী লিখার প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি অনেকগুলো উপন্যাস লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার উপন্যাসগুলো নিচে দেওয়া হলো-

تڑپ (তড়প) ১৯৫১ খ্রি., جانور (জানোয়ার) ১৯৫৭ খ্রি., چاندنی اور تنہائی (চাঁদনি অওর তানহায়ি) ১৯৫৮ খ্রি., عمر رفتہ (ওমর রফতা) ১৯৬৩ খ্রি., کاغذ کا لباس (কাগজ কা লেবাস) ১৯৬৩ খ্রি., تینتیس برس (তেঁইতিস বার্স) ১৯৬৩ খ্রি. ।[২২৮]

মোদন মোহন শর্মাঃ মোদন মোহন শর্মা একজন কিংবদন্তি ঔপন্যাসিক। তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানের মীরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তার দুটি উপন্যাস پیاسے کنارے (পিয়াসে কিনারে), ایک منزل چار راستے (এক মঞ্জিল চার রাস্তে) শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।[২২৯] এই দুটি উপন্যাসই কাশ্মিরী নাগরিকদের জীবন, দৈনন্দিন সমস্যা, জীবনের অসমতা এবং সামাজিক বৈষম্য, সম্পদের অসম বণ্টন ইত্যাদির একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি।

ডক্টর নরেশঃ ডক্টর নরেশ উর্দু উপন্যাসের আরেকটি সমুজ্জ্বল নাম। তিনি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ৭ই নভেম্বর পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উর্দু ও হিন্দিতে এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি ভাষার প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন। ডক্টর নরেশ উপন্যাসে

বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তার উপন্যাসগুলো হলো- پتھروں کا شہر (পাথরোঁ কা শহর) ১৯৮৬ খ্রি., درد کا رشتہ (দার্দ কা রেশতা) ১৯৮৭ খ্রি., کستوری کنڈل بے (কাস্তুরি কণ্ডল বে) ১৯৮৯ খ্রি.।[২৩০]

আশা প্রভাতঃ আশা প্রভাত উর্দু গদ্য সাহিত্যের একজন স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক। তিনি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ২১ শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি উর্দু ও হিন্দি দুইটি ভাষাতেই লিখতেন। আশা প্রভাত উপন্যাস লেখার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তার উপন্যাসগুলো হলো- دھند میں اگا پیڑ (ধান্দ মে উগা পেড়), جانے کتنے موڑ (জানে কিতনে মোড়)।[২৩১]

শরণ কুমার বার্মাঃ শরণ কুমার বার্মা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ৩ই মে লক্ষ্মৌতে জন্ম নিয়েছিলেন এবং ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ২৮ শে নভেম্বর অমৃতসরে তার মৃত্যু হয়েছিল। তিনি অমৃতসরে বি. এ এবং এল. এল. বি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং অমৃতসরে আইনের অনুশীলন করেছিলেন। শরণ কুমার বার্মা সেই সময়ের অন্যতম ঔপন্যাসিক। তিনি বরাবরই পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের সাথে যুক্ত ছিলেন, সেজন্য তিনি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে লিখতেন। তার বিখ্যাত উপন্যাস دیوار (দেওয়ার) যা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৩২]

নন্দ কিশোর বিক্রমঃ নন্দ কিশোর বিক্রম ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের রাওয়াল পিণ্ডিতে চোখ খুলেছেন। তার আসল নাম নন্দ কিশোর দত্ত এবং তার সাহিত্যিক নাম নন্দ কিশোর বিক্রম। তিনি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারসিতে এম. এ এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দুতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন।[২৩৩] পড়াশোনা শেষ করে তিনি সাংবাদিকতা পেশায় যুক্ত ছিলেন। তিনি একজন সৎ ও ভালো মানুষ ছিলেন। তার উপন্যাস انیسویں ادھیائے (উনিসবিঁ অধ্যায়) এতে তিনি গীতার ১৮ অধ্যায় এর ১ এবং ১৯ অধ্যায় যুক্ত করেছেন যাতে তিনি মানুষের ভাগ্যকে বাস্তবকে রূপদান করেছেন। এছাড়া তার আরেকটি উপন্যাস হলো یادوں کے کھنڈر (ইয়াদোঁ কে খণ্ডর) যা ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

সুরেন্দর প্রকাশঃ সুরেন্দর প্রকাশ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৬ শে মে পাকিস্তানের লয়েলপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০২ খ্রিস্টাব্দে ৮ই নভেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।[২৩৪] তিনি কখনো রিক্সা চালাতেন আবার কখনো ফুল বিক্রি করতেন। তবুও তার উপন্যাসের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। সেই

আগ্রহের কারণেই তিনি মাত্র তিনটি উপন্যাস লিখেছেন। সেগুলো হলো فسان (ফাসান), نڈی دل (নাডি দিল) এবং نامکمل (না মোকাম্মেল)।[২৩৫]

শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্যঃ শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্য ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ শে আগস্ট বাংলাদেশের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বাঙালি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তার প্রাথমিক শিক্ষা ফরিদপুরে হয়েছিল। তার বাবার বদলির কারণে হায়দ্রাবাদে পঞ্চম শ্রেণি এবং সেকেন্দ্রাবাদে মাধ্যমিক পাস করেন। তিনি উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছাত্র অবস্থায় তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। তিনি উপন্যাস লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার উপন্যাসগুলো হলো- دھرتی سے آکاش تک (ধরতী সে আকাশ তক) এবং منزل کہاں ہے تیری (মঞ্জিল কাহাঁ হে তেরি)।[২৩৬]

সত্বীয়াপাল আনন্দঃ সত্বীয়াপাল আনন্দ ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে এপ্রিল পাকিস্তানের চাকুওয়ালায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চাকুওয়ালায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় চণ্ডিগড় থেকে ইংরেজিতে এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং ইংরেজিতে পিএইচডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি উর্দু, ইংরেজি, হিন্দি ও পাঞ্জাবি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি তার জীবনে অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছেন। তার উপন্যাসগুলো হলো- موت اور زندگی (মওত অওর জিন্দেগী) ১৯54 খ্রি., صبح دوپہر شام (সুবাহ দোপেহের শাম) ১৯৫৮ খ্রি., چوک گھنٹہ گھر (চোক ঘন্টা ঘর) ১৯৯১ খ্রি., شہر کا ایک دن (শহর কা এক দিন) ১৯৯০ খ্রি., اہٹ (আহট) ১৯৫৬ খ্রি., عشق (ইশক)।[২৩৭]

দিলীপ সিংঃ দিলীপ সিং তার প্রকৃত নাম এবং বাদল তার উপাধী। তিনি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ১১ নভেম্বর পাকিস্তানের গোজরাওয়ালাতে জন্মগ্রহণ করেন।[২৩৮] তিনি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ই আগস্ট মারা যান। দিলীপ সিং দীর্ঘদিন পর লেখালেখি শুরু করেছিলেন। তিনি উর্দু, ফারসি, পাঞ্জাবি এবং ইংরেজিতে দক্ষ ছিলেন। তিনি উপন্যাস লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তার উপন্যাস হলো-دل دریا (দিল দরিয়া)। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র মোহনসিং যার মন দরিয়ার মতো উদার এবং ভালোবাসায় পরিপূর্ণ।[২৩৯]

গুলশান খান্নাঃ গুলশান খান্না উর্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবি এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তার আসল নাম গুর নাম খান্না এবং সাহিত্যিক নাম গুলশান খান্না। তিনি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে ১২ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের হাফিজাবাদে জন্ম নেন। তিনি ইংরেজিতে এম. এ পাস করেন। তিনি ছাত্র অবস্থায় তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন। তিনি نادان (নাদান) নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন।[২৪০]

পুষ্করনাথঃ পুষ্করনাথ ১৯৩৪খ্রিস্টাব্দে শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম পুষ্পরনাথ তপু। তিনি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৯ই সেপ্টেম্বর জম্মুতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৪১] তিনি জম্মু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি প্রথমে কাশ্মিরের অফিসে চাকরি করতেন এবং কাশ্মির থেকে জম্মুতে স্থানান্তরিত হন। তিনি শৈশব থেকে জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি আধুনিক সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন। তিনি دشت تمنا (দাশতে তামান্না) নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন।

অনিল ঠাকুরঃ অনিল ঠাকুর ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের ৬ই জুন গুজরাতে জন্ম নেন। তার আসল নাম চতরভুজ ঠাকুর এবং সাহিত্যিক নাম অনিল ঠাকুর। তিনি অভিনয়, পরিচালনা ও ব্যবসা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে একজন নাট্যকার। তবে তিনি একটি উপন্যাস اوس کی جھیل (আওস কি ঝিল) নামে লিখেছেন যা ২০০২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪২]

কিরণ কাশ্মিরীঃ কিরণ কাশ্মিরী ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে চোখ খুলেছেন এবং তিনি ২৬ ডিসেম্বর ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন।[২৪৩] তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সাহিত্যের উপযোগিতা এবং মানব জীবনের প্রতিনিধিত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন। তার উপন্যাসে রোমান্টিকতা পাওয়া যায়। তার উপন্যাসগুলো হলো-رات اور زلف (রাত অওর জুলফ) ১৯৮২ খ্রি., خوابوں کے قافلے (খাবোঁ কে কাফেলে)।

জতীন্দ্র বিল্লুঃ জতীন্দ্র বিল্লু ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই নভেম্বর পাকিস্তানের পেশোয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। জতীন্দ্র বিল্লুকে দেশভাগের কারণে হিজরত করতে হয়েছিল, প্রথমে তিনি মুম্বাই এসেছিলেন এবং ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডনে চলে আসেন। তিনি উপন্যাস লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার উপন্যাসগুলো হলো- پرائی دھرتی اپنے

لوگ (পারায়ি ধরতী আপনে লোগ) ১৯৭৭ খ্রি., مہانگر (মহানগর) ১৯৯০ খ্রি.. وشواس گھات (বিশ্বাস ঘাত) ২০০৩ খ্রি.।[২৪৪]

ডা. কেওয়াল ধীরঃ ডা. কেওয়াল ধীর ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ৫ই অক্টোবর পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উর্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবি ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি পাটনা থেকে মেডিসিনে ডিগ্রী অর্জন করেন এবং তিনি পাঞ্জাব সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে চাকরি করেন। তিনি একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন। তিনি شیشے کی دیوار (শিশে কি দিওয়ার) নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন।[২৪৫]

অমর মাল মুহীঃ অমর মাল মুহী ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৯ শে ডিসেম্বর কাশ্মিরে জন্ম নেন। তিনি ইতিহাসে এম এ এবং ইংরেজিতে পিএইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি উপন্যাসে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। তার একটি উপন্যাস کچلے پھول (কুচলে ফুল) যা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[২৪৬]

সুব্রত লাল ব্রাক্ষ্মণঃ সুব্রত লাল ব্রাক্ষ্মণ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে ২৩ শে ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। তার পুরো নাম দাতা দয়াল মহার্শি সুব্রত লাল ব্রাক্ষ্মণ। তিনি স্নাতকোত্তর পাস করেন। শিক্ষা শেষ করে তিনি প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্টির অধীনে নিষ্ঠার সাথে যুক্ত হন। তারপর তিনি একটি চাকরি গ্রহণ করেন এবং সাথে সাথে অসংখ্য পত্রিকা ও ম্যাগাজিন এর সাথে যুক্ত ছিলেন। কিছু সময় তিনি সুপরিচিত পত্রিকা 'যামানার' সম্পাদকও হয়েছিলেন। তার পরে তিনি কাজটি নারায়ণ নিগমের হাতে তুলে দেন। তার স্ত্রীর অকাল মৃত্যু তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্থ করে তুলেছিল এবং তিনি বাড়ি ছেড়ে হরিদ্বার চলে যান। সেখানে কিছু দয়ালু লোকের সংস্পর্শে আসেন এবং নিজেকে সামলিয়ে নেন। তারপর তিনি আবার বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়েন এবং নিজের একটি পত্রিকা বের করেন। তিনি গোপিগঞ্জ মির্জাপুরে নিজের একটি আশ্রমও খুলে ছিলেন। যদিও তিনি কিছু ভাষাতে দক্ষ ছিলেন তবুও তিনি উর্দুতে লিখতে বেশি পছন্দ করতেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তাকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করে। সুব্রত লেখালেখির প্রতি আগ্রহী ছিলেন; কিন্তু তিনি বেশি লেখালিখি করতে পারেননি। তিনি মাত্র একটি উপন্যাস লিখেছেন যা شاہی لکڑہارا (শাহী লাকড় হারা) নামে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসটি তার জামাই ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ২০ই মার্চ লাহোরে প্রথমে প্রকাশ করেছেন। এই উপন্যাস লিখতে তার স্ত্রীও সাহায্য করেছেন। এই উপন্যাসটি হিন্দিতেও প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪৭]

ব্রজ মোহন দাতাতরিয়া কাইফীঃ ব্রজ মোহন দাতাতরিয়া কাইফী একজন নাম করা ঔপন্যাসিক ছিলেন। তিনি نہتارانایاروواداری নেহতা রানা ইয়ার ওয়াদারী) নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন যা ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪৮]

পণ্ডিত কিশণ প্রসাদ কোলঃ পণ্ডিত কিশণ প্রসাদ কোল ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপরে গোপাল কৃষণ গোখলের সার্ফস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে যোগদান করেন এবং পাঁচ বছর পুনেতে প্রশিক্ষণ নেন। কিশন প্রসাদকে লক্ষ্মৌ প্রেরণ করা হয়েছিল। আগ্রায় থাকার কারণে পণ্ডিতের মাতৃভাষা ছিল উর্দু যা লক্ষ্মৌর পরিবেশ দ্বারা আরো স্থায়ী হয়েছিল। তিনি লেখালেখির প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি উপন্যাস লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তার উপন্যাসগুলো হলো-

مجبوروفا (মজবূর ওফা), سادھواوربیسوا (সাধু অওর বিসুয়া) ও شاما (শামা)। এই তিনটি উপন্যাসই ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪৯]

গোবিন্দ প্রসাদ আফতাবঃ গোবিন্দ প্রসাদ আফতাব ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে চোখ খুলেছেন এবং ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে চোখ বন্ধ করেছেন। তিনি ছিলেন কায়স্থ বংশের। তিনি লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। প্রসাদ আফতাব শৈশবকাল থেকেই বুদ্ধিমান ছিলেন এবং তার সাহিত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। তিনি একজন সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন। তিনি অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছেন। তার উপন্যাসগুলো হলো- شہزادی ہند (শাহজাদি হিন্দ) ১৯১৯ খ্রি., نورافتاب (নূরে আফতাব) ১৯১৫ খ্রি., سلیم وسیتا (সেলিম ও সিতা), چندرموہن (চন্দ্র মোহন)।[২৫০]

মজলূম কেথালুবীঃ মজলূম কেথালুবী ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ শে আগস্ট জন্ম নেন। তার আসল নাম নন্দলাল, কলমি নাম মজলূম কেথালুবী। তিনি উর্দু গদ্য সাহিত্যে جگرکے پھپھولے (জিগর কে ফিফলে) শিরোনামে উপন্যাস লিখেছেন যা ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৫১]

শংকর স্বরূপ ভাটনাগীরঃ শংকর স্বরূপ ভাটনাগীর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ৪ই ডিসেম্বর দেহরাদুনে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তার ছোটবেলা থেকে সাহিত্যের প্রতি শখ ছিল। সে শখ থেকে তিনি অনেকগুলো উপন্যাস লিখেছেন। তার উপন্যাগুলো হলো- اندھیرےدورتک

(আন্ধেরে দূর তক) ১৯৮৩ খ্রি., امر کرن (অমর কিরণ) ১৯৮৩ খ্রি., پرموش (পারমুশ) ১৯৮৪ খ্রি., توبہ (তওবা) ১৯৮৬ খ্রি. ।[২৫২]

রামলালঃ রামলাল ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ৩ই মার্চ পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালীতে জন্ম নেন এবং ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর মারা যান। তিনি সনাতন ধর্ম স্কুল মিয়ানওয়ালী থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন এবং তিনি রেলওয়ে স্টেশন লাহোরে চাকরি করতেন। উর্দু উপন্যাসে একটি নির্ভরযোগ্য নাম ছিলো রামলাল। কথিত আছে যে, তিনি কলেজে পড়ার সময় উপন্যাসের শিরোনাম লিখেছেন তাতে তার বাবা রেগে পাতাটি ছিঁড়ে ফেলেন তাতেও তিনি নিরুৎসাহী না হয়ে তার লেখা চালিয়ে যান। যদিও তিনি ছোটগল্পে বেশি অবদান রেখেছেন তবুও উপন্যাসে সামান্য অবদান রেখেছেন। তার উপন্যাসগুলো হলো- کہرا اور مسکراہٹ (কুহরা অওর মুস্কুরাহাট) ১৯৭২ খ্রি., مٹھی بھر دھوپ (মুটঠি ভর ধুপ) ১৯৭২ খ্রি., نیل دھارا (নীল ধারা) ১৯৮০ খ্রি. ।[২৫৩]

এম. এম রাজেন্দ্রঃ এম. এম রাজেন্দ্র ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ২১শে আগস্ট আনবালায় জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম মদন মোহন লাল ভাটনাগীর এবং সাহিত্যিক নাম এম এম রাজেন্দ্র। তিনি ইংরেজিতে ও উর্দুতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তার লেখনী বিভিন্ন ধারার ছিল; তবে তিনি ছোটগল্পে বেশি সাফল্য মণ্ডিত হয়েছেন। তিনি উপন্যাসেও কম দক্ষতা দেখাননি। তিনি যে উপন্যাসগুলো লিখেছেন সেগুলো হলো- آگ و دھواں (আগ ও ধোয়াঁ), رنگ محل (রঙ মহল), گھٹتی بڑھتی دھوپ چھاؤں (গটতি বাড়তি ধুপ ছাঁও) ।[২৫৪]

জোগিন্দরপালঃ জোগিন্দরপাল ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ৫ই সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম লালচাঁদ এবং মায়ের নাম মায়াদেবি।[২৫৫] তিনি ইংজেরিতে এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কেনিয়ার একজন শিক্ষা নিবাসের কর্মকর্তা ছিলেন। তার মাতৃভাষা ছিল পাঞ্জাবি, স্কুলে উর্দু ভাষা শিখেছেন এবং ইংরেজিতে এম এ করেন। অর্থাৎ তিনটি ভাষায় তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তিনি যদিও একজন বিখ্যাত ছোটগল্পকার হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন তবুও তিনি কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। তার উপন্যাসগুলো হলো- ایک بوند لہو کی (এক বুন্দ লহু কি) ১৯৬৩ খ্রি., نادید (নাদিদ) ১৯৮২ খ্রি. ও پار پرے পার পরে) ২০০৪ খ্রি., خواب رو (খোয়াব রো) ১৯৯১ খ্রি. ।[২৫৬]

এম কে মেহতাবঃ এম কে মেহতাব ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে লয়েলপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০3 খ্রিস্টাব্দে ৫ই নভেম্বর দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার আসল নাম মনোহার লাল এবং সাহিত্যিক নাম এমকে মেহতাব। তিনি উর্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবি এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি সনাতন ধর্ম হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক এবং তিনি লাহোরের লয়েলপুরের সরকারি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন এবং পরবর্তী সময়ে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় চণ্ডীগড় থেকে ইংরেজি ও উর্দুতে এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি লুধিয়ানার কয়েকটি স্থানীয় পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। এরপরে তিনি কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ে সহকারি সাংবাদিক হিসেবে চাকরি পেয়েছিলেন। তার সাহিত্য জগতে পদার্পণ উত্তারাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। তার বাবা ফারসি এবং মা পাঞ্জাবি কবিতা চর্চা করতেন। তিনি অনেকগুলো ছোটগল্প লিখেছেন; কিন্তু সেগুলো ছিল হিন্দি ও পাঞ্জাবি ভাষায়, তবে তিনি উর্দু ভাষায় দুটি উপন্যাস লিখেছেন। উপন্যাসগুলো হলো- سیندور کے دام (সিন্দুর কে দাম), جزیرہ (জাজিরা)।[২৫৭]

রতন সিংঃ রতন সিংয়ের জন্ম ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই নভেম্বর পাকিস্তানের শিয়ালকোটে হয়েছিল। তার বাবার নাম সরদার প্রতাপ সিং এবং মায়ের নাম কর্তার কোর। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে রেলওয়েতে চাকরি করতেন।[২৫৮] তবে তার বাবার অসুস্থতার জন্য তাকে চাকরি ছেড়ে দিতে হয়। তারপর তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর পরিচালক হন এবং সর্বশেষে তিনি জাবালপুরে আধুনিক উর্দু পত্রিকার সম্পাদক হন। তিনি তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে তারপর তিনি উপন্যাসের প্রতি আগ্রহী হন। তিনি سانسوں کا سنگیت (সাসোঁ কি সংগীত) এবং دربدری (দার বাদরি) নামে দুটি উপন্যাস লিখেছেন।

মোহন ইয়াবারঃ মোহন ইয়াবার ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে জম্মুতে জন্ম নেন এবং জম্মুতে পড়াশোনা শেষ করেন। তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। মোহনের দেশভাগের আগে সাহিত্যে যাত্রা শুরু হয়েছিল; কিন্তু স্বাধীনতার পরেও তিনি সাহিত্য চর্চা করতে থাকেন। যদিও তিনি ছোটগল্প বেশি লিখেছেন, তবুও তিনি پتھروں کا شہر (পাথরোঁ কা শহর) নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন।[২৫৯]

রামকুমার আবরুলঃ রামকুমার আবরুল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০ শে এপ্রিলে জম্মুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি রেডিও কাশ্মির জম্মুতে চাকরি

পেয়েছিলেন। আবরুল তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন ছোটগল্প দিয়ে; কিন্তু তিনি একটি মাত্র উপন্যাস লিখেছেন, সেটি হলো- سحر ہونے تک (সেহের হোনে তক)।[২৬০]

তাজুর সামরিঃ তাজুর সামরির জন্ম হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের ফজলাবাদে এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ৪ই জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। তার আসল নাম পণ্ডিত সাধুরাম।[২৬১] পড়াশোনা অবস্থায় তিনি কবিতা ও সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন। গরিব পরিবারের সন্তান হওয়ার জন্য তিনি বেশি দূর পড়াশোনায় এগুতে পারেননি, তবে তিনি সাংবাদিকতা ও টিউশন করে রোজগার করতেন। তিনি তার জীবনের বেশিরভাগ সময় অভাব অনটনে কাটিয়েছেন। তবে তিনি কারো নিকট সাহায্য চাইতেন না। এ প্রসঙ্গে গোপাল মিত্তল এর উদ্ধৃতি দিয়ে দিপক বাদকি বলেছেন-

"ان کی زندگی کا بیشتر حصہ مفلسی میں گزرا لیکن انھوں نے کسی کے آگے دستِ سوال دراز نہ کیا۔ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے۔ لیکن ان کا مزاج مومنانہ تھا۔"[২৬২]

তিনি একটি উপন্যাস লিখেছেন, তা হলো- نہتار رانا (নেহতার রানা)।

প্রেমনাথ পর দেশীঃ প্রেমনাথ পর দেশী ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রি. থেকে ১৯৫৫ খ্রি. পর্যন্ত রেডিওতে চাকরি করতেন। অবশেষে ৯ জানুয়ারি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে কোসবায় মৃত্যুবরণ করেন।[২৬৩] প্রেমনাথ পরদেশী স্বাধীনতা পূর্বে রাজ্যে উপন্যাস রচনায় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন উচ্চমানের উপন্যাস লেখক এবং সাহিত্যের এই ধারার প্রতি তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি پوتی (পোতি) নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন, তবে এটি দেশভাগের দাঙ্গার সময় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

হানস রাজ রাহবারঃ হানস রাজ রাহবার ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ৯ মার্চ পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন।[২৬৪] তিনি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুলাই মারা যান। তার আসল নাম হানস রাজ এবং উপাধি রাহবার । তিনি একটি দরিদ্র অশিক্ষিত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জীবনে সফলতা অর্জন করেছেন তার পরিশ্রমের মাধ্যমে। তিনি লুধিয়ায় আরিয়া হাই স্কুল থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মেট্রিক পাস করেন। তারপর ডি. এ. বি কলেজ লাহোরে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (ইতিহাসে) এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। হানস রাজ রাহবার একজন সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ছিলেন। তার উপন্যাসগুলো হলো- تارو (তারো) (১৯৪৭), پریڈ گراونڈ (প্যারেড গ্রিয়াউন্ড)

(১৯৫৪), آنکے بانکے (আনকে বানকে) (১৯৬০), بات کی بات (বাত কী বাত) (১৯৬৮), پرکٹی تنلی (পারকাটি তানলী) (১৯৮১)।[২৬৫]

সালিক রাম সালিকঃ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পণ্ডিত সালিক রাম সালিক প্রথম উপন্যাস রচনা শুরু করেছেন। তিনি দুটি উপন্যাস سالک تحفہ (সালিক তোহফা), روپ جگت داستان (রূপ জগত দাস্তান) লিখেছেন এবং কাশ্মিরী উর্দু উপন্যাসের ভিত্তি স্থাপন করেছেন।[২৬৬]

মোহন লাল এবং বিশ্বনাথ ভার্মাঃ সালিকের পরে যে ঔপন্যাসিকের নাম আসে তিনি হলেন মোহনলাল। তিনি محبت داستان (মহব্বত দাস্তান) নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। এর পরে যার নাম আসে তিনি হলেন বিশ্বনাথ ভার্মা। তিনি حقیقت تلاش (হাকীকত তালাশ) নামে একটি উপন্যাস লিখেন যা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৬৭]

উপরের আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যেতে পারে যে, উর্দু উপন্যাসের ক্ষেত্রে অমুসলিম লেখকদের অবদান প্রশংসনীয়। তারা সমাজ, সমাজের নানান অসংগতি, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ, কুসংস্কার, গোড়ামী ইত্যাদি বিষয়ে উপন্যাস লিখেছেন এবং সমাজ থেকে অন্যায় জুলুম দূরিভূত করার চেষ্টা করেছেন। এই অমুসলিম ঔপন্যাসিকদের সৃজনশীল উদ্যোগ ও শৈল্পিক বিবেচনা করে বলা যেতে পারে যে, তাদের প্রচেষ্টার ফলে উর্দু উপন্যাসের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে এবং উর্দু উপন্যাসের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে।

৩.২ নাটক

সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারা নাটক। নাটক হলো সাহিত্যের এমন একটি শাখা যেখানে জীবনের ঘটনাগুলো বাস্তবে উপস্থাপিত হয়। নাটকের ধারণা মঞ্চের সাথে জড়িত। মঞ্চ দর্শকদের জন্য বিনোদন সরবরাহ করে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটকও সাহিত্যে বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। মূলত: নাটক উপন্যাস ও ছোটগল্পের মতো লিখিত সাহিত্য নয়, যা লিখা ও পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এর আসল উদ্দেশ্য মঞ্চ যেখানে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে মঞ্চে উপস্থাপন করা হয়। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ হোসাইন সাহেব লিখেছেন-

"اسے ڈرامے کو ایک مکمل اکائی کی شکل میں سامنے رکھنا چاہئے۔ادب کی دوسری اصناف کی طرح ڈراما صرف پڑھے جانے کے لئے نہیں ہے اس کا لازمی رشتہ اسٹیج سے ہے (یا پھر عوامی ذاریع ترسیل کے دوسرے طریقوں یعنی فلم۔ ریڈیو۔ یا ٹیلی ویژن سے ہے۔) یعنی ڈرامے پیش کئے جانے کے لئے لکھے جاتے ہیں۔ صرف پڑھنے کے لئے نہیں لکھے جاتے۔اس لئے ڈراموں کو صرف مکالموں کا مجموعہ سمجھنا درست نہیں۔ نہ اسے محض افسانوں کی طرح پڑھنا پڑھانا کافی ہے۔ بلکہ اس کے مکالموں کو اسٹیج پر یا فلم، ریڈو۔ ٹیلی ویژن پر پیش ہونے والے فن پارے کا ڈھانچہ یا اس کا ایک حصہ سمجھ کر پڑھنا چاہئے۔"[২৬৮]

যেহেতু উর্দু সাহিত্যের বেশিরভাগ অংশই ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে যুক্ত এবং ইসলামে নৃত্য ও সংগীতের অপ্রিয়তার কারণে উর্দু নাটকটি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। উর্দু নাটক তার পছন্দ সই জায়গা পায়নি। তবুও সাহিত্যের এই শাখাটি উর্দু সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ড. আব্দুল হকের মতে-

"اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس فن کو حقیر سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے کوئی ترقی نہیں کی۔"[২৬৯]

নাটক এমন একটি গল্প যা অভিনয়ের জন্য লিখা বা অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। নাটক শব্দটি গ্রীক শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে।[২৭০] যার অর্থ চল বা ক্রিয়া। এই গ্রীক ক্রিয়া শব্দের অর্থ 'করণ' বা 'প্রদর্শন'।[২৭১] এই প্রসঙ্গে শেলডন চেইনী এর উদ্ধৃতি দিয়ে ড. মুহাম্মদ শাহেদ হুসাইন লিখেছেন-

"ڈراما اس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں "میں کرتا ہوں" اور جس کا اطلاق "کی ہوئی چیز" پر ہوتا ہے۔"[২৭২]

কেউ কেউ বলেছেন, উর্দুতে নাটক ফারসি থিয়েটার থেকে এসেছে।[২৭৩] আবার কেউ বলেছেন উর্দু নাটকও ইংরেজি বা পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে এসেছে।[২৭৪] উর্দু নাটকের সংজ্ঞা বিভিন্ন সমালোচক বা সাহিত্যিক বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। ড. মুহাম্মদ শাহেদ হুসাইন বলেছেন-

"ڈراما کسی قصے یا واقعے کو اداکاروں کے ذریعے تماشائیوں کے روبرو پھر سے عملاً پیش کرنے کا نام ہے۔"[২৭৫]

কোলারজ এর উদ্ধৃতি দিয়ে ড. শাহনাজ সাবেহ বলেছেন-

"ڈراما حقیقت کا اتار نہیں بلکہ فطرت کی نقالی ہے۔"[২৭৬]

কালিমন হ্যামিলটন এর উদ্ধৃতি দিয়ে ড. শাহনাজ সাবেহ নাটকের সংজ্ঞা এভাবে তুলে ধরেছেন-

"اسٹیج پر سامعین کے سامنے پیش ہونے والی کہانی کہا ہے۔"[২৭৭]

নাটক একটি পুরাতন শিল্প। সাহিত্যের সকল শাখার মধ্যে নাটক অসাধারণ গুরুত্ব বহন করে। নাটক সাহিত্যকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার জন্য অমুসলিম সাহিত্যিকরা অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাদের অবদানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

প্রেমচাঁদঃ উর্দু গদ্য সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন প্রেমচাঁদ। তিনি যেমনভাবে উর্দু উপন্যাস ও ছোটগল্পে দক্ষতার সাথে স্বাক্ষর রেখেছেন। তেমনিভাবে নাটকেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার এর মত উর্দু সাহিত্যে নাট্যকার হিসেবে ততোটা সফলকাম হতে পারেননি। তারপরও তার দুই একটি নাটক উর্দু সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। তিনি বেশি নাটক না লিখলেও চারটি নাটক লিখে উর্দু সাহিত্যে অবদান রেখেছেন। তার রচিত নাটকগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচে দেওয়া হলো-

হুনহার বরদা কে চুকনে চুকনে পাত' নাটকটি তার প্রথম নাটক। যা কখনো প্রকাশিত হয়নি।[২৭৮]

প্রেমচাঁদের প্রকাশিত ও প্রথম রচিত নাটক کربلا (কারবালা) যা নাম থেকেই বুঝা যায় যে, এই নাটকটি কারবালার ঘটনা থেকেই লিখা হয়েছে। এটি তিনি ১৯২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত করেছিলেন এবং এটি ১৯২৪-২৬ খ্রি. পর্যন্ত 'যামানা' পত্রিকায় কানপুরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকে। পরে এটি বই আকারে ছাপা হয়েছে।[২৭৯]

প্রেমচাঁদ এই নাটকটি শুরু করার আগে বিভিন্ন ইসলামী ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরভাবে জেনেছেন এবং এটি নিখুঁতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন যেন কোন ইসলামী মাজহাব ও ইসলামের ইতিহাস বিকৃত না হয়। তিনি তার কিছু মুসলমান বন্ধু ছাড়াও শিয়া গোত্রের মাধ্যমে এই নাটকটি সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছেন। মুন্সী দয়া নারায়ণ নিগম এই নাটক যামানা পত্রিকায় শুরু হওয়ার আগে প্রেমচাঁদ কে চিঠি লিখেছেন যে, শিয়া সম্বন্ধে এমন কোন কিছু নেইতো যা তাদের রাগের কারণ হয়। এই চিঠির উত্তরে প্রেমচাঁদ এভাবে লিখেছেন-

"آپ یقین رکھیں میں نے احترام کہیں نظرانداز نہیں ہونے دیاایک ایک لفظ پراس بات کاخیال رکھاہے کہ مسلمانوں کے مذہبی احساسات کوصدمہ نہ پونچے۔اس کامقدمہ پولٹکل ہے۔باہمی اتحاد کوبڑھانااور کچھ نہیں۔۔۔[২৮০]

প্রেমচাঁদের রচিত দ্বিতীয় নাটক روحانی شادی (রুহানী শাদী)। এতে আটটি দৃশ্য এবং পাঁচটি চরিত্র রয়েছে। চরিত্রগুলো হলো নায়িকা মসন জিনী, সাজগারডন, দালিম, উমা এবং নায়ক হয়োগ রাজ।[২৮১] 'রুহানী শাদী' প্রেমচাঁদের একটি অন্যতম নাটক। এটি সর্বপ্রথম দিল্লীর ইছমত বুক ডিপো

থেকে প্রকাশিত হয়। এটি একটি ট্রাজেডিমূলক (বিয়োগাত্মক) নাটক। লেখক তার উপন্যাসের মতো এই নাটকের মাধ্যমেও সংস্কারমূলক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।[২৮২]

سنگرام (সংগ্রাম) প্রেমচাঁদের সর্বাধিক দীর্ঘ ও সর্বশেষ নাট্যগ্রন্থ। তিনি এ গ্রন্থটি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দি ভাষায় লিখেছেন। পরবর্তীতে এর উর্দু অনুবাদ করা হয়। এই নাটকেও তিনি সাধারণ উপন্যাস ও ছোটগল্পের মতোই গ্রামের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।[২৮৩] এই নাটকের কিছু খারাপ দিক রয়েছে, তা হলো এটি খুব দীর্ঘায়িত নাটক এবং স্টেজে খুব সহজে উপস্থাপন করা যায় না। এ প্রসঙ্গে প্রেমচাঁদ নিজেই সংগ্রামের ভূমিকায় লিখেছেন-

"آج کل ڈرمہ لکھنے کے لئے موسیقی کا جاننا ضروری ہے کچھ شعر کہنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہئے۔ میں ان دونوں باتوں سے کم واقف ہوں پر اس کہانی کا ڈھنگ ہی کچھ ایسا تھا کہ میں اسے ناول کی مشکل میں نہ دے سکتا تھی۔ یہی اس ڈراما کو لکھنے کی خاص وجہ ہے امید ہے کہ پڑھنے والے دل سے میری غلطیوں کو معاف کر دیں گے مجھ سے آئندہ کبھی ایسی بھول نہ ہوگی۔ ادب کے اس میدان میں یہ میری پہلی اور آخری ناکام کوشش ہے۔ مجھے یقین ہے یہ ڈرامہ تھیٹر میں کھیلا جاسکتا ہے وہاں اسٹیج منیجر کو کہیں کہیں کاٹ چھانٹ کرنی پڑے گی۔ میرے لئے ڈرامہ لکھنا ہی کم مشکل نہ تھا اسے اسٹیج کے لائق بنانا تو اور بھی مشکل تھا۔"[২৮৪]

কৃষণচন্দ্রঃ কৃষণচন্দ্র উর্দু গদ্য সাহিত্যে একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি উর্দু সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে শুধু জনপ্রিয়তা অর্জন করেননি, তিনি নাটকেও বিশেষ অবদান রেখেছেন।[২৮৫] কৃষণচন্দ্র রেডিওতে চাকরি করা অবস্থায় কয়েকটি নাটক লিখেছেন, যা دروازہ (দরওয়াজা) সংকলন আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৮৬]

কৃষণচন্দ্রের এই সংগ্রহে ছয়টি নাটক ছিল। যেমন- قاہرہ کی ایک شام (কাহেরা কি এক শাম), دروازہ (দরওয়াজা), بیکاری (বেকারি), نیل کنٹھ (নীল কণ্ঠ), سرائے کے باہر (সারায়ে কে বাহার), دروازہ کھول دو (দরওয়াজা খোল দো) [২৮৭]

'কাহরা কি এক শাম' কৃষণচন্দ্রের একটি জনপ্রিয় নাটক। এই নাটকটি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই নাটকের চরিত্রগুলো হলো- হাসিনা, পরী, সোবেদার, রেওয়াজ, দোকানদার, মাদরাসি, সিপাহি এবং নোকর।[২৮৮]

'দরওয়াজা' ঐ সংগ্রহের ২য়তম নাটক যা ১৭ই আগস্ট ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই নাটকের চরিত্রগুলো হলো- মা, কান্তা, শান্তা, মালিক মাকান এবং আজনবী।[২৮৯]

'বেকারি' কৃষণচন্দ্রের একটি কবি নাটক যা লাহোরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই নাটকের চরিত্রগুলো হলো- ভাইয়ালাল, শিয়াম সুন্দর, আজহার, সিপাহি।[২৯০]

কৃষণচন্দ্রের 'নীলকণ্ঠ' বাস্তবের প্রেক্ষিতে লিখিত একটি নাটক। দরওয়াজা সংগ্রহের মধ্যে সব নাটকের চেয়ে এই নাটকটি কৃষণচন্দ্রের একটি সর্বোৎকৃষ্ট নাটক। কৃষণচন্দ্রের এই নাটকটি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে লিখিত হয়েছিল এবং ২৪ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়েছিল। এই নাটকের চরিত্রগুলো হলো- কোরাস, সুজী পার্বতী, জোগীয়াসো, এক আদারাহ সাচাকরী, গদাগীরজীবন কাতরে এবং সাহোকার।

'সারাহে কে বাহার' কৃষণচন্দ্রের অন্যান্য নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই নাটকের চরিত্রগুলো হলো- আন্ধা ভিকারি, মুন্নি, আন্ধা ভিকারি কি নোজোয়ান লাড়কি, ভিকারিন, আওরাহ শায়ের, সারায়ে কে মালিক, বিবি, সারায়ে কি নোকাদানি, চান্দ শিকারি এবং তাদের বিবিরা।[২৯১]

উপেন্দ্র নাথ অশোকঃ উর্দু গদ্য সাহিত্যে উপেন্দ্র নাথ অশোক একজন অনন্য সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক। তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্পে অসামান্য অবদান রেখে উর্দু গদ্য সাহিত্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে যৎসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। উর্দু নাটকেও তার অবদান কম নয়। তিনি অনেকগুলো নাটক লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি যে নাটকগুলো লিখেছেন, তার সংকলনগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. پاپی (পাপী): উপেন্দ্র নাথ অশোকের জনপ্রিয় নাটকের সংকলন হলো 'পাপী'। এই নাটকের সংকলন ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৯২] এই নাটকের সংকলনের নাটকগুলো হলো- بسیوا (বিসুয়া) حقوق کا محافظ (হুকুক কা মাহাফেজ), کراس (কেরাস), لکشمی کا سواگت (লাকশমী কা সওগাত), باہمی سمجھوتہ (বাহমি সমঝোতা), جونک (জোনাক)।[২৯৩]

২. چرواہے (চরওয়াহে): উপেন্দ্র নাথ অশোকের 'চরওয়াহে' নাটকের সংকলন ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৯৪] এই সংকলনের নাটকগুলো হলো- چرواہے (চরওয়াহে), میمونہ (মাইমুনা), مقناطیس (মাকনাতীস), معجزے (মু'যেজে), چلمن (চলমন), کھڑکی (খিড়কি), سوکھی ڈالی (সুখিডালি)।[২৯৫]

৩. ازلی راستے (আজলি রাস্তে): এই নাটকের সংকলন ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে বোম্বে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংকলনের নাটকগুলো হলো- ازلی راستے (আজলি রাস্তে), صبح شام (সুবাহ শাম), فرزانہ (ফারজানা), چھوٹا بیٹا (ছোটা বেটা)।[২৯৬]

৪. جنت جھلک (জান্নাত ঝলক): জান্নাত ঝলক উপেন্দ্র নাথ আশোকের এক অনন্য সৃষ্টি। এই নাটকটি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৯৭]

৫. قید حیات (কায়দে হায়াত): উপেন্দ্র নাথ অশোকের এই নাটকের সংগ্রহ ১৯৪৭ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এর সাথে শিকারি নাটকও যুক্ত ছিল ।[২৯৮]

৬. پنیترے (পনিতারে): 'পনিতারে' নাটকটি উপেন্দ্র নাথ অশোকের একটি জনপ্রিয় নাটক । এটি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ।[২৯৯]

৭. تولئے (তুলিয়ে): উপেন্দ্র নাথ অশোকের এই নাটকের সংকলন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে প্রকাশিত হয়েছিল ।[৩০০] এই সংকলনের নাটকগুলো হলো- تولئے (তুলিয়ে), نیا پرانا (নয়া পুরানা), کیسا صاب کیسی آیا (কেইসা ছাব কেয়সি আয়া), پرسرام (পারসারাম), پکا گانا (পাক্কাগানা) ।[৩০১]

৮. پڑوسن کا کوٹ (পড়োসন কা কোট): উপেন্দ্র নাথ আশোকের 'পড়োসন কা কোট' নাটকের সংগ্রহ ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদে প্রকাশিত হয়েছিল ।[৩০২] এই সংকলনের নাটকগুলো হলো- پڑوسن کا کوٹ (পড়োনস কা কোট), مقناطیس (মিকনাতীস), بے بات کی بات (বে বাত কি বাত), کھڑکی (খিড়কি), مکشن ریکھا (মিকশন রেখা) ।[৩০৩]

রাজেন্দ্র সিং বেদি উর্দু সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম । উর্দু সাহিত্যে উপন্যাস ও ছোটগল্প কম বেশি সব লেখকই লিখেছেন । কিন্তু নাটক উর্দু সাহিত্যে খুব কম পাওয়া যায় । তবে রাজেন্দ্র সিং বেদি অনেকগুলো নাটকও লিখেছেন । তার নাটকের দুটি সংকলন রয়েছে- سات کھیل (সাত খেল) এবং بے جان چیزیں (বে জান চীজেঁ) । সাত খেল সংকলনে যে নাটকগুলো রয়েছে তা হলো- خواجہ سرا (খাজা সারা), چانکیہ (চানকিয়া), تلچھٹ (তিলছুট), نقل مکانی (নকল মাকানি), آج (আজ), رخشندہ (রুখশন্দাহ) ایک عورت کی نہ (এক আওরাত কি না) ।[৩০৪]

বেজান চীজেঁ সংকলনে যেসব নাটক রয়েছে সেগুলো হলো- کار کی شادی (কার কি শাদি), ایک عورت کی نہ(এক আওরাত কি না), روح انسانی(রুহে ইনসানি), اب تو گھبرا کے (আব তু ঘাবরা কে), بیجان چیزیں (বেজান চীজেঁ) ।[৩০৫]

করতার সিং দাগলঃ করতার সিং দাগল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ১ মার্চ পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ২৪ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন । তার পিতার নাম জীবন সিং দাগল এবং মাতার নাম সতবন্ত কেরি । প্রাথমিক শিক্ষা তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে করেছিলেন এবং পাঞ্জাব বিশ্বদ্যিালয় থেকে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন । তারপর তিনি অল ইন্ডিয়ার রেডিওতে চাকরি পেয়েছিলেন । সেখানে তিনি পাঞ্জাবি ও অন্যান্য ভাষায় প্রোগ্রাম চালিয়ে যান এবং সে সুবাদে অনেক

নাটকও লিখেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় মোট সাতটি নাটক লিখেছেন। তার নাকের সংকলনগুলো হলো-دیا بجھ گیا (দিয়া বুঝ গিয়া), اوپر کی منزل (উপর কি মঞ্জিল)[৩০৬]

ড. স্যামুয়েলঃ ড. স্যামুয়েল ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ১৪ অক্টোবর বিহারের শাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম ড. স্যামুয়েল ভিক্টর ভজন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারসিতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি পেশায় ছিলেন একজন প্রভাষক। তিনি ছোটগল্প দিয়ে তার সাহিত্য জীবন শুরু করলেও একটি মাত্র নাটক লিখেছেন। তা হলো- اجالوں کے بادل (উজালোঁ কে বাদল)।[৩০৭]

ব্রজ মোহন দাতাতারিয়া কাইফীঃ ব্রজ মোহন দাতাতারিয়া কাইফী উপন্যাসে অনেক অবদান রাখলেও তিনি কিছু নাটক লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার জনপ্রিয় নাটকগুলো হলো- مرداری دادا (মুরাদারি দাদা), যা ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তার আরেকটি নাটক হলো- راج دلاری (রাজ দিলারি), যা ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩০৮]

পণ্ডিত কিশন প্রসাদ কোলঃ পণ্ডিত কিশন প্রসাদ কোল উপন্যাসে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তবে তিনি কিছু নাটকও লিখেছেন, যা উর্দু গদ্য সাহিত্যে বিশেষ অবস্থান দখল করে আছে। তার নাটক দুটি হলো- قربانی (কুরবানী) যা ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এবং نشہ (নেশা) যা ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩০৯]

পণ্ডিত বদরীনাথ সুদর্শনঃ পণ্ডিত বদরীনাথ সুদর্শন আসলে একজন ছোটগল্পকার। তিনি ছোটগল্প লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যকে অনেক মর্যাদার অধিকারী করেছেন। কিন্তু তিনি কিছু উপন্যাস লিখেছেন। তবে তিনি একটি মাত্র নাটক লিখে উর্দু সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছেন। তার নাটকটির নাম হলো- چھایا (ছায়া) যা চন্দন ছোটগল্পের সংগ্রহে রয়েছে।[৩১০]

গোবিন্দ প্রসাদ আফতাবঃ গোবিন্দ প্রসাদ আফতাব উর্দু গদ্য সাহিত্যে উপন্যাসে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তবুও তিনি একটি মাত্র নাটক লিখে উর্দু সাহিত্যে তার অবস্থানটা আরো বেশি সুদৃঢ় করেছেন। তার নাটকের নাম হলো- طلسم آئینہ (তালসিম আয়না), যা অপ্রকাশিত ছিল।[৩১১]

প্রেমনাথ পরদেশীঃ প্রেমনাথ পরদেশী উর্দু সাহিত্যে একজন বিশিষ্ট নাম। তিনি উপন্যাস, বিশেষ করে ছোটগল্পে অসামান্য অবদান রেখেছেন। কিন্তু তিনি কিছু নাটক লিখেছেন, যা উর্দু গদ্য

সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি এ নাটকগুলো কাশ্মিরের রেডিওর জন্য লিখেছিলেন। যেমন سوامی সোয়ামী, سنگ تراش সাঙ্গে তারাশ), سنگھرش সংঘর্ষ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৩১২]

তাজুর সামরিঃ তাজুর সামরি ছোটগল্পে যেমন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, তেমনি নাটকেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি অনেকগুলো নাটক রচনা করেছেন। তার রচিত নাটকগুলো হলো- چلو میں الو (চলো মে উল্লু), مراری دادا (মুরারী দাদা), آگ کی گاڑی (আগ কি গাড়ি), ضیافت (জিয়াফত), راج دلاری (রাজ দিলারি) এবং تمثیلی مشاعرہ (তামসিলী মুশায়েরা) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩১৩]

শংকর স্বরূপ ভাটনাগীরঃ শংকর স্বরূপ ভাটনাগীর উর্দু গদ্য সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট নাম। তিনি একাধারে উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটক লিখেছেন। তিনি শুধুমাত্র একটি নাটক লিখে উর্দু সাহিত্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন। তার নাটকের নাম اندھی (আন্ধি), যা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩১৪]

রেতী সরণ শর্মাঃ রেতী সরণ শর্মা উর্দু গদ্য সাহিত্যের আরেকজন বিশিষ্ট নাম। উর্দু গদ্য সাহিত্যে ছোটগল্প ও নাটক লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি উর্দু, হিন্দি ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতেন। তিনি ছোটগল্পের পাশাপাশি নাটকের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি দু'টি নাটক লিখেছেন। যার একটি হলো- پھر وہی تلاش (ফের ওহি তালাশ) এবং اور شام جلتی رہی (অওর শাম জ্বলতি রাহি)।[৩১৫]

বিজয় সুমন সুসানঃ বিজয় সুমন সুসান ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে জম্মুতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। বিজে সুমন সুসান উর্দু গদ্য সাহিত্যের মধ্যে ছোটগল্প এবং নাটক লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি একটি মাত্র নাটক লিখেছেন। তার নাটকটি হলো- انگمان (আনগুমান)।[৩১৬]

রামকুমার আবরুলঃ রামকুমার আবরুল তার সাহিত্য জীবন শুরুকরেছেন ছোটগল্প দিয়ে। কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে নাটকের প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেন। তিনি একজন ভালো অভিনেতা ছিলেন। তার লিখিত নাটকগুলো হলো- دھرتی اور ہم (ধরতী অওর হাম) যা ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

انسان جیت گیا (ইনসার জিত গিয়া) যা ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তার অন্যান্য নাটক হলো- چُکے کے پاٹ (চুকে কে পাট) এবং زندگی اور عورت জিন্দেগী অওর আওরাত)।[৩১৭]

কুমার পাশীঃ কুমার পাশী ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ১৭ সেপ্টেম্বর দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৩১৮] দেশভাগের পর তার বংশধর দিল্লীতে অবস্থান করেন। কুমার পাশী নাটক লিখে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি আধুনিক যুগের সম্মানিত কণ্ঠশিল্পী। আধুনিকতার বিকাশে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার নাটকেও আধুনিকতার ছোঁয়া রয়েছে। তিনি অসংখ্য নাটক লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তার নাটকের সংগ্রহ হলো- اندھے کے قیدی (আন্ধে কে কয়েদি) যা ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় সংগ্রহটি হলো- جملوں کی بنیاد (জুমলোঁ কে বুনিয়াদ) যা ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩১৯]

বীরেন্দ্র পাটোয়ারীঃ বীরেন্দ্র পাটোয়ারী ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ১১ই সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম বীরেন্দ্র কুমার পাটোয়ারী এবং সাহিত্যিক নাম বীরেন্দ্র পাটোয়ারী। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াশুনা করেছেন এবং পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বীরেন্দ্র পাটোয়ারী নাটক লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যে বিশেষ অবদান রেখেছেন। তার নাটকের সংগ্রহ হলো- آخری دن (আখেরি দিন), যা ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩২০]

উপি শাকিরঃ উপি শাকির ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ৪ই অক্টোবর জম্মুতে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম উম প্রকাশ এবং উপাধি উপি শাকির। তিনি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে মেট্রিক এবং ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে বি. এস সি পাস করেন। তিনি পড়াশুনা শেষ করে জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের একটি মাদ্রাসায় দায়িত্ব পালন করেন। উপিশাকিরের প্রথম নাটক بدلہ (বদলা), যার বিষয়বস্তু ছিল ন্যায়বিচার। এ নাটকটি অনেক সুনাম অর্জন করেছিল। সে থেকে তিনি নাটক লিখতে থাকেন। তার অন্যান্য নাটকগুলো হলো- ہم کہاں جا رہے ہیں (হাম কাহা যা রাহে হ্যাঁ), کم نہیں ہیں ہم بھی (কম নেহি হ্যায় হাম ভি), گول گول دنیا (গোল গোল দুনিয়া)।[৩২১]

কুলদ্বীপ রানাঃ কুলদ্বীপ রানা ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মিরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে জম্মু ও কাশ্মির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি একজন প্রখ্যাত নাট্যকার। তিনি نرگس کے پھول(নারগিস কে ফুল) নামে একটি মাত্র নাটক লিখেছেন।[৩২২]

সোমনাথ যাতশীঃ সোমনাথ যাতশী ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম পণ্ডিত নন্দলাল। তিনি বি. এ. শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি একজন সুবিখ্যাত নাট্যকার। তার বিখ্যাত নাটক نوائے سروش (নুয়ায়ে সরোশ) যা বিখ্যাত কবি গালিবের ব্যক্তিত্ব নিয়ে লিখেছেন। তাছাড়া তার অন্যান্য নাটক হলো- وجہ دار (ইজাহ দার), ییلہ سنگر پھولی (ইয়লা সানগর ফুলি)।[৩২৩]

দিলীপ সিংঃ দিলীপ সিং উর্দু গদ্য সাহিত্যে একাধারে ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার। তিনি একটিমাত্র নাটক লিখেছেন। তার নাটকের নাম হলো- موم کی گڑیا (মোম কি গুড়িয়া)। এই নাটকটি তিনি মীর্জা মোহাম্মদ হাদী রসুয়া এর উপন্যাস ‘অমরাও জানে আদা’ এর অনুকরণে রচনা করেছেন।[৩২৪]

অনিল ঠাকুরঃ অনিল ঠাকুর উর্দু গদ্য সাহিত্যে যেমন উপন্যাস লিখেছেন, তেমনি ছোটগল্প লিখেছেন। তিনি একইভাবে নাটকেও সুপরিচিত ছিলেন। অনিল ঠাকুর মূলত একজন নাট্যকার। তিনি নাটকে অভিনয় ও পরিচালনা করেছেন। তার বিখ্যাত নাটকগুলো হলো- اندھے رشتے (আন্ধে রেস্তে) যা ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল خالی خانے (খালি খানে), چوتھی دیوار (চৌথী দিওয়ার) ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩২৫]

জিডাসমী জামুরঃ জিডাসমী জামুর একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক। তিনি তার জীবনে কয়েকটি নাটক লিখেছেন। তার মধ্যে পরিচিত নাটক جہانگیر کی موت (জাহাঙ্গীর কি মওত), যা ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া তিনি রেডিওর জন্য অনেকগুলো নাটক লিখেছেন। তার নাটকের সংগ্রহ হলো- جھناکر ঝনাকর)।[৩২৬]

দয়ানন্দ কাপুরঃ দয়ানন্দ কাপুর একজন সাংবাদিক ছিলেন। তবে তিনি কিছু নাটক ও ছোটগল্প লিখেছেন, যা জম্মুর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতো। তার একটি নাটক تاج (তাজ) নামে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩২৭]

সরদারী লাল নাশতরঃ সরদারী লাল নাশতর পত্রিকায় ছাপানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন। সে সুবাদে তিনি নাটক ও ছোটগল্পও লিখতেন। তার বিখ্যাত নাটক تین فرشتے (তিন ফেরেশতে) মঞ্চস্থ হয়েছিল। এছাড়া তার আরো তিনটি নাটক আছে। তা হলো- ایک اور (এক অওর), بلبل (বুলবুল) এবং مورتی کار (মুরতি কার)।[৩২৮]

কাহন সিং জামালঃ কাহন সিং জামাল যদিও একজন কবি ছিলেন তবুও তিনি কয়েকটি নাটক লিখেছেন। তিনি شہید پرکاش (শহীদ প্রকাশ) এবং چنکی پھرلون (চানকি ফারলুন) নামে দুটি নাটক লিখেছেন।[৩২৯]

মনোহরী রায়ঃ মনোহরী রায় জম্মুর একজন বিখ্যাত নাট্যসাহিত্যিক। তার বিখ্যাত একটি নাটক ایک پتھر ایک محل (এক পাথর এক ম্যাহেল) এর বিষয়বস্তু হলো নায়ায়নগড় এর রাজকুমারী এবং শ্রীবপুরীর রাজমুকারের ভালোবাসার কাহিনি। এছাড়া তার আরো চারটি নাটক রয়েছে। তা হলো- شمع جلاؤ شمع بجھاؤ (শাম্মা' জালাও শাম্মা বাঝাও), بارکی پرچھائیں (বারকি পারছায়েঁ), مہاش کا گھر (মহাশ কা ঘর), پنچھیرا (পিঞ্চীরা)। তার নাটকের সংগ্রহ হলো- اردو ڈرامے (উর্দু ড্রামে) যা ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৩০]

৩.৩ ছোটগল্প

উর্দুতে ছোটগল্প কখনও কখনও `Fiction' শব্দের অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আবার কখনও `Short story' শব্দের অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।[৩৩১] এটি সাহিত্য জগতের সবচেয়ে আধুনিকতম শিল্পকর্ম। ছোটগল্প কিচ্ছা-কাহিনির আধুনিক রূপ হিসেবে গদ্য সাহিত্য জগতে বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। সভ্যতার চরম বিকাশে শিল্পের ব্যাপকতা, আভিজাতের অবক্ষয় ও জীবনযাত্রার ব্যাপকতা মানুষের কর্ম প্রবাহকে উন্মুখর করে তুলেছে, তখন সময়ের সংকীর্ণতা ব্যক্তি জীবনের অবসর ও ব্যস্ততা থেকেই সামান্য প্রশান্তির জন্য সৃষ্টি হয়েছে ছোটগল্প। কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প প্রত্যেকটিতেই জীবনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত হলেও প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক শৈল্পিক কাঠামোতে নির্মিত।[৩৩২] উর্দু ভাষায় ছোটগল্পকে "আফসানা" আরবি ভাষায় "কিচ্ছা" এবং ইংরেজি ভাষায় "Short story" বলা হয়। ছোটগল্পের শাব্দিক অর্থ রূপকথা, কলাকাহিনি, পৌরাণিক কাহিনি, কল্প কাহিনি ইত্যাদি।[৩৩৩] খন্ডকালীন জীবনের অভিব্যক্তি নিয়েই শুধু ছোটগল্প রচিত হয় না বরং খন্ড ঘটনা অংশকে সমগ্র জীবনের ব্যঞ্জনায় রূপায়িত করার মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ছোটগল্প। অর্থাৎ একটি জীবনকে অত্যন্ত জটিলতার মধ্যে পরিকীর্ণ রূপকে একটি মুহূর্তে ও অতলে একান্ত করে বিস্মিত, সীমাব্যঞ্জিত করে ছোটগল্প। ছোটগল্পের এইরূপ কৌশলকে গুরুত্ব দিয়ে শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, "ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য কাহিনি, যার প্রথম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।"[৩৩৪]

অর্থাৎ ছোটগল্প এমন হওয়া উচিত যা এক নিঃশ্বাসে পড়া যায়। এটি এমন একটি ঘটনার বর্ণনা, যার মধ্যে শুরু, মধ্যভাগ, উত্থান ও শেষ ভাগ থাকবে।। H. G wells বলেন যে, "ছোটগল্প দশ মিনিট হতে পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে শেষ হওয়া বাঞ্ছনীয়।"[৩৩৫] তাই বলা যেতে পারে যে, ছোটগল্প আকারে ছোট বলে এখানে জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ ও পূর্ণ অবয়ব এর বর্ণনা অনুপস্থিত। এ কারণে ছোটগল্পে জীবনের খন্ড খন্ড দিক নিয়ে লেখক তার অনুভূতি দিয়ে সম্পূর্ণ রসালো ও জীবন্ত করে ফুটিয়ে তোলেন। ছোটগল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে হেনরী হার্ডসন বলেছেন, "A Short sroty must contain one and only one informative idea and that the idea must be worked out to its logical connection with absolute singledness of aim and directness of method".[৩৩৬] ছোট গল্পের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ড. ফেরদৌসী ফাতেমা নাসির বলেছেন-

مختصر افسانہ کااطلاق اس کہانی پر کیا جاتا ہے جس میں مصنف ایک خاص فنی طریقہ پر کم سے کم الفاظ میں صرف ایک واقعہ کی تصویر کھینچتا ہے[৩৩৭]

পৃথিবীর অন্যান্য ভাষা ও গদ্য সাহিত্যের ন্যায় উর্দু গদ্য সাহিত্যেরও আধুনিকতম শিল্পকর্ম হলো ছোটগল্প। উর্দু সাহিত্যে ছোটগল্পের উন্নতি ও বিকাশে মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিম সাহিত্যিকগণ অসামান্য অবদান রেখেছেন।

প্রেমচাঁদঃ প্রেমচাঁদের আগে উর্দু ভাষায় কিছু কল্পকাহিনি এবং কিছু প্রাকৃতিক কল্পকাহিনির অনুবাদ ছিল তবে শিল্পের দিক দিয়ে এগুলোকে কথাসাহিত্য বলা মুশকিল। প্রেমচাঁদ এই ধারাকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছিলেন। তাই মনে করা হয় যে, প্রেমচাঁদের ধারার অনুকরণের মাধ্যমে ছোটগল্পের উৎপত্তি হয়েছে।[৩৩৮] যদিও সাজ্জাদ হায়দার ইয়ালদারমকে ছোটগল্পের জনক বলা হয় তবুও এই সাহিত্যের বিকাশে প্রেমচাঁদের নাম অতুলনীয়। আজিমল হক জুনায়দী বলেছেন,

"افسانہ کے میدان میں ان کا رتبہ اور بھی بلند ہے اس لئے کہ یہ اردو میں افسانہ نویسی کا باقاعدہ آغاز پریم چند نے ہی کہا"[৩৩৯]

প্রেমচাঁদ তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ছোটগল্পে পদার্পণ করেন। তার প্রথম ছোটগল্প عشق دنیا اور حب وطن (ইশকে দুনিয়া অওর হুব্বে ওয়াতন) ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে "যামানা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৪০]

প্রেমচাঁদের আগে উর্দুতে কথাসাহিত্য রচনার তেমন উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্য ছিল না। ছোটগল্প ছিল এবং সেগুলো ছিল মাত্র কয়েকটি যা গণনা করা যেতে া । কিন্তু প্রেমচাঁদ ৩০০ এর কাছাকাছি ছোটগল্প

রচনা করেছেন ।[৩৪১] তাই বলা যেতে পারে যে, প্রেমচাঁদ উর্দু ছোটগল্পের ভিত্তি স্থাপন করেছেন । এ প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন বলেছেন,

"جس طرح میر دنیائے غزل میں اس طرح پریم چند دنیائے افسانہ میں ابھی تک یگانۂ روزگار سمجھے جاتے ہیں"[৩৪২]

তার ছোটগল্পের বিষয় ছিল দরিদ্রদের উপর নিপীড়ন, পুঁজিবাদী ও ধর্মীয় ঠিকাদারদের বাড়াবাড়ি, উচ্চবর্ণের অবমাননা, অন্যান্য কুফল, সামাজিক ন্যায়বিচার, সাম্প্রদায়িকতা, বাস্তব চেতনা, ধর্ম, আদর্শবাদ ইত্যাদি । তার ছোটগল্পের বিষয় সম্বন্ধে ড. আসলাম জমশেদপুরী বলেছেন,

"مزدوروں کسانوں اور عام انسانوں کے مسائل ہوں یا انگریزوں کے ظلم واستبداد کی کہانی ہو اخلاقیات کی بات یا سرکاری افسران کی بدنیتی وحب وطن میں سرشار لوگوں کی زندگی، برائی اور اخلاقی گراوٹ، جنسی ہوس، بوالبوس، غرض سماجی ناسور، فرقہ دارانہ، ہم آہنگی، اتحاد واتفاق، طوائف کی زندگی، بیوہ زندگی کے رنگ جانوروں کی عادت وخصلت اور انسان کی حیوان دوستی، اجتماعیت، انقلاب، امن وآشتی، انسانوں کے دکھ درد، ہنسی وخوشی، فطرت نگاری وغیرہ ان کے موضوعات ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پریم چند کے موضوعات بس یہی ہیں۔ ان کے موضوعات کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہے جتنی کہ زندگی، زندگی کے رنگوں کو انہوں نے حتی الامکان حد تک کہانی پرونے کا کام کیا ہے"[৩৪৩]

প্রেমচাঁদ প্রত্যেক যুগের সবচেয়ে বড় ছোটগল্পকার ।[৩৪৪] তিনি উর্দু সাহিত্যের এমন একটি নাম যা উপেক্ষা করা যায় না । তার কথাসাহিত্যকে চারটি পিরিয়ডে ভাগ করা হয়েছে ।[৩৪৫]

১ম পিরিয়ড- ১৯০১ খ্রি. থেকে ১৯০৯ খ্রি. পর্যন্ত ।

২য় পিরিয়ড- ১৯০৯ খ্রি. থেকে ১৯২০ খ্রি. পর্যন্ত । এখানে ঐতিহাসিক ও সংশোধনমূলক ছোটগল্প রয়েছে ।

৩য় পিরিয়ড- ১৯২০ খ্রি. থেকে ১৯৩২ খ্রি. পর্যন্ত । এখানে সংশোধনমূলক রাজনৈতিক বিষয়ক ছোটগল্প রয়েছে ।

৪য় পিরিয়ড- ১৯৩২ খ্রি. থেকে ১৯৩৬ খ্রি. পর্যন্ত । এখানে রাজনৈতিক ও চিন্তামূলক ছোটগল্প রয়েছে ।[৩৪৬]

প্রেমচাঁদ তার সাহিত্য জীবনে অনেক ছোটগল্প লিখেছেন । সেখান থেকে কিছু ছোটগল্প আলোচিত হলো । আট দশক আগে রচিত মুন্সী প্রেমচাঁদের বিখ্যাত গল্প (কাফন) کفن এই যুগের সমাজের নিপীড়িত শ্রেণির প্রকৃত প্রতিচ্ছবি । প্রেমচাঁদের ছোটগল্প 'কাফন' ডিসেম্বর ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল ।[৩৪৭]

এই গল্পে চারটি চরিত্র রয়েছে। ঘিসো, মাধু, বুধিয়া এবং চুতর্থ চরিত্রটি হলো বাড়িওয়ালা। যিনি এক রকম সেই সময়ে সমাজের প্রতিচ্ছবি ছিলেন যা সেই সময়ে শোষণকারী শক্তি হিসাবে বিদ্যমান ছিল। এই শোষণকারী শক্তি আজও সমাজে প্রতিষ্ঠিত, কেবলমাত্র অবস্থান বদলাচ্ছে। 'কাফন' গল্পটি বুধিয়ার প্রসব বেদনাতে শুরু হয়েছিল। তার মুখ থেকে এমন হৃদয় বিদারক চিৎকার বেরিয়ে এসেছিল যে, ঘিসো ও মাধুর হৃদয়কেও কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

কাফনের শেষ পংক্তিতে বুধিয়ার যন্ত্রণা, বেদনা ও চিৎকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বুধিয়ার হৃদয়ের বেদনা চলাকালীন মাধু ও ঘিসোর হৃদয়কে প্রকম্পিত করেছে। প্রেমচাঁদের উদ্ধৃতিটি এই রকম,

"گھسو نے کہا۔"معلوم ہوتا ہے بچے گی نہیں۔ سارا دن پڑپتے ہو گیا۔ جا دیکھ تو آ۔" مادھو نے دردناک لہجے میں کہا۔"مرنا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی۔ دیکھ کر کیا کروں"[৩৪৮]

এই উদ্ধৃতি থেকেই তাদের দু'জনের উদাসীনতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাদের দু'জনের কেউই তার জন্য কোন ব্যবস্থা করার বিষয়ে চিন্তিত নয়। ঘিসো খোঁচা দিয়ে মাধুকে তার স্ত্রীর কথা জানতে চাইলে সে বলে যে, এই অবস্থায় বুধিয়াকে দেখে সে ভয় পেয়েছে। বুধিয়া ঘরে একা থাকে। তার যত্ন নেওয়ার মতো কেউ নেই। প্রতিবেশী বা বাড়ির যেই হোক না কেন তারা অনেক দূরে থাকতেন। এখানে কথাসাহিত্যে তৈরি পরিবেশটি শীতের রাত। পুরো গ্রামটি অন্ধকারে নিমজ্জিত এমন পরিবেশে বুধিয়ার ক্রন্দনের শব্দ হৃদয় বিদারক হয়। তবে এখানে মুন্সী প্রেমচাঁদ স্পষ্ট করে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে, এত কিছুর পরে ঘিসো ও মাধু শুধু ঘরে বসে ক্ষুধা ও তৃষ্ণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ঘিসো ও মাধু এমন চরিত্রের ছিল যে, ঘিসো একদিন কাজ করলে তিনদিন বিশ্রাম নেয়। আর মাধু এক ঘন্টা কাজ করলে এক ঘন্টা পানি পান করে। সকালে মাধু গিয়ে ঘরে দেখে যে তার স্ত্রীর শরীর শীতল হয়ে পড়েছে। মাছিগুলো তার মুখে গুঞ্জন করছে, তার শরীর ধুলোয় আসক্ত হয়েছে, শিশুটি তার পেটে মারা গিয়েছে। তখন দুজনেই জোরে জোরে কাঁদতে শুরু করে। এখানে বলা হচ্ছে তা কেবল একটি ভান। উচ্চস্বরে কান্নাকাটির একটি গোপন অর্থ রয়েছে। তাদের কান্নার অর্থ এই নয় যে, তারা বুধিয়ার শোকে কান্নাকাটি করছে তবে এটি একটি সামাজিক রীতি। কারণ এখন কাফন এবং কাঠের উদ্বেগ ছিল। এমন সময়ে গ্রামবাসীরাও তাকে সহায়তা করেছিল। কেউ তিন-পাঁচ টাকা দিয়েছিল, কেউ শস্য দিয়েছে, কেউ কাঠ দিয়েছে। মানবতা এখনও গ্রামে রয়েছে। ঘিসো ও মাধু দুজনেই কাফনের জন্য বাজারে যায়। এমনকি সারাদিন দৌঁড়ানোর পরেও তারা কাফন কিনতে পারে না। দুই জনেই ঘটনাক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে একটি বারের সামনে গিয়েছিল এবং সেখানে মদ্যপান করেছিল। প্রেমচাঁদ 'কাফন' ছোটগল্পের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, যদি কোনও ব্যক্তির মৌলিক

চাহিদা পূরণ না হয়, তবে তাতে উদাসীনতার উপাদানটি বিরাজ করে, অসাধুতা বাড়ে, অভ্যন্তরের ব্যক্তিটি মারা যেতে শুরু করে। আস্তে আস্তে সে মানবিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হয়। এই গল্পকে নিপীড়নের চেয়ে মানবিক নিষ্ঠুরতা ও দাসত্বের একটি রূপকথার কাহিনি বলা যেতে পারে, যা চরম দারিদ্রের মধ্যে অতিবাহিত করে। ছোটগল্পটিতে সম্পর্কের ব্যর্থতার সাথে বেদনাদায়ক স্বার্থকে চিত্রিত করা হয়েছে।

প্রেমচাঁদের ছোটগল্প "عیدگاہ" (ঈদগাহ) কাফনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় না। তবে আসল বিষয়টি হলো ঈদগাহ তার আধ্যাত্মিকতায় কাফনের চেয়েও একটি সফল ছোটগল্প। অন্যদিকে 'ঈদগাহ' ছোটগল্পে দারিদ্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। প্রেমচাঁদের অন্যান্য কল্পকাহিনিতে দারিদ্র মানুষকে নিস্তেজ করে তোলে, কিন্তু ঈদগাহে দারিদ্র কথাসাহিত্যের কেন্দ্রীয় চরিত্রকে অত্যন্ত সংবেদনশীল, বুদ্ধিমান এবং নিঃস্বার্থবান করে তুলেছে। ঈদগাহ ছোটগল্পটি ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৪৯] ঈদগাহের গল্পটি হচ্ছে হামিদ তার দরিদ্র নানি আমিনার সাথে একটি গ্রামে থাকে। তার বাবা-মা মারা গেছে। ঈদ এসেছে এবং আমিনার কাছে হামিদের জামাকাপড় ও জুতো ক্রয় করার সমপরিমাণ টাকা নেয়। হামিদ যদি 'ঈদগাহে' যাওয়ার জন্য জিদ করে তবে তিনি তাকে ঈদ বখশীশ হিসাবে তিন পয়সা দিতেন। হামিদের সব বন্ধুদের পর্যাপ্ত টাকা রয়েছে। হামিদের বন্ধুদের খাওয়া দেখে তারও খেতে ইচ্ছে হয়; কিন্তু তার কাছে মাত্র তিন পয়সা আছে তাই সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে নেয়। হামিদের বন্ধুরা খেলনা কিনতে শুরু করে, হামিদের হৃদয়ও খেলনা কিনতে চায়, কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে যে, তার নানির চামচ নেই। চুলায় রান্না করতে এবং রুটি করার সময় তার হাত জ্বলে যায়। তাই সে খেলনা না কিনে একটি চামচ কিনলো, সেটি দেখে তার বন্ধুরা হাসতে ও মজা করতে থাকে।

তারপর সে চামচটি নিয়ে চিৎকার করে বাসায় আসলে তার নানি বিস্মিত হয়ে দেখছিল যে, তার চার বছরের নাতি কীভাবে ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং সে তার নানিকে কতোটা ভালোবাসে। 'ঈদগাহ' গল্পটির শুরুতে লেখক এভাবে লিখেছেন,

"رمضان کے پورے تین روزوں کے بعد آج عید آئی ہے۔ کتنی سہانی اور رنگین صبح ہے۔ بچہ کی طرح پر تبسم۔ درختوں پر کچھ عجیب ہریادل ہے، کھیتوں میں کچھ عجیب رونق ہے، آسمان پر کچھ عجیب فضا ہے۔ آج کا آفتاب کتنا پیارا ہے، گویا دنیا کو عید کی خوشی مبارک باد دے رہا ہے"[৩৫০]

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। প্রেমচাঁদ এখানে দেখিয়েছেন যে, কৃষকরাও ওজু করে ঈদের জামায়াতে যোগদান করে। এখানে ধনী-গরিব সবাই একসাথে নীচে নেমে আসে, দুই হাঁটুতে এক সাথে বসে এবং এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি হয়। কতইনা এক বিস্ময়কর দৃষ্টিশক্তি এবং প্রশস্ততা যা

অগণিত হৃদয়ে একটি চেতনাকে প্ররোচিত করে, যেন ভ্রাতৃত্বের বন্ধন এই সমস্ত প্রাণকে সংযুক্ত করেছে।

সুতরাং এই গল্পটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, লেখক এখানে আধ্যাত্মিকতা এবং আত্মসংযমতা ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেমচাঁদের সর্বাধিক বিখ্যাত ছোটগল্প 'কাফন'-এ দরিদ্র ও বঞ্চনা যা মানুষকে নিস্তেজ ও চরম নির্বিকার করে তুলেছে। একই দরিদ্র ও বঞ্চনা 'ঈদগাহ' গল্পটিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে আধ্যাত্মিকতা, সংযমী ও বুদ্ধিমান করে তুলেছিল। প্রেমচাঁদ একজন হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী সভ্যতার দ্বারা এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তার এই সভ্যতা ও কৃষ্টিকালচার 'ঈদগাহ' গল্পে সুস্পষ্ট।

প্রেমচাঁদের আরেকটি কিংবদন্তি "بڑے گھر کی بیٹی" (বড়ে ঘর কি বেটি) যা একজন জমিদারের মেয়ের গল্প। তিনি একটি ধনী পরিবারের মেয়ে, পাশাপাশি একজন নারী, একটি যৌথ পরিবারের পুত্রবধু এবং একটি আপোষহীন গৃহিণী। 'বড়ে ঘর কি বেটি' ছোটগল্পটি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে যামানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৫১] এই গল্পের মূল চরিত্র আনন্দী। সে একটি ধনী পরিবারের মেয়ে ছিল। তার বাবা ভুপ সিং একটি ছোট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যখন তাদের সম্পদ তাদের ছেড়ে চলে যেতে থাকে এবং তারা অসহায় হয়ে যায় তখন তার বাবা তাকে এক সাধারণ পরিবারের ছেলে, শ্রীকান্ত এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। শ্রীকান্ত বি. এ পাস করে একটি অফিসে চাকরি পেয়েছে। সে পুরনো রীতিনীতিগুলোর অনুরাগী এবং যৌথ পরিবারে শক্তিশালী সমর্থক ছিল। শৈশবকাল থেকেই আনন্দী যে আগ্রহ ও শখে অভ্যস্ত ছিল, তা তার শ্বশুর বাড়িতে ছিল না। তবে কয়েক দিনের মধ্যে, সে এই পরিবেশের সাথে ভালোভাবে খাপখাইয়ে নিয়েছে। একদিন লাল বিহারী সিং তার ভাবিকে মাংস রান্না করতে বলে। আনন্দী রাগে সব ঘি মাংসে দিয়ে দেয়। লাল বিহারী খেতে বসলে দেখে ডালে ঘি নেই। সামান্য কারণে লাল বিহারী রেগে যায় এবং তার ভাবিকে জুতা দিয়ে মারে। এতে আনন্দী রাগান্বিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে তার স্বামী শ্রীকান্তের জন্য অপেক্ষা করতে শুরু করে। শ্রীকান্ত এসে পুরো ঘটনাটা জানতে পেরে সে তার স্ত্রীর অবমাননা সহ্য করতে পারে না। শ্রীকান্ত তার বাবা বেনি মধু সিংয়ের কাছে যায় এবং সে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়, একথা শুনে বেনি মধু সিং তার ছেলের রাগ কমানোর চেষ্টা করে। এদিকে বিহারী লাল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনছিল এবং খুব দুঃখ পাচ্ছিল। এজন্য সে নিজেই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায় কিন্তু আনন্দী এসে বিহারী লালের হাত ধরে এবং কসম দিয়ে তার যাওয়া আটকায়। এ ঘটনা দেখে শ্রীকান্ত খুব খুশি হয় এবং দুই ভাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরে। বেনি মধু সিং এ সমস্ত দেখে এবং খুশিতে বলতে থাকে,

"بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، بگڑتا ہوا کام بنالیتی ہیں۔"[৩৫২]

এই রূপকথায় প্রেমচাঁদ যেভাবে গ্রামের বর্ণনা করেছেন এবং ভাষাকে সরল ও সাবলীল করেছেন, অন্য কোন লেখকের পক্ষে এত সহজভাবে লিখা অসম্ভব। প্রেমচাঁদের ভাষা খুব সহজ এবং তিনি যেভাবে প্রবাদগুলো ব্যবহার করেছেন তা প্রশংসনীয়। যেমন-

"جس طرح سوکھی لکڑی جلدی سے جل اٹھتی ہے، اسی طرح بھوک سے باؤلا انسان ذرا ذرا سی بات پر تنک جاتا ہے"۔[৩৫৩]

প্রেমচাঁদ এই গল্পে নারীর ভূমিকাও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যেমন এখানে আনন্দী তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে এবং স্বামী আসলে কাঁদতে শুরু করে যা ছিল একজন অনন্য নারীর ভূমিকা। প্রেমচাঁদের ভাষায়,

"آنندی رونے لگی، جیسے عورتوں کا قاعدہ ہے کیوں کہ آنسوں ان کی پلکوں پر رہتا ہے۔ عورت کے آنسو مرد کے غصے پر روغن کا کام کرتے ہیں"۔[৩৫৪]

প্রেমচাঁদ চরিত্র চিত্রায়নে অনেক মনস্তাত্বিক বিষয় উপস্থাপন করেছেন যা জীবনে বাস্তব এবং প্রাকৃতিক। প্রেমচাঁদ "বড়ে ঘর কি বেটি" ছোটগল্পে একজন নারীর ভূমিকাকে খুব ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

প্রেমচাঁদের আরেকটি সফল ছোটগল্প (پوس کی رات) 'পুস কি রাত'। এই ছোটগল্পটি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৫৫] প্রকৃতির সম্পর্কগুলো কীভাবে কৃষকদের প্রভাবিত করে এর একটি নির্মম রূপ প্রেমচাঁদের ছোটগল্প 'পুস কি রাত' এ উপস্থিত হয়। কৃষকদের জন্য শীত ও গ্রীষ্ম কোনটাই সুফল বয়ে আনে না। শীত এলে এই শীতকে দরিদ্র কৃষকদের মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। কারণ তাদের কাছে উপরের ছাদ, উষ্ণ কম্বল, রাতের জন্য উষ্ণ বিছানা এবং শরীরকে উষ্ণ রাখার জন্য কিছুই থাকে না। এইসব সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও গরিব কৃষক শীতের রাতে তার জমিকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃতির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। যেখানে সে কখনও জয়লাভ করে আবার কখনও পরাজিত হয়। তবে তার জীবনে এই পরাজয় বা বিজয়ের কোন তাৎপর্য নেই। সে কীভাবে প্রকৃতির সাথে লড়াইয়ে সফল হয় তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। 'পুস কি রাত'-এ প্রেমচাঁদ প্রকৃতির সাথে মানুষের এই যুদ্ধকে মহান সভ্যতার সাথে উপস্থাপন করেছেন। হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডায় কীভাবে অসহায় মানুষ এবং জন্তু-জানোয়ার থাকে তার দৃশ্যটি ছোটগল্পের মূল চরিত্র হালকো এবং কুকুর জাব্রার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। যারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে একে অপরের সাথে লড়াই করে। এখানে হালকোর ভূমিকা ভারতীয় কৃষকদের শতবর্ষের নিপীড়ন, বাধ্যবাধকতা এবং দারিদ্রের প্রতীক হয়ে উঠে। তার কঠোর পরিশ্রম সত্ত্বেও তাকে

সমর্থন করার মতো আশেপাশে কেউ নেই। তার বিশ্বস্ত প্রাণী জাব্রা ব্যতীত তার একাকীত্ব জীবনে কেউ ছিল না।

হালকো তার জমিতে পাহারা দেওয়ার জন্য রাত কাটাতে মাঠে আসে যাতে তার ফসলের কোন ক্ষতি না হয়। শীতের রাতে এই ভয়াবহ ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য তার কেবলমাত্র একটি পুরনো ঘন কম্বল রয়েছে যা শীতের প্রকোপ হালকোর দেহের অভ্যন্তরে পৌঁছতে বাঁধা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল। তার বিশ্বস্ত কুকুর জাব্রা শীত থেকে বাঁচার জন্য তার পিঠে মুখ বাঁধে। কুকুরটি ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে ব্যর্থ চেষ্টা করছে। এই বিশ্বস্ত প্রাণীটি এত ভয়াবহ শীতকালেও তার মালিককে ছেড়ে যেতে চায়নি। যখন ঠাণ্ডা অসহ্য হয়ে উঠল তখন সে কুকুরটিকে চুমু খেলো। এভাবে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল। আর এই বন্ধুত্বই বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুপ্রেরণা যোগায়। এদিকে শীত খুব বেশি হলে হালকো কিছু পাতা এক জায়গা করে আগুন ধরায় এবং তারা উত্তাপ নেয়, এতে তার চোখে ঘুম চলে আসে। লেখক এ দৃশ্য এভাবে তুলে ধরেছেন,

پتیاں جل چکی تھیں۔ باغیچے میں پھر اندھیرا چھا گیا تھا راکھ کے نیچے کچھ کچھ آگ باقی تھی۔ جو ہوا کا جھونکا آنے پر ذرا جاگ اٹھتی تھی پر ایک لمحہ میں پھر آنکھیں بند کر لیتی تھی۔[৩৫৬]

কিন্তু তার ফসলের কথা মনে পড়ে যায় এবং সে আর ঘুমাতে পারে না। কারণ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সে বাধ্য ও অসহায়। তাকে নিজের ও পরিবারের যত্ন নিতে হবে এবং জমিদারদেরকে ফসলের ভাগ দিতে হবে। তাই সে এমন কঠিন জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ তার আর অন্য কোন উপায় নেই।

এখানে প্রেমচাঁদ দেখাতে চেয়েছেন যে, মানুষ তার প্রয়োজন ও পরিস্থিতি উপেক্ষা করতে পারে না। এই প্রতিকূলতাগুলোকে তাকে মোকাবেলা করতে হয়। অবিরাম সংগ্রাম, পরাজয় এবং সুখের নামই জীবন। জীবনের বাস্তবতা লুকিয়ে আছে সংগ্রাম এবং কর্মের মধ্যে।

'পুস কি রাত' ছোটগল্প প্রেমচাঁদের অন্যান্য ছোটগল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। তার শৈল্পিক দক্ষতা, বাস্তবতা, মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনা এক সাথে এই কথাসাহিত্যকে একটি উচ্চ স্থান দিয়েছে। প্রেমচাঁদ একই বিষয়ে তার অনেক কল্পকাহিনি লিখেছেন যা থেকে তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে জবরদস্তি ও দ্বন্দ্বের সম্পর্ক নয়, সত্যিকারের বোঝাপড়া ও বন্ধুত্ব রয়েছে। অর্থাৎ আকাশ, চাঁদ, নক্ষত্র, পাহাড় এবং পরিবর্তিত আবহাওয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক চিরন্তন।

প্রেমচাঁদের আরেকটি জনপ্রিয় ছোটগল্প "حج اکبر" (হজে আকবর)। এই গল্পে একজন ধাত্রী ও একটি ছোট ছেলের মধ্যে সম্পর্কের যে বন্ধন গড়ে উঠে লেখক তা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'হজে আকবর' ছোটগল্পটি ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৫৭] এই গল্পে চারটি চরিত্র রয়েছে। আব্বাসী, সাবের, শাকির ও নাসির। এখানে কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো আব্বাসী ও নাসির। আব্বাসী নাসিরের ধাত্রী হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নাসিরকে তার সন্তানের মতোই ভালোবাসতেন। নাসিরও তাকে আন্না আন্না বলে ডাকতো। সেও ধাত্রীকে ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু সাবেরের স্ত্রী শাকিরা ধাত্রীটিকে পছন্দ করতো না। তাই সে ধাত্রীকে সন্দেহ করতো এবং তিক্ত কথা বলতো। তবুও ধাত্রী নাসিরের জন্য কিছুই মনে করতো না; কিন্তু একদিন শাকিরা ধাত্রীকে বাজারে পাঠালো। ধাত্রীর আসতে আধাঘন্টা সময় লেগেছিল, এতে শাকিরা রেগে গিয়ে তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলে। ধাত্রীর এভাবে খুব কষ্ট লাগে তারপরও তিনি নাসিরকে কোলে নিতে যান কিন্তু শাকিরা তার কোল থেকে নাসিরকে ছিনিয়ে নেয়। তারপর ধাত্রী অপমানিত হয়ে চলে যান। কিন্তু নাসির দরজার কাছে গিয়ে আন্না আন্না বলে কাঁদতে থাকে। কিন্তু তার আন্না আর আসেনা। নাসিরের মা নাসিরকে অনেক আদর করে এবং সবকিছু দিয়ে ভুলানোর চেষ্টা করে। তবুও নাসির আন্না আন্না করে কাঁদতে থাকে। এতে সে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিলে অসুস্থ হয়ে যায়। তার অসুস্থতা সারানোর জন্য তার বাবা-মা অনেক চেষ্টা করে, অনেক ডাক্তার, বদ্য সবকিছু দেখায় কিন্তু কোন লাভ হয় না। সে অচেতন হয়ে যায়। অপরদিকে আব্বাসী বাসায় গিয়ে নাসিরের কথা সব সময় ভাবতে থাকেন। তিনি অনেকবার যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরক্ষণে শাকিরার অবহেলার কারণে তিনি যেতে পারলেন না, ছোট্ট বাচ্চাটির জন্য তিনিও কাঁদতে থাকেন, কারণ তিনি নাসিরকে খুব ভালোবাসতেন।

তারপর একদিন তিনি হজে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং সফরে বেরিয়ে যান। ট্রেনে বসে থেকে নাসিরের কথাই ভাবতে থাকেন। এদিকে নাসিরের বাবা-মা ধাত্রী নিয়ে আসার চিন্তা করে। সাবের সাহেব ধাত্রীর বাড়িতে গিয়ে জানতে পারেন যে, তিনি হজ্ব যাত্রায় বের হয়েছেন। সাবের সাহেব সেই ট্রেনটির কাছে সাইকেল চালিয়ে যান। ধাত্রী তাকে দেখে নাসিরের কথা জিজ্ঞাসা করেন তখন সাবের বলেন, নাসির দুইদিন থেকে অচেতন হয়ে আছে শুধু আন্না আন্না করে কাঁদছে। এ কথা শুনে আব্বাসী বলেন,

"یا میرے اللہ! ارۓ او قلی قلی! بیٹا! آ کے میرا اسباب گاڑی سے اتار دے۔ اب مجھے حج وج کی نہیں سوجھتی۔ ہا بیٹا! جلدی کر۔ میاں دیکھئے کوئی یکہ ہو تو ٹھیک کر لیجئے!"[৩৫৮]

অর্থাৎ আব্বাসী হজে না গিয়ে নাসিরের জীবন বাঁচাতে তার বাড়িতে যেতে রাজি হয়। আব্বাসী পথিমধ্যে খুব ভয়ে ভয়ে ছিল এবং শাকিরার কথা মনে করলো তারপর সে পরক্ষণে ভাবলো এতে নাসিরের তো কোন দোষ নেই। নাসির তাকে খুব ভালোবাসে একথা ভেবে তার চোখে জল চলে আসে। তিনি বাড়িতে প্রবেশ করে দেখেন শাকিরা নাসিরকে কোলে নিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। আব্বাসী শাকিরাকে কিছু না বলে নাসিরকে তার কোলে নিয়ে নেন এবং বলেন নাসির বেটা চোখ খোলো। নাসির চোখ খুলে তার আন্নার দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। সে ধাত্রীকে জোরে আকড়ে ধরে এবং বলে আন্না এসেছে। এতে তার চেহারা আলোকিত হয়ে যায় এবং সে ভালো হয়ে যায়। এক সপ্তাহ পর নাসির আঙ্গিনায় খেলাধুলা করে এবং তার বাবা তা দেখে খুশি হয়ে যায়। এই ঘটনাক্রমে আব্বাসী নাসিরকে বলেন,

"کیوں بیٹا! مجھے تو تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا۔ میرے حج کا ثواب کون دے گا؟"[৩৫৯]

সাবের সাহেব হাসতে হাসতে বললেন,

"نہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا۔ اس حج کا نام حج اکبر ہے"[৩৬০]

অর্থাৎ লেখক এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, মানুষের ভালোবাসা ও মহত্ত্ব সবচেয়ে বড়। একজন মানুষের জীবন বাঁচালে হজের মতো সওয়াব পাওয়া যায়। মানব ধর্মই বড় ধর্ম। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নেই।"

"دنیا کا سب سے انمول رتن" (দুনিয়া কা সব সে আনমোল রতন) প্রেমচাঁদের একটি সফল ছোটগল্প।[৩৬১] গল্পটি প্রথম ছোটগল্পের সংগ্রহ "سوز وطن" (সুজ ওয়াতন) এর মধ্যে রয়েছে। 'দুনিয়া কা সব সে আনমোল রতন' ছোটগল্পটি ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে যামানা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।[৩৬২] এটি প্রেমচাঁদের দেশপ্রেমমূলক ছোটগল্প। এই গল্পে দিলফারিব ডালফগারের প্রেমের পরীক্ষার জন্য তাকে দুনিয়ার সবচেয়ে ব্যয়বহুল জিনিস নিয়ে আসতে বলে। তার কথানুযায়ী ডালফগার বেরিয়ে পড়ে এবং একটি কাটাযুক্ত গাছের নিচে বসে চিন্তা করে যে, এই ব্যয়বহুল জিনিস/মূল্যবান জিনিস কী, দেখতে কেমন, কোন ধাতু দিয়ে তৈরি? এসব চিন্তা করে আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে মরুভূমির পথে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে সে ক্লান্ত হয়ে যায়, তার শরীর নিস্তেজ হয়ে যায় এমন সময় সে দেখতে পেল এক জায়গায় অনেক লোক। সেখানে দেখল একজন চোর চুরি করেছে তাই তার শাস্তি হচ্ছে। চোরটি বলল আমাকে এখনই ফাঁসি দাও তাহলে আমার মনের শেষ ইচ্ছা বলতে পারবো। এ

ঘটনা দেখে ডালফগার বুঝতে পারল মানুষের জীবনই সবচেয়ে মূল্যবান। তাই সে দিলফারিবের কাছে গিয়ে সমস্ত বর্ণনা করল। দিলফারিব শুনে বলল মানুষের জীবন মূল্যবান সম্পদ; কিন্তু ব্যয়বহুল নয়। তাই তাকে আবার ব্যয়বহুল জিনিস খুঁজতে নির্দেশ দিল। ডালফগার যথারীতি আবার বেরিয়ে গেল, এক পাহাড়ের চূড়ায় উঠল। আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকল। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সে দেখল এক নারী তার স্বামীর দেহ নিয়ে কাঁদছে; আর সমস্ত লোক তাকে ঘিরে আছে আর ফুল দিচ্ছে, এক সময় তাকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলে। কিছুক্ষণ ডালফগার সেখানে থাকে, সবাই চলে গেলে, সেখানকার মাটি নিয়ে আবার দিলফারিবের কাছে যায় এবং সবকিছু পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করে, এসব কথা শুনে দিলফারিবের হৃদয় একটু গলে যায় এবং সে বলে আপনার কথা ঠিক যে, এটি একটি ব্যয়বহুল জিনিস কিন্তু এরকম আরো ব্যয়বহুল জিনিস আছে তা আপনি খুঁজে বের করুন। এই বলে দিলফারিব চলে যায় আর গরিব ডালফগার আবার বেরিয়ে পড়ে। এবার সে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে; কিন্তু সে বুঝতেও পারে না যে, সে এতদুর উঠতে পেরেছে। সে হঠাৎ করে দেখে একটি দরবেশ পাহাড়ের পাস দিয়ে যাচ্ছে। সে পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসে এবং দরবেশকে জিজ্ঞাসা করে কীভাবে সে অমূল্য জিনিস খুঁজে পাবে। সেই অচেনা লোকটি তাকে ভারত যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেয়। তারপর লোকটি অদৃশ্য হয়ে যায়। তার পরামর্শানুযায়ী সে ভারতে যায়, সেখানে এক মাঠে অনেক লাশ দেখতে পায়, যেখানে রক্তের প্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে। সেখানে যেয়ে সে বুঝতে পারে অনেক সৈনিকের লাশ রয়েছে। একজন সৈনিক আধামরা অবস্থায় ছিল। সৈনিক তাকে বলেন আমরা দেশের জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত। তার রক্ত স্রোত বয়ছিল। তার শেষ রক্তবিন্দু শেষ হয়ে গেলে তিনি মারা গেলেন। এই ঘটনা থেকে ডালফগার বুঝতে পারে দেশের জন্য শেষ রক্তবিন্দু হচ্ছে অমূল্য রতন অর্থাৎ ব্যয়বহুল জিনিস। এ প্রসঙ্গে প্রেমচাঁদ বলেন-

"وہ آخری قطرہ خون جو وطن کی حفاظت میں گرے، دنیا کی سب سے بیش قیمت شے ہے"[৩৬৩]

ডালফগার যখন বুঝতে পারল তখন সে তৎক্ষণাৎ দিলফারিবের কাছে পৌঁছায় এবং তার দেখা ঘটনাটি বর্ণনা করে এবং বলে দেশপ্রেমিকের শেষ রক্তবিন্দু হচ্ছে ব্যয়বহুল জিনিস। দিলফারিব এই কথা শুনে বুঝতে পারলো ডালফগারের বুদ্ধি আছে এবং সেও বলল হ্যা দেশপ্রেমিকের শেষ রক্তই হচ্ছে অমূল্য রতন। তারপর ডালফগার ও দিলফারিবের বিয়ে হয়ে যায়। "দুনিয়া কা সব সে আনমোল রতন" ছোটগল্পটিতে লেখক প্রেম, ভালবাসা ও দেশপ্রেমের চিত্র খুব সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন।

উপরের আলোচিত ছোটগল্প ছাড়াও প্রেমচাঁদ অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন। তার সব ছোটগল্পগুলো তুলে ধরা সম্ভব নয়। এ কারণে তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো তুলে ধরা হলো-

১. "سوز وطن" (সুজ ওয়াতন) প্রেমচাঁদের প্রথম ছোটগল্পের সংগ্রহ । এই সংগ্রহে লেখকের নাম দেওয়া হয়েছিল নওয়াব রায়।[৩৬৪] সুজ ওয়াতন ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৬৫] "সুজ ওয়াতন" সংগ্রহে পাঁচটি গল্প রয়েছে। দুনিয়া কা সব সে আনমোল রতন, শেখ মাহমুদ, এহি মেরা ওয়াতন হে, সিলায়ে মাতেম, ইশক দুনিয়া অওর হুব্বে ওয়াতন।[৩৬৬] ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে সুজ ওয়াতন, সির দরবেশ নামে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৬৭] সুজ ওয়াতনের ভূমিকায় প্রেমচাঁদ লিখেছেন,

"آب ہندوستان کے قومی خیال نے بلوغیت کے زینے پر ایک قدم اور بڑھایا ہے اور حب وطن کے جذبات لوگوں کے دلوں میں سر ابھارنے لگے ہیں۔ کیونکہ ممکن تھا کہ اس کا اثر ادب پر نہ پڑتا۔ یہ چند کہانیاں اس اثر کا آغاز ہیں اور یقین ہے کہ جیوں جیوں ہمارے خیال رفیع ہوتے جائیں گے اس رنگ کے لٹریچر کو روز افزوں فروغ ہوتا جائے گا۔ ہمارے ملک کو ایسی کتابوں کو اشد ضرورت ہے، جو نئی نسل کے جگر پر حب وطن کی عظمت کا نقشہ جمائیں"[৩৬৮]

২. "پریم پچیسی حصۂ اول" (প্রেম পাচিশি হিস্‌সায়ে আওয়াল)। এতে ১২টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

৩. "پریم پچیسی حصۂ دوم" (প্রেম পাচিশি হিস্‌সায়ে দুয়াম)। এতে ১৩টি ছোটগল্প আছে এবং এটি ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

৪. "پریم بتیسی حصۂ اول" (প্রেম বাতিসি হিস্‌সায়ে আওয়াল)। এতে ১৬টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

৫. "پریم بتیسی حصۂ دوم" (প্রেম বাতিসি হিস্‌সায়ে দুয়াম)। এতে ১৬টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

৬. "خاک پروانہ" (খাক পারদানা)। এতে ১৬টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

৭. "خواب و خیال" (খাব ও খেয়াল)। এতে ১৪টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

৮. "فردوس خیال" (ফেরদৌসে খেয়াল)। এতে ১১টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

৯. "پریم چالیسی حصۂ اول" (প্রেম চালিসি হিস্‌সায়ে আওয়াল)। এতে ২০টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

১০. "پریم چالیسی حصۂ دوم" (প্রেম চালিসি হিস্‌সায়ে দুয়াম)। এতে ২০টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

১১. "آخری تحفہ" (আখেরী তোহফা)। এতে ১৩টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

১২. "زاد وراہ" (জাদ ও রাহ)। এতে ১৫টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩. "دودھ کی قیمت" (দুধ কি কীমত)। এতে ৯টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৪. "واردات" (ওয়ারেদাত)। এতে ১৩টি ছোটগল্প রয়েছে এবং এটি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৬৯]

প্রেমচাঁদ তার ছোটগল্পগুলোতে চরিত্রায়নে অত্যন্ত শৈল্পিক দক্ষতা দেখিয়েছেন। প্রেমচাঁদের চরিত্রায়নের সবচেয়ে বড় কৌশল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। প্রেমচাঁদের চরিত্রগুলো প্রায়শই সমাজের নিপীড়িত সাধারণ মানুষ। তিনি নিপীড়িত ও মজদুরদের সাথে কথা বলতেন এবং সেগুলো তার ছোটগল্পের চরিত্রে রূপায়িত হতো। তিনি তার ছোটগল্পে শুধু নিপীড়িত ও শ্রমিকশ্রেণি তুলে ধরতেন না সমাজের সব গোত্রের মানুষ তার ছোটগল্পের চরিত্র ছিল। এ প্রসঙ্গে ড. জাফর রেজা এর উদ্ধৃতি দিয়ে জহির আলী সিদ্দিকী বলেছেন,

"پریم چند کی کہانیوں میں گاؤں کے جیتے جاگتے لوگ نظر آتے ہیں۔ ان میں کرمی، کاچھی، دھوبی، نائی سے لے کر خان بہادر، رائے بہادر، راجہ صاحب اور ان کے اہلکاروں کی لمبی فہرست ملتی ہے۔ ان میں کسانوں کی فاقہ مستیوں، قرض، مقدمہ بازی، سرکاری اور زمینداروں کے عملہ کی ریشہ دوانیاں، ان کی نجی زندگی کی ابتری، فریب، مکاری، ضعیف الاعتقادی اور مذہبی گمراہیوں کا تفصیلی ذکر ملتا ہے"۔[৩৭০]

তার ছোটগল্পের চরিত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেগুলো জীবন্ত। তার চরিত্রগুলোর মধ্যে প্রাণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. জহির আলী সিদ্দিকী বলেন,

"ان کے کردار سماج کے جیتے جاگتے اور چلتے پھرتے انسان نظر آتے ہیں"۔[৩৭১]

প্রেমচাঁদের কথাসাহিত্যে সহজ ভাষা ব্যবহার করতেন। তিনি কম সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতেন। প্রেমচাঁদের ভাষা থেকে জানা যায় যে, তিনি গল্পের চাহিদা অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার করতেন।[৩৭২] এরকম ভাষা গল্পের আসল ভাষা হয়ে থাকে। প্রেমচাঁদ তার ছোটগল্পে যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা ছোটগল্পের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করেছেন। এতে ছোটগল্পটি মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠে এবং পাঠকের মন কেড়ে নেয়। অর্থাৎ প্রেমচাঁদ তার ছোটগল্পের চাহিদা অনুযায়ী ভাষা অনুসন্ধান করতেন এবং সেগুলোই ব্যবহার করতেন। তার ভাষা ছিল সহজ, সরল ও সাবলীল।

প্রেমচাঁদ আমাদের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক। তিনি উর্দু ছোটগল্পকে যেমন উচ্চ স্থানে নিয়ে গেছেন তেমনিভাবে অন্য কোন সাহিত্যিক নিয়ে যেতে পারেননি। বাংলায় যেমন রবীন্দ্রনাথকে ছোটগল্পের জনক বলা হয় ঠিক তেমনি উর্দু সাহিত্যে প্রেমচাঁদকে ছোটগল্পের জনক বলা হয়। তিনি উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যে ছোটগল্পের জনক হিসেবে অতীব পরিচিত।[৩৭৩]

এই জনপ্রিয় ছোটগল্পকার যদিও এ পৃথিবীতে আর নেই তবুও তিনি এখনও তার নিরলস লেখায় বেঁচে আছেন এবং জ্ঞান ও সাহিত্যের তৃষ্ণা নিবারণ করেন এবং উর্দু গদ্য সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।

কৃষণচন্দ্রঃ কৃষণচন্দ্রকে উর্দু সাহিত্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বহুমুখী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয় যিনি সৃজনশীল অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনা দিয়ে কথাসাহিত্যের জগতকে আলোকিত করতে, উর্দু কথাসাহিত্যকে নতুন দিগন্তে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। কৃষণচন্দ্র উর্দু ছোটগল্পের এমন একটি নাম যা ছাড়া উর্দু ছোটগল্পের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কৃষণচন্দ্রকে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ছোটগল্পকার বলা হয়ে থাকে।[৩৭৪] কৃষণচন্দ্রের সুন্দর ও মনোরম ভাষার জন্য তাকে গদ্যের কবি বলা হয়।[৩৭৫]

কৃষণচন্দ্র উপন্যাস লিখে বিশ্বজগতে যেমন উচ্চশিখরে আছেন তেমনি ছোটগল্পকার হিসেবেও তিনি অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. সাদিক বলেছেন,

"کرشن چندر (۱۹۱۴ء-۱۹۷۷ء) اپنی ذات میں آسان نہ تھے۔ وہ صرف ایک افسانہ نگار بلکہ اردو افسانہ نگاری کا ایک عہد تھے۔ انھوں نے لگاتار لکھا ہے اور اتنا زیادہ لکھا ہے کہ زور نویسی میں ان کا کوئی مد مقابل نظر نہیں آتا۔ انھوں نے اچھے برے، بہت برے، معیاری سطحی ہر طرح کے افسانے لکھے ہیں۔ انھوں نے افسانے کے میدان میں بہت سے تجربے بھی کئے نہیں اپنے افسانوں کی وجہ سے انھیں بے پناہ شہرت اور مقبولیت ملی، یہاں تک کہ "ایشیا کا عظیم افسانہ نگار" بھی کہا گیا کرشن چندر کے افسانوں کا موضوع انسانی زندگی رہا ہے۔ انسانی زندگی کو مختلف زاویوں سے وسیع ترین تناظر میں دیکھنے کی جو کوشش ان کے یہاں ملتی ہے وہ انھیں کا حصہ ہے"۔[৩৭৬]

কৃষণচন্দ্রের ছোটগল্পগুলো পড়ে মনে হয় তিনি গদ্যের কবিতা রচনা করেছেন এবং এর মূল কারণ ছিল তার চারপাশের পরিবেশ যা তিনি শৈশব থেকেই কাশ্মিরের প্যারাডাইস ভ্যালিতে খুঁজে পেয়েছিলেন। প্রবাহিত নদী থেকে শুরু করে সবুজ-শ্যামল মাঠ, জলপ্রপাত এবং প্রকৃতির দৃশ্য যা তার চিত্তে চিত্রের মতো লাগে। এ প্রসঙ্গে ড. ইকবাল আফাকী তার বই ‘উর্দু আফসানা’-এ কৃষণচন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন,

"کرشن چندر کے قلم میں پہاڑی ندی کا سا تیز بہاؤ ہے اور میدان میں بہنے والے دریا کا سا پھیلاؤ بھی۔ وہ دونوں کی درد پہچانتا ہے، تبھی اس نے "درد گردہ" کی نرس میں جائے جیسے شفیق اور مہربان کردار تخلیق کیے۔ کرشن چندر کے ادراک کا کینوس بہت وسیع ہے، سرینگر سے لاہور، کلکتہ اور نیچے بمبئی تک پھیلا ہوا"۔[৩৭৭]

আমাদের চারপাশে প্রচুর চরিত্র রয়েছে, তবে তাদের গল্পের পাতায় ফেলে দেওয়ার শিল্পটি কৃষণচন্দ্রের কাছে সুপরিচিত। তার গল্পগুলো এমন যা যে কোন মানুষ অনুভব করতে এবং এর একটি অংশ হতে চায়। এই উপদানটি তার লেখায় উল্লেখিত চিত্র এবং রূপকগুলোতে ভালোভাবে স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর গোপী চাঁদ নারায়ণ বলেছেন,

"کرشن چندر جیسے حساس اور جذباتی آدمی کے لئے جو اپنی سماجی شخصیت کو افسانہ کے باہر نہیں رکھ سکتے، یہ کتنا ضروری تھا کہ وہ اپنے کہانی کو خود بیان نہ کرتے بلکہ بیانیہ کے لئے کسی ایسے کردار کی تلاش کرتے جو ان کے لئے Mask کا کام کرتا"۔[৩৭৮]

তার ভাষা সারস ও যাদুকরী। কৃষণচন্দ্র ব্যথা বা কটাক্ষ, রোমান্টিকতা বা বাস্তববাদীর কলম হিসেবে পরিচিত। কৃষণচন্দ্রের কলম শৈশব থেকে তার মর্মার্থ প্রদর্শনের চেষ্টা করে চলেছে। সামগ্রিকভাবে তার ছোটগল্পে খুঁজে পায় রোমান্টিক বাস্তবের রোমান্সের এক মনোমুগ্ধকর সমাজ চিত্র ও অর্থনৈতিক শক্তির দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন, দরিদ্র মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা, তাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি বোধ করা। কৃষণচন্দ্রের ছোটগল্পের বিষয় সম্বন্ধে ফারজানা শাহিন বলেছেন,

"دوسرے افسانہ نگاروں کے مقابلے میں ان کے افسانوی موضوعات کا دائرہ وسیع ضرور ہے لہذا ان کے افسانوں میں طبقاتی نظام کی پیچیدگیوں کے علاوہ بچپن کی یادوں، فطرت پرستی، محبت، جنسی بیداریوں، فطرت انسانی کی رنگینوں، نسوانی حسن، کشمیری فسادات، ذاتی محرومیوں اور مشینی زندگی کے پیدا کردہ مسئلوں سے نہ صرف غیر معمولی دلچسپی ملتی ہے بلکہ اس سے ان کے فن کو تحریک بھی ملتی ہے، کشمیر جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا ہے، اپنی شادابیوں اور رنگینوں کے ساتھ ساتھ اہل کشمیر کی مغلوب الحالی کی منظر کشی بھی ان کے افسانوں کا اہم حصہ ہے"۔[৩৭৯]

পৌরাণিক কাহিনিতে মনোহর এবং মানব মনোবিজ্ঞানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়টিও তার ছোটগল্পে পাওয়া যায়। সামগ্রিকভাবে আমরা বর্তমান সমাজ এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মনোমুগ্ধকর দর্শনগুলোর মোহনীয় ভিজ্যুয়ালগুলোর সাথে তার ছোটগল্পে রোমান্সের একটি আকর্ষণীয় মিশ্রণ পায়। মানব মনোবিজ্ঞানের সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণাও তার ছোটগল্পে পাওয়া যায়। কৃষণচন্দ্রের কথাসাহিত্যের সর্বাধিক বৈশিষ্ট্য হলো তিনি জীবনের বাস্তবতাকে যেভাবে বুঝেন সেভাবে উপস্থাপন করেন। তিনি সহজেই তার চিন্তা প্রকাশ করার জন্য সঠিক শব্দ এবং শক্তিশালী শব্দ খুঁজে পান। ছোট ছোট ঘটনাগুলো মাথায় রেখে তার ছোটগল্পের থিম তৈরি করেন। কৃষণচন্দ্র তার শৈশব এবং যৌবনের একটি অংশ কাশ্মিরের ভূখণ্ডে কাটিয়েছেন।[৩৮০] দৃশ্যের বর্ণনা খুব সুন্দরভাবে তার সাহিত্যে

ফুটে উঠেছে। তিনি যখনই কোনো ঘটনা বা ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রবাহিত হয়েছেন বা কোনো নতুন ঘটনা আবিষ্কার করেছেন তখনই তিনি দ্রুত এটির দ্রষ্টব্য রাখতেন এবং ভবিষ্যতে এটি বিবেচনা করে একটি গল্প লিখতেন। কৃষণচন্দ্রের গল্পগুলোতে অনুভূতি ও সৌন্দর্যের উপাদানটি বেশি ছিল। তিনি সর্বদা সৌন্দর্যের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কৃষণচন্দ্র প্রগতিশীল কথাসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থপতি এবং স্তম্ভ হিসেবে রয়েছেন। কৃষণচন্দ্র উর্দুতে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ছোটগল্প লিখা শুরু করেন।[৩৮১] এর বিকাশে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন বলেছেন,

"کرشن چندر موجودہ افسانہ نویسوی میں ہر افسانہ لکھنے والے سے بہتر سمجھے جاتے ہیں اردو کی اس صنف کو جس خوبصورتی اور فنی کمالات سے انھوں نے آگے بڑھایا ہے وہ زبان وبیان کے لحاظ سے پریم چند کے کارناموں پر اضافہ خیال کیا جاتا ہے"۔[৩৮২]

সুতরাং কৃষণচন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে সাহিত্য জগতে পা রাখেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লেখালেখি চালিয়ে যান। তিনি তার জীবনে অনেকগুলো ছোটগল্প লিখেছেন। সেই ছোটগল্পের মধ্যে থেকে কিছু ছোটগল্প সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হলো।

"جامن کا پیڑ" (জামান কা পেড়) হলো কৃষণচন্দ্রের একটি মজাদার ও রোমাঞ্চকর ছোটগল্প। এই গল্পে বলা হয়েছে সচিবালয়ে একটি জামগাছ ছিল যা একটি লোকের উপরে পড়ে যায়। সকলে তা দেখে গাছের কাছে আসে, সেখানে এসে তারা ভাঙ্গা জামগাছটি দেখে দুঃখ প্রকাশ করে কিন্তু গাছের নীচে পড়ে থাকা লোকটির জন্য তারা কোনো দুঃখ প্রকাশ করেনি। তারা মনে করেছিল লোকটি মারা গেছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তারা লোকটির আওয়াজ শুনতে পায় ও বুঝতে পারে লোকটি বেঁচে আছে। এরপর তারা গাছটি সরানোর কথা চিন্তা করে; কিন্তু এর জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন। এজন্য তারা সুপারিনটেনডেন্ট এর কাছে সাহায্যের জন্য যায়; কিন্তু তিনি বলেন এই গাছটি সরকারের সেজন্য এ গাছ কাটা বা সরানোর জন্য সরকারি অনুমতি প্রয়োজন। তিনি সচিব ও আন্ডার সেক্রেটারির সাথে আলোচনা করেন। তাদের এই বিষয়ে একটি ফাইল তৈরি করতে অর্ধেক দিন কেটে যায়। তারা ফাইলটি কৃষি বিভাগের কাছে পাঠিয়ে দেয়; কিন্তু তারা বললেন, এটি ফলের গাছ এজন্য এই বিষয়ে তারা কিছু করতে পারবে না। এভাবে ফাইলটি বিভিন্ন অধিদপ্তরে পাঠানো হয়; কিন্তু কোনো লাভ হলো না। রাত হয়ে গেল। মালি বাগানে পড়ে থাকা লোকটির খাবার ব্যবস্থা করল। খাওয়ানোর সময় মালি তার সাথে কথা বলল ও তাকে জানালো যে তার ফাইল চলছে। তৃতীয় দিন হর্টিকালচার বিভাগ থেকে সাড়া পাওয়া যায়। তারা গাছটি কাটার জন্য নিষেধ করেন। কৃষণচন্দ্রের ভাষায়-

"خیرت ہے، اس وقت جب درخت اگاؤ، اسکیم بڑے پیمانے پر چل رہی ہیں۔ ہمارے ملک میں ایسے سرکاری افسر موجود ہیں جو درخت کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں، وہ بھی ایک پھل دار درخت کو! اور پھر جامن کے درخت کو! جس کا پھل عوام بڑی رغبت سے کھاتے ہیں! ہمارا محکمہ کسی حالت میں اس پھل دار درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں دے سکتا"۔[৩৮৩]

একজন পরামর্শ দিলো যে, গাছ না কেটে লোকটিকে কেটে বের করে আবার প্লাস্টিক সার্জারি করলে গাছের কোনো ক্ষতি হবে না। এজন্য ফাইলটি মেডিকেল বিভাগে পাঠানো হয়। এরপর একজন সার্জন এসে লোকটির পরীক্ষা করে বলে লোকটিকে প্লাস্টিক সার্জারি করলে লোকটি মারা যাবে। এ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হয়। এরপর রাতে মালি খাবার দিতে গিয়ে বুঝতে পারে যে লোকটি কবি। এই খবরটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, অনেক সাহিত্যিক তাকে দেখতে আসে। তারপর ফাইলটি সংস্কৃতি বিভাগকে দেওয়া হয়। কারণ তিনি কবি ছিলেন। সেই বিভাগের সচিব লোকটির সাথে দেখা করতে আসে এবং তার বইয়ের প্রশংসা করেন ও তাকে তাদের কমিটির সদস্য করে নেন। কিন্তু তিনি গাছটি সরানোর বিষয়ে কিছু করতে পারেন না। তিনি জানান যে, লোকটির মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে তারা আর্থিক সহযোগিতা করতে পারবে। তারপর ফাইলটি বনবিভাগকে দেওয়া হয়। এই বিভাগ গাছটি কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। বনবিভাগ গাছটি কাটতে আসলে তাদের বাধা দেওয়া হয়, জানা যায় যে গাছটি পনিয়ার প্রধানমন্ত্রী রোপন করেছিল। সেজন্য এই গাছ কাটলে পনিয়ার সাথে তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে। এজন্য ফাইলটি মহাপরিদর্শকের কাছে দেওয়া হয়, তিনি গাছ কাটার পরামর্শ দেন ও সকলে তা মেনে নেন। এভাবে ফাইলটি শেষ হলো কিন্তু ফাইল এর সাথে সাথে কবির জীবনও শেষ হলো। সরকারি নির্দেশনা ও নিয়ম-কানুন এর জন্য লোকটির প্রাণ চলে গেল। এটি একটি ব্যঙ্গাত্মক আখ্যান যেটিতে সরকারি ব্যবস্থা লক্ষ্যবস্তু এবং এই ছোটগল্পের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে কিভাবে অধিকারীরা দায়িত্ব পালন করে চলেছে। এই ছোটগল্পে সরকারি কার্যাবলী যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে মনে হয় সবকিছু বর্তমান কালকে প্রতিফলিত করছে।

কৃষণচন্দ্রের আরেকটি সফল ছোটগল্প হলো "کلو بھنگی" (কালু ভঙ্গি)। এর গুরুত্ব উর্দু গদ্য সাহিত্যে অপরিসীম। এই গল্পে এমন একটি মানুষ সম্পর্কে বলা হয়েছে যার ভাগ্য কৌতুকপূর্ণ। কালু ভঙ্গির ভূমিকা সত্য থেকে খুব বেশী দূরে নয়। কালু ভঙ্গির ভূমিকায় চরিত্রটি মজাদার, এমনকি দীর্ঘ শক্তিশালী কিছু প্রশ্ন রয়েছে। তার মধ্যে একটি হলো একজন মানুষ কিভাবে শোষিত হতে পারে? এ গল্পে কৃষণচন্দ্র বলেছেন যে, তার বাবা তাকে শাস্তি দিয়েছেন এবং সেই শাস্তি সে মাথা পেতে নিয়েছে। এই গল্পে সমাজ তাকে এত নিচে ঠেলে দিয়েছে যে, সে নিজেকে নিয়ে কম ভাবতে থাকে, তার আবেগ ও অনুভূতি পিষ্ট হয়েছে। কৃষণচন্দ্রের কথাসাহিত্যের গভীরতা রয়েছে, একই সাথে তিনি

কালু ভঙ্গির করুন হৃদয়কে এতটা ভালোভাবে বর্ণনা করেছেন যে, পাঠক পড়তেই তা সহজে বুঝতে পারেন। কৃষণচন্দ্র মানুষকে ভালোবাসতেন, প্রাণীকে ভালোবাসতেন এবং পাখিদেরকেউ ভালোবাসতেন। এ কারণে লেখক কালু ভঙ্গির মাধ্যমে জীবজন্তুকে ভালোবাসার প্রকাশভঙ্গি এভাবে দেখিয়েছেন,

"کالو بھنگی کو جانوروں سے بڑا لگاؤ تھا۔ ہماری گائے تو اس پر جان چھڑ گتی تھی۔ اور کمپوڈر صاحب کی بکری بھی، حلانکہ بکری بڑی بے وفا ہوتی ہے، عورت سے بھی بڑھ کر، لیکن کلو بھنگی کی بات اور تھی۔ ان دونوں جانوروں کو پانی پلائے تو کالو بھنگی، چارہ کھلائے تو کالو بھنگی، جنگل میں چرائے تو کالو بھنگی اور رات کو مویشی خانے میں باندھے تو کالو بھنگی وہ اس کے ایک ایک اشارے کو اس طرح سمجھ جاتیں جس طرح کوئی انسان کسی انسان کے بچے کی باتیں سمجھتا ہے"۔[৩৮৪]

কালু ভঙ্গির অস্তিত্ব না থাকলেও তিনি তার মনোবিজ্ঞান দিয়ে চরিত্রটিকে মুগ্ধতার সাথে অনন্য উপায়ে বর্ণনা করেছেন। কালু ভঙ্গি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ছিল এবং অসুস্থার কারণে তার সমস্ত কাজের জন্য সে দায়বদ্ধ ছিল। এ গল্পে কৃষণচন্দ্র সমাজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছেন যে, মানব ভাবতে বাধ্য হয়েছিল যে, কারো চোখে কালো জাদুটির গুরুত্ব দেখা যায়। কৃষণচন্দ্র এটিকে এত গুরুত্ব দিয়েছেন, সমাজের কাছে তার অস্তিত্ব উপস্থাপন করেছেন এবং ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করার চিন্তাশীল শৈল্পিক উপায়ে সমগ্র সমাজকে দোষ দিয়েছেন। কৃষণচন্দ্র আধ্যাত্মিকতা এবং সামাজিকতার উভয় দিকেই তুলে ধরে কালু ভঙ্গির ভূমিকা সম্পর্কে একটি চমৎকার গল্প তৈরি করেছেন। কৃষণচন্দ্র এই ছোটগল্পে একটি সচেতনতার আহ্বান করেছেন এবং খুব গুরুত্বের সাথে মানবতাবাদ বর্ণনা করেছেন। আমরা বলতে পারি যে, তার কল্পকাহিনি সমস্ত গুণাবলীর উপর নির্ভর করে। কৃষণচন্দ্র কথাসাহিত্যে কালু ভঙ্গি এর বিষয় এবং কৌশল এর দিক থেকে আলাদা। এ গল্পের মূল চরিত্র কালু ভঙ্গি একজন বিনয়ী মানুষ। এর মাধ্যমে লেখক সামাজিক বৈষম্য, উচ্চ অবমাননা এবং বর্ণবাদ নিয়ে কঠোর মন্তব্য করেছেন। কালু ভঙ্গি এর ভূমিকা অন্ধকারে আলোক প্রতীক হিসেবে উপস্থিত হয়। কৃষণচন্দ্র এ গল্পে বেচারী কালু ভঙ্গির দুর্দশার কথা এভাবে তুলে ধরেছেন,

"تمہاری تنخواہ اٹھ روپے، چار روپے کا آٹا، ایک روپے کا نمک، ایک روپے کا تمباکو، آٹھ آنے کی چائے، چار آنے کا گڑ، چار آنے کا مصالحہ، سات روپے اور ایک روپے بنیے کا، اٹھ روپے ہو گئے، مگر اٹھ روپے میں کہانی نہیں ہوتی"۔[৩৮৫]

কৃষণচন্দ্রের একটি বিখ্যাত ছোটগল্প "ایک طوائف کا خط" (এক তাওয়াইফ কা খত)। এতে দুইটি ছোট বাচ্চার কাহিনি রয়েছে যা এই দুইটি বাচ্চা বর্ণনা না করে একজন পতিতা এর বর্ণনা করে। পতিতা

এই বাচ্চা দুইটি কিনে নিয়ে আসে। মেয়ে দুটির নাম বেলা ও বাতুল। মুসলিম দালালের কাছ থেকে ৩০০ টাকা দিয়ে সে বেলাকে কিনে। এই মুসলিম দালাল মেয়েটিকে দিল্লী থেকে নিয়ে এসেছে, যেখানে বেলার বাবা-মা থাকতেন। বেলার বাবা-মা রাওয়ালপিন্ডির হাউজের সামনের রাস্তায় থাকতো এবং তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত পরিবারের আভিজাত্য ও সরলতা ছিল। সে পিতা-মাতার একমাত্র কন্যা এবং চতুর্থ শ্রেণিতে পড়াশোনা করছিল। বেলা স্কুল থেকে পড়াশোনা করে বাড়ি আসছিল এবং সে দেখছিল একদল লোক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এবং লোকজন তাদের শিশু নারীকে ঘর থেকে বের করে হত্যা করছিল, নিজের চোখে সে দেখল তার বাবা-মার হত্যাকাণ্ড। তারপর সে দেখল তার মা চোখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। নৃশংস মুসলমানরা তার বক্ষ কেটে ফেলে দিয়েছিল, যা থেকে একজন মা, একজন হিন্দু বা মুসলিম মা বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ান এবং মানবজীবনে মহাবিশ্বের সৃষ্টির এক নতুন অধ্যায় উন্মুক্ত করেন। কেউ সৃষ্টির প্রতি এত নিষ্ঠুর হতে পারে কৃষণচন্দ্রের ভাষায় পতিতা বলে,

"میں نے قرآن پڑھا ہے اور میں جانتی ہوں کہ راولپنڈی میں بیلا کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسلام نہیں تھا وہ انسانیت نہ تھی۔ وہ دشمنی بھی نہ تھی۔ وہ انتقام بھی نہ تھا۔ وہ ایک ایسی سقادت، بے رحمی، بزدلی اور شیطنت تھی جو تاریکی کے سینے سے پھوٹتی ہے اور نور کی آخری کرن کو بھی داغدار کر جاتی ہے"۔[৩৮৬]

একটি মুসলিম মেয়ে বাতুল আর বেলার জন্ম এক হিন্দু পরিবারে; কিন্তু আজ দুজনে পার্সিয়া রোডের একটি বাড়িতে বসে আছে। বাতুল তার বাবা-মার প্রিয় মেয়ে সাতজনের মধ্যে কনিষ্ঠ, সবচেয়ে মধুর, সবচেয়ে সুন্দর। সে পড়াশোনা জানে না, তাকে পতিতা এক হিন্দুর পিম্পর এর কাছ থেকে ৫০০ টাকা দিয়ে কিনেছিল। বেলা এবং বাতুল দুটি মেয়ে, দুটি জাতি, দুটি সভ্যতা, এখানে একটি মন্দির ও একটি মসজিদ রয়েছে। বেলা ও বাতুল নোংরা ব্যবসা পছন্দ করেনা। পতিতা বলে আমি তাদের কিনেছি। আমি চাইলে তাদের কাছ থেকে সুবিধা নিতে পারি, তবে আমি মনে করি রাওয়ালপিন্ডি ও জলন্ধর তাদের নিয়ে যে কাজটি করেছে তা আমি করবো না। আমি এ পর্যন্ত এদের পার্সিয়া রোডের জগত থেকে আলাদা রেখেছি। তবুও যখন আমার ক্লায়েন্টরা পেছনের ঘরে দিয়ে মুখ ধুয়ে যায়, তখন বেলা এবং বাতুলের চোখ আমাকে বলতে শুরু করে যে, আমি তাদের যত্ন করি না। পন্ডিত আমি চাই আপনি আপনার মেয়েকে বাতুল বানান। জিন্নাহ আমি চাই যে, আপনি আপনার মহান আক্তার হিসেবে বেলাকে ভাবুন। এ পত্রটি নোয়াখালী থেকে রাওয়ালপিন্ডি এবং ভরতপুর থেকে মুম্বাই পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বেলা ও বাতুল সম্পর্কে কৃষণচন্দ্রের ভাষায়,

"بیلا اور بتول دو لڑکیاں ہیں۔ دو قومیں ہیں دو ہد میں دو مندر اور مسجد ہیں"۔[৩৮৭]

কৃষণচন্দ্র এই গল্পে বোঝাতে চেয়েছেন যে, হিন্দু ও মুসলিম যাই হোক আমরা সবাই মানুষ। আমাদের নিজেদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে।

কৃষণচন্দ্রের আরেকটি ছোটগল্পের নাম হলো "اجنبی آنکھیں" (আজনবী আঁখে)। এই ছোটগল্পে লেখক প্রধান চরিত্রের নাম দিয়েছেন বিডিএ সরণি। তার বর্ণনা তিনি ছোটগল্পের শুরুতে এভাবে তুলে ধরেছেন,

"اس کے چہرے پراس کی آنکھیں بہت عجیب تھیں۔ جیسے اس کا سارا چہرہ اس کا اپنا ہو اور آنکھیں کسی دوسرے کی ہوں اور اس کے چہرے پر لا کے پپوٹوں کے پیچھے محصور کر دی گئی ہوں اس کی چھوٹی نوکدار ٹھوڑی پچکے ہوئے ہو اور چوڑے چوڑے کلوں کے اوپر دو بڑی بڑی گہری سیاہ آنکھیں کچھ عجیب سی لگتی تھیں۔ پورا چہرا ایک جلاگ ذہن شاطر خود غرض کمینے کا چہرہ تھا"۔[৩৮৮]

তার চোখ মুখের উপর খুব অদ্ভুত ছিল যেন তার সমস্ত চেহারা তার নিজস্ব এবং চোখ অন্য কারো মুখের উপর চোখের পাতা আটকে আছে। তার কালো দু'টি চোখ দেখতে অদ্ভুত লাগছিল। একজন চতুর, বুদ্ধিমান, স্বার্থপর, দুশ্চরিত্র মানুষটির মুখ লেখক এখানে তার চোখে জালিমের চোখ বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিডি সরণি একসময় দরিদ্র সিন্ধি ছিল। পঁয়ত্রিশ বছর আগে দুইশো ডলার নিয়ে হংকংয়ে এসেছিল। সে এখন অনেক বড় লোক। সে দুই নাম্বারি ব্যবসা করে। একটি পোশাকের দোকান রয়েছে, যেখানে বোর্ডে লেখা থাকে বিডি দোকান ২৪ ঘন্টা প্রস্তুত থাকে। দোকানের আড়ালে তার অসৎ কাজ চলে। তারপর একটি চায়ের দোকানের আড়ালে একটি ক্যাসিনো ও মেয়েদের ব্যবসা চলে সেখান থেকেও সে অনেক টাকা পয়সা উপার্জন করে। এরপরও সে একটি ব্যাংক বিল্ডিং এর মালিক। সেখান থেকে প্রতিমাসে ১১০০০ টাকা ভাড়া পায়। লেখক বিডিএ সরণির বাড়ির বর্ণনা এভাবে তুলে ধরেছেন,

"اس کا گھر بہت عمدہ تھا۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی ڈھلوان پر۔ وہاں سے بانگ کانگ کا سارا منظر نظر آتا تھا۔ اس کی بیوی بہت ہی گھریلو اور سیدھی سادی عورت تھی۔ دو بچیاں تھیں۔ بڑی پیاری اور معصوم۔ ایک دس سال کی ہوگی۔ دوسری کوئی بارہ تیرہ سال کی ہوگی"۔[৩৮৯]

তার বড় মেয়েটি বিবাহিত। তার স্বামী মার্কিন সিন্ধি ব্যবসা করে। দক্ষিণ আমেরিকার বড় ব্যবসায়ী তার দুটি সন্তান রয়েছে। যাই হোক বিডি এসব কিছু নিয়ে অনেক খুশি রয়েছে। সে বলে আমি ৩৫ বছর আগে ২০০ ডলার নিয়ে এসেছি। আজ আমার দুই মিলিয়ন সম্পত্তি রয়েছে; কিন্তু রাত দশটা বাজলে তার চোখ থেকে এমনি এমনি অনেক পানি ঝরে অনেক রুমাল ভিজে যায়। তবুও পানি পড়তে থাকে। সে বলে আমার এই দুনিয়াতে কোনো সমস্যা নেই। শুধু এই একটি সমস্যা। অনেক বড় বড় চিকিৎসক দেখিয়েছেন; কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। কোন চিকিৎসক কোন রোগ ধরতে

পারেনি। লেখক এ গল্পের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন যে, অসৎ উপায়ে উপার্জন করলে, তার পরিণতি কখনও ভালো হয়না।

"ممتا" (মামতা) কৃষণচন্দ্রের আরেকটি সফল ছোটগল্প। এই গল্পে মায়ের মমতার কথা বলা হয়েছে।

রাত যখন দুইটা বাজে তখন মায়ের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তার দুই ছেলে ওয়াহিদ ও মাহমুদ। মাহমুদ লাহোরে পড়াশুনা করে। আর ওয়াহিদ তার মায়ের কাছে আছে। তার বাবা ও অন্যান্যরা ঘুমিয়ে আছে তার মা স্বপ্ন দেখেন যে মাহমুদের জ্বর এসেছে। আর এই স্বপ্ন দেখে তিনি আর ঘুমাতে পারছেন না। জোরে জোরে কাঁদছেন। ওয়াহিদ জিজ্ঞাসা করে, তুমি কেন কাঁদছো? মা তখন কৃষণচন্দ্রের ভাষায় বলেন,

"ہاں اور تمہیں کس بات کی فکری ہے۔ امل ہچکیاں اور بھی تیز ہو گئی پتہ نہیں میرا لال اس وقت کس حالت میں ہے میرا چھوٹا محمود، اور تم یہاں بڑے آرام سے سو رہے ہو۔ وہاں اس کا کون ہے۔ نہ ماں، نہ بھائی، نہ بہن اور تو یہاں خراٹے لے رہے ہو آرام سے جیسے تمہیں کسی بات کی فکر ہی نہیں"۔[৩৯০]

অনেক দিন হলো মাহমুদ এখনো লাহোর থেকে ফিরে আসেনি, তাই তার মায়ের মন খুব খারাপ ছিল। কিছুকাল পরে হঠাৎ করে মাহমুদের কাছ থেকে একটি চিঠি আসে চিঠির প্রথমদিকে লেখা ছিল আমি অসুস্থ। আমার জ্বর হয়েছে, তবে এখন একটু কম আছে। এখানে কিছুদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। যদি লাহোরের এই অবস্থা হয় তাহলে ইসলামাবাদে কি অবস্থা। মায়ের মন ব্যাকুল হয়ে গেল। মায়ের মন বলে মাহমুদের জ্বর এখনো ভালো হয়নি। তিনি তার আঁচল দিয়ে মুখ মুছেন আর বলেন আমাকে একটি মোটর গাড়ি এনে দাও। আমি এখনই লাহোর যাব। এ কথাগুলো তার বাবা কানে নেয় না সে আবার ঘুমাতে শুরু করলো। কিন্তু মা ও মায়ের মমতা কখনো ঘুমাতে পারে না মাহমুদের জন্য ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। হঠাৎ একদিন মাহমুদকে দেখে তার মা অনেক কাঁদতে থাকেন। মা ও ছেলের মধ্যে অশ্রু ফেটে যাচ্ছিল আর তা হচ্ছে আনন্দের অশ্রু। এই পৃথিবীতে আমরা একা নই, আমাদের সাথে আমাদের মা রয়েছেন। মানুষ যত প্রার্থীব ঝামেলা ও কষ্টের মধ্যে থাকুক না কেন সে মায়ের কাছে এসে সবকিছু ভুলে যায়। একজন মায়ের আবেগ প্রেমের মধ্যে একটি করুণা স্নেহমমতা চিরন্তন এবং তার সারাংশ শিশুদের মধ্যে প্রেরণ করেন। স্বামী স্ত্রী বছরের পর বছর এক সাথে থেকেও এক সময় চলে যেতে পারে। প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। বন্ধু-বান্ধবকে ছেড়ে চলে যেতে পারে; কিন্তু কোনো মা সন্তানকে রেখে চলে যেতে পারেন না। তিনি তো মমতাময়ী।

কৃষণচন্দ্র "ان داتا" আনদাতা নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ কল্পকাহিনি লিখেছেন, যা ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৯১] এই রূপকথার প্রতিপাদ্য হচ্ছে বাংলায় দুর্ভিক্ষ। কৃষণচন্দ্র দুর্ভিক্ষ এবং এর ফলে যে ভয়াবহ পরিস্থিতি হয়েছে তা চিত্রিত করতে একটি কৌশল ব্যবহার করেছেন এবং এ গল্পটি কৌশলগত দিক থেকে অনন্য এবং স্বতন্ত্র। এতে তিনি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীদের ওপর তীর ছুড়ে মারেন। ধনী ব্যক্তিরা একইভাবে সজ্জিত এবং ব্যবসায়ীরা দুর্ভিক্ষের সুযোগ গ্রহণ করে। কেবল সাধারণ মানুষই এই ক্ষুধা বা দুর্ভিক্ষের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। কৃষণচন্দ্রের বিখ্যাত এই কিংবদন্তি বাংলায় দুর্ভিক্ষের বিষয়ে লিখা। কৃষণচন্দ্র একে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

"باب اول: وہ آدمی جس کے ضمیر میں کانٹا ہے۔ باب دوم: وہ آدمی جو مر چکا ہے۔ باب سوم: وہ آدمی جو ابھی زندہ ہے"۔[৩৯২]

এই সময়কালে বাংলার গ্রামীণ জীবন একটি ট্র্যাজেডি ছিল। কারণ কয়েক দানা শস্যের জন্য মানুষ মানুষকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কিংবদন্তির উদ্ধৃতিটি হলোঃ

"خاوند رکشاوالے صاحب کی خوشامد کرتا ہے۔ یہ نوجوان عورت مادر زاد ننگی ہے۔ اسے یہ پتہ نہیں وہ جوان ہے۔ وہ عورت ہے وہ صرف بد جانتی ہے کہ وہ بھوکی ہے اور یہ کلکتہ ہے۔۔۔ بھوک نے حسن کو بھی ختم کر دیا ہے"۔[৩৯৩]

এ পরিস্থিতিতে দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার জন্য একজন ব্যক্তি শহরে যান, তবে কোনো উপায় নেই, ক্ষুধার কারণে তিনি নিজের জীবন বাঁচান না। তিনি রাজনীতিবিদদের দ্বারা মারা যান। এই ছোটগল্প সম্বন্ধে আলে আহমেদ সরুর বলেছেন,

"ان داتا بنگال کے قحط کی سچی تصویر نہیں خیالی مرقع ہے مگر کرشن چندر نے اس خیالی تصویر میں حقیقت کی تابناکی بھر دی ہے"۔[৩৯৪]

কৃষণচন্দ্রের আরেকটি ছোটগল্প "دو فرلانگ لمبی سڑک" (দোফারলাঙ্গ লম্বী সড়ক)। এটি এমন একটি পৌরাণিক কাহিনি যা কেবল প্লটের বন্দিদশা থেকে মুক্ত নয়, অভ্যন্তরীণ, সৃজনশীল এবং অনির্দিষ্ট অভিব্যক্তির উদারহণ দেয় এবং কাল্পনিক ও অলংকারিক পদ্ধতি উভয়ই ঘটেছে। এই ছোটগল্পের অঙ্গভঙ্গি, সুর, দৃষ্টান্তগুলোর মাধ্যমে জীবনের বড় এবং তিক্ত বাস্তবতা প্রকাশিত হয়। এই ছোটগল্পে দীর্ঘ সড়কের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এমনভাবে সাজানো হয়েছে; যাতে কিংবদন্তির সামগ্রিক ছাপ ইতিবাচক হয়। এই ছোটগল্পের প্রথমে লেখক এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"کچہریوں سے لے کر لا کالج تک بس یہی کوئی دو فرلانگ لمبی سڑک ہوگی، ہر روز مجھے اسی سڑک پر سے گزرنا ہوتا ہے، کبھی پیدل، کبھی سائیکل پر، سڑک کے دورویہ شیشم کے سوکھے سوکھے اداس سے درخت کھڑے ہیں ان میں نہ حسن ہے نہ چھاؤں سخت کھردرے تنے اور ٹہنیوں پر گدھوں کے جھنڈ یہ سڑک صاف سیدھے اور سخت ہے۔ متواتر نو سال سے میں اس پر چل

رہاہوں، نہ اس میں کبھی کوئی گڑھا دیکھا ہے، نہ شگاف، سخت سخت پتھروں کو کوٹ کوٹ کر یہ سڑک تیار کی گئی ہے۔اور اب اس پر کول تار بھی بچھی ہے، جس کی عجیب سی بو گرمیوں، میں طبیعت کو پریشان کر دیتی ہے"۔[৩৯৫]

"پشاور ایکسپریس" (পেশোয়ার এক্সপ্রেস) কৃষণচন্দ্রের একটি অদ্ভূত ছোটগল্প। এই ছোটগল্পের প্রধান চরিত্র কোন মানুষ নয়; বরং রেলগাড়ী যা পেশোয়ার থেকে বোম্বে ভ্রমন করে।[৩৯৬]

এতে ট্রেনের গাড়িকে মূল চরিত্র হিসেবে ধরা হয়। কৃষণচন্দ্র ট্রেনের মাধ্যমে বর্তমান সময়ের পরিস্থিতি এবং ঘটনাগুলোকে প্রাণবন্ত চিত্রিত করেছেন। নির্দিষ্ট সম্প্রদায় এবং নিপীড়িতদের নিয়ে প্রতিটি স্টেশনে ঘটে যাওয়া লজ্জাজনক ও মানবিক ট্র্যাজেডি দেখে ট্রেন। ট্রেন নিজের চোখে যা দেখে তা ট্রেনের মাধ্যমে লেখক এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"لڑکی جنگل میں گھاس کے فرش پر تڑپ کر مر گئی، اس کی کتاب اس کے خون تر بتر ہو گئی کتاب کا عنوان تھا اشتراکیت عمل اور فلسفہ از جان سٹریچی، وحشی درندے انھیں نوچ نوچ کر کھا رہے تھے اور کوئی بولتا نہیں۔اور کوئی آگے نہیں بڑھتا۔اور عوام میں سے کوئی انقلاب کا دروازہ نہیں کھولتا۔اور میں رات کی تاریکی آگ اور شراروں کو چھپا کے آگے بڑھ رہی ہوں اور میرے ڈبوں میں لوگ شراب پی رہے ہیں اور مہاتما گاندھی کے بے کار بلا رہے ہیں"۔[৩৯৭]

প্লাটফর্ম থেকে চলে যাওয়ার পরে রেলগাড়ির অনুভূতি লেখক এভাবে তুলে ধরেছেন,

"اور جب میں پلیٹ فارم سے گزری تو میرے پاؤں ریل کی پڑی سے پھلے جاتے تھے جیسے میں ابھی گر جاؤں گی۔اور گر کر باقی ماندہ مسافروں کو بھی ختم کر ڈالوں گی"۔[৩৯৮]

কৃষণচন্দ্রের আরেকটি ছোটগল্প "اندھا چھترپتی" (আন্ধা ছত্রপতি)। তিনি এতে ভারতীয় সমস্যাগুলো এবং বিশেষত কাশ্মিরের গ্রামীণ জীবন অত্যন্ত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। ছত্রপতি হলো সেই রূপকথার নায়ক যার বর্ণনা লেখক এভাবে দিয়েছেন,

"چھترپتی ان سب سے نرلا تھا وہ ہمیشہ خاموش رہتا۔آہستہ آہستہ رہستہ ٹٹولتے گذر جاتا"۔[৩৯৯]

তার বাবা মা মারা যাওয়ার পরে সে এতিম হয়ে যায়। তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য সে কঠোর পরিশ্রম করতো। সে আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশিদের বিভিন্ন কাজ করে দিতো। তবুও তাকে কেউ পছন্দ করতো না। তাই সে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে যায়। দুই বছর ছত্রপতি শহরে যেভাবে কাটিয়েছে, তার বর্ণনা লেখক এভাবে দিয়েছেন,

"چھتر پتی نے دوسال جس طرح گزارا ر یہ کچھ اسے ہی اچھی طرح معلوم تھا۔ ہر مہینہ وہ اپا پیٹ کاٹ کر جس طرح بھی ہوتا تیس۔پینتیس روپے مکھنی کے باپ بھیج دیتا تھا۔ ہر مہینے اسے مکھنی کے باپ کے ایک دوخط آجاتے تھے۔ جس میں اس کی انیوالی شادی کا تذکرہ ہوتا تھا۔اور ہاں اور روپوں کا تقاضا بھی، پہلے ساتھ مہینے تو اسے برابر خط آتے رہے۔ مگر پھر یکایک خط آتے بند ہو گئے"۔ [৪০০]

সে শহরে গিয়ে পরিশ্রম করে অনেক টাকা-পয়সা উপার্জন করে। গ্রামবাসী তার টাকা-পয়সা দেখে তাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করলো। টাকার জন্য তার সাথে মাখনির বাবা মাখনিকে বিয়ে দিতে চাইল। ছত্রপতিকে বলল, বিয়ের জন্য অনেক খরচ করতে হবে। এজন্য তুমি আবার শহরে যাও টাকা উপার্জন করে নিয়ে এসো। তাহলে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দিবো। এভাবে ছত্রপতি আবার শহরে যায় এবং প্রতি মাসে মাখনির বাবাকে কিছু টাকা-পয়সা পাঠায়। তারপর যখন সে আবার শহর থেকে গ্রামে ফিরে তখন দেখে যে মাখনির বাবা তাকে একজন বয়স্ক লোকের সাথে বিয়ে দিয়ে দেয়। মাখনি খুশিতে তা বরণ করে নেয়। এই ছোটগল্পে গ্রামীণ জীবনের ছবিগুলো লেখক সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। মাখনি নিজের ভাগ্যকে ভালো ভাগ্য মনে করে। অর্থাৎ গ্রামের মেয়েরা ভাগ্যকে সহজে মেনে নেয়।

"زندگی کے موڑ پر" (জিন্দেগী কে মোড়পর) কৃষণচন্দ্রের একটি দীর্ঘ কাহিনি; যেখানে তিনি ভারতীয় উপাদান এবং গ্রামীণ সমাজের বহু বছরের পুরানো ঐতিহ্য এবং গ্রামীণ জীবনের সমস্যাগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কৃষণচন্দ্র নিজেই "জিন্দেগী কে মোড় পর" গল্পের প্রারম্ভে উদ্ধৃতাংশ এভাবে তুলে ধরেছেন,

"زندگی کے موڑ پر میرا پہلا طویل مختصر افسانہ ہے،اور شاید اب بھی مجھے یہ اپنے تمام افسانوں میں سب سے زیادہ پسند ہے۔اس میں وسطی پنجاب کے ایک قصبہ کا مرقع پیش کیا گیا ہے اور اس قصباتی پس منظر کو لیکر شادی۔ بڑا ہمتی نظام زندگی عشق کی خود کشی اور ان سے متعلق مسائل سے پیدا ہونیوالے فکری اور جذباتی ماحول کی آئینہ داری کی گئی ہے۔ جہاں تک ان مسائل سے پیدا ہونیوالی فکری اور ذہنی الجھنوں کا تعلق ہے۔آپ انکی نفسیاتی تشریح کی ایک واضح صورت اس کہانی میں دیکھیں گے۔ لیکن راہ نجات ابھی بہت دور ہے"۔ [৪০১]

কৃষণচন্দ্র তার কল্পিত "بھگت رام" (ভগৎ রাম) গল্পটিতে এক গ্রামের ছেলে ভগৎ রামের জীবন দেখিয়েছেন। ভগৎ রূপকথার কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং একজন ভালো মানুষ। তিনি অত্যন্ত সৎ মানুষ ছিলেন এবং তার অন্তর মানবতায় পূর্ণ ছিল। অন্যের কষ্ট দেখে তিনি মরিয়া ছিলেন। তিনি বর্ণভেদে বৈষম্য করেননি।

"امر تسری آزادی سے پہلے" (আমর তেসরি আজাদি সে পেহলে) কৃষণচন্দ্রের একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ ছোটগল্প। এই গল্পে বেশ কয়েকটি হিন্দু, মুসলিম চরিত্রের সাথে নারীদের দেখা যায়। ওম প্রকাশ ও সিদ্দিক হিন্দু ও মুসলিম চরিত্র, প্রতিটি চরিত্রের নিজস্ব জায়গা রয়েছে এবং তাদের ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। এ গল্পে আমরা আরেকটি দিক দেখতে পাই তা হলো সুন্দর গ্রামীন দৃশ্য, যা ছোটগল্পটিকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে। তিনি এই ছোটগল্পটি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন গ্রামীন চিত্রটি পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত। তিনি আরও বলেছেন যে অমৃতসরে বসবাসকারী হিন্দু, মুসলমান এবং শিখ ধর্মাবলম্বী ছিল; কিন্তু তারা একসাথে মিলেমিশে বসবাস করতো। তাদের বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও তারা একে অপরের উৎসবকে সম্মান করতো। কোন সম্প্রদায়ের কুসংস্কার এবং বিদ্বেষ ছিল না।

উপরোক্ত ছোটগল্প ছাড়াও কৃষণচন্দ্র অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোট গল্পের সংগ্রহগুলো হচ্ছে- ১. طلسم خیال (তালসিমে খেয়াল)-১৯৩৯ খ্রি.। ২. نظارے (নাজারে)- ১৯৪০ খ্রি.। ৩. ہوائی قلعے (হাওয়ায়ে কেল্লে)-১৯৪০ খ্রি.। ৪. ان داتا (আন দাতা)-১৯৪২ খ্রি.। ৫. زندگی کے موڑ پر (জিন্দেগী কে মোড় পর)-১৯৪৩ খ্রি.। ৬. ٹوٹے ہوئے تارے (টুটে হোয়ে তারে)-১৯৪৩ খ্রি.। ৭. نئے افسانے (নয়ে আফসানে)-১৯৪৩ খ্রি.। ৮. نغمے کی موت (নাগমে কি মওত)-১৯৪৪ খ্রি.। ৯. پرانے خدا (পুরানে খোদা)-১৯৪৪ খ্রি.। ১০. اجنتا سے آگے (আঝন্না সে আগে)-১৯৪৮ খ্রি.। ১১. ایک گرجا ایک خندق (এক গিরজা এক খন্দক)-১৯৪৮ খ্রি.। ১২. پھول کی تنہائی (ফুল কি তানহায়ী)। ১৩. سونے کا صدو قنچہ (সোনে কা ছদ ও কাঞ্চা)। ১৪. سمندر دور ہے (সমুন্দর দূর হ্যা)-১৯৪৮ খ্রি.। ১৫. تاش کا کھیل (তাস কা খেল।)। ১৬. تین غنڈے (তিন গুন্ডে)-১৯৪৮ খ্রি.। ১৭. پل کے سائے میں (পল কে সায়ে মে)-১৯৪৯ খ্রি.। ১৮. ہم تو محبت کرے گا (হাম তো মহব্বত করে গা)। ১৯. ہم وحشی ہیں (হাম ওহাশী হ্যায়)-১৯৪৮ খ্রি.। ২০. کشمیر کی کہانیاں (কাশ্মির কি কাহানিয়া)-১৯৪৯ খ্রি.। ২১. کھڑکیاں (খিড় কিয়াঁ)। ২২. کہکشاں (কেহকুশাঁ)। ২৩. الٹا درخت (উল্টা দারখত) ২৪. ایک خوشبو آڑی آڑی سی (এক খুশবু আড়ি আড়ি সী)। ২৫. دشت خیال (দাসতে খেয়াল)। ২৬. دل کسی کا دوست نہیں (দিল কিসি কা দোস্ত নেহি)। ২৭. دوسری برف کے بعد (দোসরী বারফ কে বাদ)। ২৮. شکست کے بعد (শিকাস্ত কে বাদ)-১৯৫১ খ্রি.। ২৯. گھونگھٹ میں گوری جلے (খুনঘট মে গোরী জ্যালে)-১৯৫২ খ্রি.। ৩০. مینا بازار (মিনা বাজার)-১৯৫৩ খ্রি.। ৩১. میں انتظار کروں گا (মে ইনতেজার করুঙ্গা)-১৯৫৩ খ্রি.। ৩২. نئے غلام (নয়ে গোলাম)-১৯৫৩ খ্রি.। ৩৩.

مزاحیہ افسانے (মাজাহিয়া আফসানে)-১৯৫৩ খ্রি.। ৩৪. ہائیڈروجن بم کے بعد (হাইড্রোজেন বম কে বাদ)-১৯৫৫ খ্রি.। ৩৫. یوکاپٹس کی ڈالی (ইউক্যাপিটাস কি ডালি)-১৯৫৫ খ্রি.। ৩৬. ایک روپیہ ایک پھول (এক রোপিয়া এক ফুল)-১৯৫৫ খ্রি.। ৩৭. طوفان کی کلیاں (তুফান কি কলিয়া)। ৩৮. کاک ٹیل (কাক টাল)। ৩৯. کلا سورج (কালা সুরুজ)। ৪০. کالے کوس (কালে কোস)। ৪১. کانچ کے ٹکڑے (কাঁচ কে টুকড়ে)। ৪২. کسان اور دیوتا (কিসান অওর দেবতা)। ৪৩. کبوتر کے خط (কবুতর কে খত)। ৪৪. کتاب کا کفن (কিতাব কা কাফন)-১৯৫৬ খ্রি.। ৪৫. کرشن چندر کے افسانے (কৃষণচন্দ্র কে আফসানে)-১৯৬০ খ্রি.। ৪৬. مسکرانے والیاں (মুসকুরানে ওয়ালিয়া)-১৯৬০ খ্রি.। ৪৭. سپنوں کا قیدی (সপ্নোঁ কা কায়েদী)-১৯৬৩ খ্রি.। ৪৮. سپنوں کی رہگذر میں (সপ্নোঁ কি রবগীন্দর মে)। ৪৯. ہسنیتی تال (হাসনিয়তী তাল)-১৯৬৪ খ্রি.। ৫০. ومواں پل (ওমওয়ান পল)। ৫১. پانچ لوفر (পাঁচ লোফার)১৯৬৬ খ্রি.। ৫২. پانچ لوفر ایک ہیروئن (পাঁচ লোফার এক হিরোইন)-১৯৬৬ খ্রি.। ৫৩. پہلا پتھر (পেহলা পাথ্থর)। ৫৪. گلشن گلشن (গুলশান গুলশান)। ৫৫. ڈھونڈا تجھ کو (ঢুন্ডা তুজ কো)। ৫৬. پانی کا درخت (পানি কা দরখত)-১৯৬৮ খ্রি.।[৪০২]

আধুনিক পৌরাণিক কাহিনিতে তিনি লোকসাহিত্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি বরং লোকসাহিত্যের উপাদানকে তার গল্পগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করে আরও প্রাণবন্ত উপায়ে বর্ণনা করেছেন। তার লিখনীতে তিনি এমন শব্দ ব্যবহার করেন, যা পাঠক হৃদয়কে প্রভাবিত করে। তার ভাষা সম্বন্ধে ওকার আজীম বলেছেন,

"کرشن چندر کی تحریروں کی سب سے زیادہ خصوصیت ان کا کبھی نہ تھکنے اور تھکانے والا انداز ہے۔ ان کے پاس ہر بات کے کہنے کا ایک ایسا طریقہ ہے۔ جو سیدھا دل میں اثر کرتا ہے۔ اس انداز بیان کا حسن یہ ہے کہ افسانہ نگار کو جو کچھ کہنا ہے وہ اسی انداز میں گھل مل کر ایک جان ہو گیا ہے"۔[৪০৩]

তার ভাষা সহজ ও সরল ছিল। তিনি যা বলতেন চান তা সহজেই শব্দ চয়ন করে তার ছোটগল্পে ব্যবহার করেন। এতে তার ছোটগল্পের ভাষা সহজেই পাঠক অনুধাবন করতে পারে।

যাই হোক কৃষণচন্দ্রের নির্মিত চরিত্রগুলো বরাবরই বর্বরতার সাথে লড়াই করে বলে মনে হয়। কৃষণচন্দ্রের ছোটগল্পের চরিত্র জীবন্ত।[৪০৪] চরিত্র চিত্রায়নে তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছেন। তিনি জানতেন কোন ঘটনায় কি ধরনের চরিত্র উপস্থাপন করা যায়। এ প্রসঙ্গে ড. জহির আলী সিদ্দিকী বলেছেন,

"کرشن چندر کردار اعلی اور ادبی دونوں طبقات سے متعلق ہیں کردار سازی میں انھیں ملکہ حاصل ہے۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے موقع پر، کس طرح کے کردار کو کس انداز میں پیش کیا جائے"۔ [৪০৫]

যে কোন বিষয়ে তার লেখা গল্পটি গভীরভাবে অনুভব করা যায় কারণ তিনি গল্পটি দৃশ্য থেকে পৃথক করেন না। কৃষণচন্দ্রের কল্পকাহিনি পড়ে এটা অনুধাবন যোগ্য যে, তিনি মানুষের অন্তর খুব ভালোভাবে বুঝতেন। তিনি মানুষের অনুভূতি বুঝতে পারেন। কৃষণচন্দ্রের শুরুর দিকে ছোটগল্পগুলো রোমান্টিক ছিল এবং রোমান্টিক ছোটগল্পকার হিসেবে তিনি অনেক খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। ড. মুহাম্মদ হুসেন বলেছেন,

"اس کی کہانیوں کا سفر رومان سے شروع ہوا"۔ [৪০৬]

তিনি রোমান্টিক কাহিনিতে তার জীবন ব্যয় করেছেন। তিনি সত্যিকারের প্রেমীদের গল্পটি বর্ণনা করেন, যা সুখ এবং ভালোবাসা সাফল্যের সাথে পরিণতি লাভ করে। মুহাম্মদ হুসেন আসকারী বলেছেন,

"اگر رومانیت سے یہ مطلب کیا جائے تو میں کہوں گا کہ کرشن چندر کی رگ رگ رومانی ہے۔ اور وہ اس رومانیت کی اردو میں عظیم ترین مثال ہے انسانیت سے محبت میں اگر کوئی کرشن چند کا مقابل ہو سکتا ہے تو وہ ہیں پریم چند مگر پریم چند میں خواہ یہ جذبہ زیادہ وسیع ہو مگر اتنا شدید نہیں ہے جتنا کرشن چندر میں اور نہ ان میں ایسی بغاوت اور سرکشی اور دنیا کے نظام کو یکسر بدل دینے کی ایسی آرزو ہے اور ان چیزوں کے بغیر یہ درمانیت جیسے میں نے سچی اور صحت مندانہ کہا ہے۔ تشنہ تکمیل رہ جاتی ہے تو یہ ہے کرشن چندر کی اصلی رومانیت جس سے اس کا ایک بھی افسانہ خالی نہیں ہے"۔ [৪০৭]

তার কথা সাহিত্যে শুধু কাশ্মির উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয় ভারতীয়দের প্রেমময় হৃদয়ের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য রয়েছে।

কৃষণচন্দ্র কোন একটি জাতির, একটি বর্ণ, একটি সম্প্রদায়ের লেখক নন তিনি পুরো মানবতার লেখক। তিনি ধর্মনিষ্ঠভাবে সাহিত্যের ভক্ত। তিনি তার ছোটগল্পে এমন কৌশল ব্যবহার করেন যা ছোটগল্পগুলো অসাধারণ হয়ে উঠে। তিনি বিষয়বস্তু ও স্টাইলে কথাসাহিত্যে অনন্য সংযোজন করেছেন। সৈয়দ এহতেসাম হুসেন লিখেছেন,

"تکنیک ان کے ہاتھوں میں گیلی مٹی کی طرح ہے جسے وہ اپنے غیر معمولی فن اور ادراک کی مدد سے حسین سانچوں میں ڈھال سکتے ہیں"۔ [৪০৮]

প্রকৃতপক্ষে কৃষণচন্দ্রের ছোটগল্পের বিষয়গুলোর বৈচিত্র্য রয়েছে। সেগুলো রোমান্স হোক বা কমিউনিজম, শান্তি বা যুদ্ধ, সামাজিক সমস্যা বা সংস্কৃতি, বেঁচে থাকার লড়াই, উন্নত জীবনের লড়াই, জীবনে তিক্ততা, ঘটনা, দাঙ্গা, কোরিয়ান যুদ্ধ, চীনের আগ্রাসন, বাংলার খরা, কাশ্মিরের সুন্দর সুন্দর নারী, প্রবাহিত জলপ্রপাত, গ্রামের নির্মল পরিবেশ, শহরের অশান্ত পরিবেশ, ভালোবাসার সৌন্দর্য এবং মনোবিজ্ঞান, ক্ষুধার তীব্রতা, দারিদ্র, রাজনৈতিক সংকট, অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা এবং শ্রেণিবদ্ধ সাম্প্রদায়িকতা সবকিছুই তার ছোটগল্পে রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ড. জহীর আলী সিদ্দিকী বলেছেন,

"کرشن چندر نے سماج سے متعلق ہر طبقے سے موضوتات کو چنا ہے۔ خانہ بدوش، مذھبی مقامات، پنڈے، ملا، بنگال کا قحط، مزدور اور کسان۔ بنگال کے قحط کے سلسلے میں ان داتا، کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر کی تاریخ اور وہاں کے منظر کو کرشن چندر نے اپنے افسانوں میں بنیادی جگہ دی ہے۔ کشمیر کی تاریخ سے متعلق جھیل سے پہلے اور جھیل کے بعد، افسانہ لکھا"۔[৪০৯]

কৃষণচন্দ্রের লেখার ধরন ছিল অসাধারণ। এই বৈশিষ্ট্যটি তাকে জনপ্রিয় করে তুলেছে এবং তার ছোটগল্পগুলো জনপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রগতিশীল কথাসাহিত্যিক কৃষণচন্দ্র অগ্রগতিমূলক চিন্তা-ভাবনা তার ছোটগল্পগুলোতে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ ইজাজ হোসেন বলেছেন,

"کرشن چندر حقیقت پسند اور زبردست حقیقت پسند ہیں۔ اگر تنگ وتاریک گلیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ تیرہ وتار مناظر سے نکال کر روشنی اور کشادہ سڑکوں کی بھی سیر کرا دیتے ہیں، ایک یہ پڑھنے والے کی صلاحیت پر ہے کہ وہ نبض شناسی سے کام لے کر مصنف کی حقیقی ہمدردی کا اندازہ کرلے"۔[৪১০]

কৃষণচন্দ্র ছোটগল্প জগতের যাদুকর। যিনি উর্দু গদ্য সাহিত্যের দিগন্তে অর্ধশতাব্দী ধরে একটি ঝলমলে তারার মতো জ্বলজ্বল করে আছেন। কৃষণচন্দ্র ছোটগল্পের সাহিত্যে এক নামকরা ছোটগল্পকার।

রাজেন্দ্রে সিং বেদিঃ উর্দু গদ্য সাহিত্যে কিংবদন্তি ছোটগল্পকার হলেন রাজেন্দ্র সিং বেদি। তিনি তার সামাজিক জীবন থেকে কথাসাহিত্য রচনার জন্য তার উপাদান পেয়েছেন এবং সততা ও আন্ত রিকতার সাথে সামাজিক চিত্র উপস্থাপন করেন। তিনি তার চারপাশের পরিবেশ থেকে আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ঘটনাগুলো তার সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। নিষ্ঠুরতা, নৈতিক মূল্যবোধ লঙ্ঘন, অসততা এবং লালসা, বিনয়ী ও দরিদ্রের সরল জীবন, বহু ঘরোয়া সমস্যা, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও শর্তসমূহ, যৌনতা ইত্যাদি তার গদ্য সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়।

রাজেন্দ্র সিং বেদির ছোটগল্পের বিষয় সম্বন্ধে আলে আহমেদ সরুর এর উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে কানুল লিখেছেন,

"عام زندگی، عام لوگ، عام رشتے، ان کے افسانوں کا موضوع ہیں مگر ان میں وہ ایسی طاقت اور توانائی، زندگی اور تابندگی، معنویت اور انفرادیت بھر دیتے ہیں کہ ذہن میں روشنی ہو جاتی ہے۔ بیدی نے حقیقت کو بے نقاب دیکھنے کی کوشش کی ہے اور یہ بات بھی ہے کہ وہ حقیقت کو بیان کرتے وقت سماجی ذمہ داری کو یکسر فراموش نہیں کرتے"۔[৪১১]

রাজেন্দ্র সিং বেদির অনেকগুলো বিখ্যাত ছোটগল্পের মধ্যে لاجونتی "লাজুনতি" উল্লেখযোগ্য একটি ছোটগল্প। এই ছোটগল্পটি "اپنے دکھ مجھے دے دو" (আপনে দুখ মুঝে দে দো) সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ছোটগল্পে বেদির শৈল্পিক গুণাবলীর বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত হয়েছে। এটি মানুষের জীবনের অনেকগুলো দিক এবং এর ফলে প্রাপ্ত সামাজিক পরিস্থিতি এই ছোটগল্পে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

এটি একটি ট্র্যাজেডিতে আটকে থাকা একজন অপহৃত নারীর গল্প, যেখানে বেদি একটি নারীর মানসিকতা, আবেগ এবং আবেগের পাশাপাশি ধর্মীয় বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা এবং ভাব প্রকাশের চিত্র তুলে ধরেছেন। লাজুনতি গল্পের নায়ক হলো সুন্দর লাল এবং নায়িকা হলো লাজু। দেশ বিভাগের সময় যেসব নারী অপহৃত হয়েছিল তার মধ্যে ছিল লাজু। সুন্দর লাল বাবু লাজুকে মানসিক অত্যাচার করেছিল এবং লাজুর আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সে তাকে ভোগ করেছিল। এক সময়ের পর সুন্দর লাল বাবু লাজুর কথা স্মরণ করে এবং সে ভাবতো যে, লাজু যদি একবার তার সাথে দেখা করতো তবে সে তাকে অন্তরে স্থান দিতো। এরপর সে বিভিন্ন অপহরণকারী কাফেলায় যেতো এবং লাজুকে খুঁজতো। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে একদিন লাজুকে পেয়ে গেলো; কিন্তু লাজু সুন্দর লালকে দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকে। লাজু কাঁপছিল কারণ ইতিমধ্যে সুন্দর লাল তার সাথে আপত্তিকর আচরণ করেছে। লাজুর সাথে সুন্দর লালের দেখার পর লেখক তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

"اور لاجو ایک پتلی شہتوت کی ڈالی کی طرح نازک سی دیہاتی لڑکی تھی۔ زیادہ دھوپ دیکھنے کی وجہ سے اس کا رنگ سونلا ہو چکا تھا۔ طبعیت میں ایک عجیب طرح کی بے قراری تھی"۔[৪১২]

সুন্দর লালকে হতবাক দেখাচ্ছিল, কারণ লাজু সম্বন্ধে যেরকম ভেবেছিল তা সবই ভুল ছিল। লাজুর রং চলে গেল, সে কিছুটা ঠিক দেখাচ্ছে। অনেক প্রশ্ন সুন্দর লালকে বিচলিত করছে। তবুও সে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত পুরুষ প্রমাণ দেওয়ার জন্য লাজুকে তার বাড়ি নিয়ে এসেছে, সুন্দরলাল তার অতীতের ভুলের জন্য অনুশোচনা করেছে এবং এখন সে লাজুকে দেবী মনে করে। এটি একই লজ্জা যা সুন্দরলালের অত্যাচারের শিকার হয়েছিল এবং সুন্দরলাল তাকে দেবীর মর্যাদা দেয়। এই ছোটগল্পে চরিত্রগুলোকে বেদী সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। লাজু ও সুন্দরলালের মতো চরিত্রগুলো সারা

বিশ্বের অন্তর্ভুক্তি নয়, তবে এমন ছোটখাটো ভূমিকা রয়েছে, যার মনস্তাত্ত্বিক ও আধাত্মিক সম্পর্কটি পাঠকের সামনে সাফল্যের সাথে স্থান করে নিয়েছে। ডাঃ বুর্গ লেমি সঠিকভাবে লিখেছেন,

"بیدی کے یہاں کردار نگاری کا فن سلجھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لئے اکثر اوقات وہ پلاٹ کی سکیم پر زور نہیں دیتے۔ ان کا سارا زور کردار کو ابھارنے پر صرف ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے واقعات کو جوڑتے ہیں اور ان سے تاثر کی وحدت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وحدت کا کلی تاثر کردار کی بھرپور تصویر کی شکل میں سامنے آجاتا ہے۔ اور کہانی ختم ہونے کے بعد صرف کردار کا گہرا تاثر قاری کے ذہن پر بیٹھ جاتا ہے"۔[৪১৩]

এই ছোটগল্পের সংলাপগুলো বেদি খুব সংবেদনশীলতার সাথে প্রতিফলিত করেছেন, যা একটি সফল ছোটগল্পের উদাহরণ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। পুরো গল্পটি পড়ে, পাঠক সুন্দরলাল ও লাজুনতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে। গল্পকার মানবতার মনোবিজ্ঞান বোঝে এবং এটি কেবল স্বামী ও স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতিচ্ছবি নয়, এটি সামাজিক মূল্যবোধে পরিপূর্ণ একটি কাহিনি, যা দেশের রক্তাক্ত ট্র্যাজেডিকে চিত্রিত করে। এই ছোটগল্পে লেখক শিক্ষা দিতে চেয়েছেন যে, অপহৃত ব্যক্তিকে ঘৃণা নয়, তাদের কোন দোষ নেই। যে অপহরণ করে সে সম্পূর্ণভাবে দোষী। তাই তিনি এই ছোটগল্পে অপহৃত নারীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং নৃশংসতার ঘৃণা করেছেন।

রাজেন্দ্র সিং বেদির আর এক কিংবদন্তি ছোটগল্প "اپنے دکھ مجھے دے دو" (আপনে দুখ মুঝে দে দো) এই ছোটগল্পে নায়ক মদন ও নায়িকা ইন্দো। এখানে মদন শিক্ষিত, মদ্যপায়ী, লাজুক এবং নায়িকা অশিক্ষিত, সরল ও লজ্জাবতী। এই গল্পটি একটি স্বামী ও স্ত্রীর গল্প। মদন ও ইন্দোর বিয়ের রাতে মদন খুব ভয়ে ভয়ে ইন্দোরের দিকে তাকায়, ইন্দো সেই রাতে একটি কথা বলে যে, "আমাকে তোমার দুঃখ দিয়ে দাও" কিন্তু মদন নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ছিল। সে ইন্দোর ঘোমটা টানতে ভয় পাচ্ছিল। বাইরে তার ভাবি, বোনেরা জানালার পাশে ছিল তারা ফিসফিস করছিল। মদনের পরিবারে বাবা রামুনাথ, ভাবি চাকলি, বোন দিলারী ও ভাই ছিল। তাদেরকে নিয়ে ইন্দোর পুরো এক সংসার। বাবু রামুনাথ পুত্রবধুকে খুব ভালোবাসত। বাবু রামনাথের চাকরি সূত্রে তার বাচ্চাদের রেখে দূরে যেতে হয়। তিনি সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়েন। কারণ তার স্ত্রী অনেক আগে মারা গিয়েছে। তার নিঃসঙ্গতা দূর করার জন্য তিনি বাড়িতে চিঠি পাঠিয়ে বাচ্চা ও পুত্রবধুকে কাছে ডেকে নিলেন। অপরদিকে মদনও একা হয়ে গেল। কয়েক দিন কাটার পর মদন ইন্দোকে ছাড়া আর থাকতে না পেরে একটি সংবাদ দিল যে, সে দোকান থেকে রুটি খেতে খেতে তার কোষ্ঠকাঠিন্য বা কিডনীর সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সংবাদ শুনে ইন্দো ও বাচ্চারা আবার বাসায় ফিরে আসল। ফিরে এলে মদন ইন্দোর উপর খুব রেগে যায়। তার সাথে দুই দিন কথা বলে না। তারপর ইন্দো কোনভাবে

তাকে মানিয়ে নেয়। মদন ইন্দোকে বলে তুমি আমাকে ভালোবাস না শুধু শ্বশুরকে ভালোবাস। এতে ইন্দো রাগন্বিত হয়ে বলে তুমি নোংরা এবং তোমার ব্যবসাও নোংরা। এভাবে থাকতে থাকতে ইন্দোর একটি পুত্রসন্তান ভুমিষ্ট হয়। এদিকে রামবাবু একা না থাকতে পেরে চাকরি ছেড়ে চলে আসেন। তাকে দেখে মনে হয় তিনি অনেক বুড়ো ও অসুস্থ হয়ে গেছেন। বাড়িতে এসে নাতিকে দেখে খুব খুশি হন। তারপর কয়েকদিন পরে মদনের বাবা মারা যান। মদন তখন বড় ছেলের দায়িত্ব পালন করে। এক সময় তার ব্যবসা চলে যায়। এতে তারা আর্থিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। এর মধ্যে ইন্দোর একটি মেয়ে হয়েছে। একদিন মদন ইন্দোর কাছে এসে বলে টাকা পয়সা কিছুই নেই, তখন ইন্দো তাকে কিছু টাকা দেয় এতে মদনের ইন্দোর উপর সন্দেহ লাগে। কিন্তু ইন্দো ছিল পবিত্র নারী। তার মনে কোন পাপ ছিল না। স্বামীর কষ্ট দেখে তার খুব কষ্ট হতো। তাই এক সময় দুইজন কথোপকথন এর সময় ইন্দো বলল:

"یاد ہے شادی والی رات میں نے تم سے کچھ منگا تھا؟" "ہاں" مدن بولا "اپنے دکھ مجھے دے دو"۔[৪১৪]

ইন্দো আবার বলল: তুমি কিছু চাইলে না? মদন বলল: আমি কি চাইব? আমি যা চাইতে পারি তাই তুমি আমাকে দিয়েছ। আমার প্রিয়জনদেরকে ভালোবাসা, তাদের পড়াশুনা, বিবাহ, এই সুন্দর শিশু, তুমি সবই দিয়েছ। কিছুক্ষণ পর মদনের হুশ এলো তখন মদন আর ইন্দো কাঁদতে কাঁদতে একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। ইন্দো মদনের হাত ধরে এমন একটি বিশ্বে নিয়ে গেল যেখানে মানুষ কেবল মরতে পারে। বেদির কথাসাহিত্যটি 'আপনে দুখ মুঝে দে দো' যা এখনও সাহিত্য জগতে একই রকম স্বাদ নিয়ে পড়া হয়। এর প্রধান চরিত্র ইন্দো হলেন একজন শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান নারী, যার নৈতিকতার প্রতি মনোভাব বিরল। তিনি পুরো পবিারেরর যত্ন নেন। বাচ্চাদের সাথে ভাল আচরণ করেন। বড় শ্বশুরের সেবা করেন। বিশ্বের সমস্ত নারীরা যদি ইন্দোর মতো নৈতিক হয়ে উঠেন, তবে এই পৃথিবী স্বর্গের সুখে পরিণত হবে। ইন্দোর মুখ থেকে বেদি এমন একটি কথা বলেছেন যা মদনের মতো লক্ষ লক্ষ পুরুষ বুঝতে পারে না।

রাজেন্দ্র সিং বেদির 'আপনে দুখ মুঝে দে দো' ছোটগল্পের 'ইন্দোর' মতো হোলি, گرہن (গ্রহণ) ছোটগল্পের ভূমিকা, পশ্চাৎ পদ সমাজের এমন নারীকে প্রতিনিধিত্ব করে যারা শ্বশুর বাড়িতে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়। এমনকি এ জাতীয় নারীদের ভাগ্য বদলায় না, তবে এ জাতীয় নারীরা পুরুষদের ছদ্মবেশে লুকিয়ে থাকা নেকড়ে বাঘের শিকার হন। কিংবদন্তির উক্তি:

"رسیلے نے ایک پر ہوس نگاہ سے ہولی کی طرف دیکھا اس وقت ہولی اکیلی تھی رسیلے نے آہستہ سے انچل کو چھوا۔ ہولی نے ڈرتے ڈرتے دامن جھٹک دیا اور اپنے دیور کو آوازیں دینے لگی۔ گویا دوسرے آدمی کی موجودگی چاہتی ہے"۔[৪১৫]

রাসেল হোলির দিকে লোভনীয় দৃষ্টিতে তাকাল । হোলি তখন একা ছিল । রাসেল আলতো করে ছোঁয়া লাগায় । হোলি ভয়ে তার পা কাঁপায় এবং আওয়াজ দিতে থাকে, যেন সে অন্য একজনের উপস্থিতি চায় । হোলি অজান্তেই রাসেলকে বলল, আপনি নির্মম, আপত্তিকর, লোভনীয় । আঘাতটি সোজা রাসেলের দিকে লাগল । রাসেলের কোন উত্তর নেই । বিস্ময়কর মানুষের প্রতিক্রিয়া নীরব এবং অন্য মুহূর্তে হোলীর শরীরে রাসেলের আঙ্গুলের ছাপগুলো উপস্থিত হয় ।

এই ছোটগল্পে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে, মেয়েদের স্বাধীনতা নেই । আজকের যুগেও ছেলেরা যেমন অবাধে এ দিক ওদিক ঘোরাফেরা করতে পারে, তেমনিভাবে মেয়েরা পারে না । তাদের একটি গোন্ডীর মধ্যে জীবনযাপন করতে হয় ।

থিম এবং বিষয়বস্তু উভয়ই বেদি সৃষ্টিতে অনন্য ভূমিকা পালন করেন । রাজেন্দ্র সিং বেদি নিজেই তার কিংবদন্তি সংগ্রহ গ্রহণ-এর ভূমিকাতে এটি স্বীকার করেছেন ।”

"مجھے تخیل فن پر یقین ہے۔ جب کوئی واقع مشاہدے میں آتا ہے۔ تو میں اسے من و عن بیان کر دینے کی کوشش نہیں کرتا۔ بلکہ حقیقت اور تخیل کے امتزاج سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسے احاطہ تحریر میں لانے کی سعی کرتا ہوں"۔[৪১৬]

রাজেন্দ্র সিং বেদির আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হলো "دس مینٹ بارش میں" (দশ মিনিট বারিশ মে) । এই গল্পের প্রধান চরিত্র হলো রিতা । আবু বকর রোড, সিরিয়ার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে । মনে হচ্ছে একটি পরিস্কার পথ কোনও কয়লার খনিতে চলে যাচ্ছে । প্রচন্ড বৃষ্টিতে কতুব সৈয়দ হুসেন মক্কীর সমাধির ধ্বংসাবশেষ, ভেরোনার ভেড়া, যাত্রীর গোলাপ এক প্রস্ফুটিত ঝাঁঝালো ঘোড়া সমস্ত বৃষ্টির পানিতে ভিজছে । রিতাও ভিজছে । রিতা হচ্ছে লালের স্ত্রী । দশ বছরের এক অলস, অজ্ঞ, অযোগ্য সন্তানের জননী । লাল যেখানে কাজ করতো সেখান থেকে তাকে বিতাড়িত করে । সেই থেকে রিতা তার জীবনকে একাই অতিবাহিত করে । সে একবার লালকে নিজের সম্প্রদায়ের একজন নারীর সাথে দেখতে পেয়েছিল । অর্থাৎ রিতা তার ছেলে নিয়ে একাই এক কুঠিরে থাকতো । বৃষ্টি এলে তার কুঠির সম্পূর্ণ ভিজে যেতো এবং সে নিজেও ভিজতো । তার চুলগুলো শরীরের সাথে লেগে যেতো এবং পাতলা শাড়িতে তার দেহ সম্পূর্ণ দেখা যেতো । এই গল্পে দেখানো হয়েছে যে, বড়লোক ও গরিবের পার্থক্য । বৃষ্টি এলে বড় লোকেরা ছাদের ছাউনিতে থাকে এবং মনে করে বৃষ্টি চায়ের বাগানের

জন্য খুব উপকারী। তারা বৃষ্টিকে হীরার সাথে তুলনা করতো। অপরদিকে গরিবের বৃষ্টির মধ্যে কষ্টের সীমা থাকে না। তাদের ঘরবাড়ি ডুবে যায় এবং তাদেরকে সেই বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করতে হয়।

রাজেন্দ্র সিং বেদির আরো একটি মাস্টারপিস ছোটগল্প "گھر میں بازار میں" (ঘর মে বাজার মে)। এই ছোটগল্পটি 'গ্রহণ' সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ছোটগল্পটি হলো একটি বাড়ির গল্প, যেখানে একটি নববধু বর বা স্বামীর কাছ থেকে অর্থ ব্যয় করার জন্য, তার হাত খরচ করার জন্য ভিক্ষা করে। এই ছোটগল্পটিতে লেখক নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার বিষয়টি অত্যন্ত সমালোচিত ও হাস্যকর উপায়ে উপস্থাপন করেছেন। এই ছোটগল্পের কিছু উদ্বৃতাংশ তুলে ধরা হলো,

"وہ بے غیرت بھرے بازار میں کہہ رہی تھی کہ وہ توسب حسن کی نیاز ہے۔اس نے اپنے لئے مجھے وہ ساڑی پہنوائی تھی اپنے لئے گرگابی جسے پہنکر میں اس کے ساتھ لارنس باغ کی سیر کو گئی۔ لیکن مجھے پیسے چاہئیں۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے اپنے بچے کے لئے کپڑے چاہئیں، میں نے کرایہ دینا ہے، مجھے پوڈر کی ضرورت ہے...."۔[৪১৭]

উপরের আলোচিত ছোটগল্প ছাড়াও রাজেন্দ্র সিং বেদির আরো অসংখ্য ছোটগল্প আছে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো হলো-

دانہ و دام (১৯৪০ খ্রি.) (দানা ও দাম), گرہن (১৯৪২ খ্রি.) (গ্রহণ), کوکھ جلی (১৯৪৯ খ্রি.) (কোখ জলী), ہاتھ ہمارے قلم ہوئے (১৯৭৪ খ্রি.) (হাত হামারে কলম হোয়ে), مکتی بودھ(১৯৮২ খ্রি.) (মকতী বুধ), لمبی لڑکی (লম্বী লাড়কি)[৪১৮]।

রাজেন্দ্র সিং বেদি তার ছোটগল্পে চরিত্রগুলোকে খুব আবেগের সাথে উপস্থাপন করেন। তার ছোটগল্পে নারী চরিত্রগুলো- যেমনঃ ইন্দো, হোলি,রিতা ইত্যাদি দেখা যায়। তেমনিভাবে পুরুষ চরিত্রগুলো- যেমনঃ মদন, রাসেল ও থারো ইত্যাদিও দেখা যায়। বেদির ছোটগল্পের চরিত্র সম্বন্ধে ওকার আজীম লিখেছেন,

"بیدی کی کردار نگاری کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔ وسیع اور عمیق مشاہدہ، مطالعہ کا پیدا کیا ہوا۔ انفسیانی نقطہ، نظر اور گہری جذباتیت سے متاثر فکر و تخیل کا اندازہ"۔[৪১৯]

রাজেন্দ্র সিং বেদির শিল্পের প্রধান উপাদান হচ্ছে ভাষা। যে কথা সহজ ও সরল ভাষায় বলা যায় বেদি সে কথাগুলোকে কঠিন ভাষায় বলে থাকেন। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক ওকার আজীম লিখেছেন,

"بیدی کے فن کا ایک اور پہلوان کی زبان ہے۔ عام طور پر ان کی زبان کے اس حصہ پر اعتراض کیا جاتا ہے جس پر مقامی اثرات غالب ہیں۔ اور ان میں سے بعض سے ان کی طرز کی شگفتہ سنجیدگی کی روانی میں فرق بھی پڑتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں اس سے بھی زیادہ اہم ایک بات اور ہے ہر پڑھنے والا ان کے افسانوں میں محسوس کرے گا۔ جن باتوں کو آسان اور سیدھی سادی باتوں میں کہہ کر زیادہ مؤثر بنایا جاسکتا ہے انھیں بیدی نے دقیق اور مشکل زبان میں کہا ہے"۔[৪২০]

রাজেন্দ্র সিং বেদির ছোটগল্পের ভাষা ক্রিশনচন্দ্রের ছোটগল্পের রোমান্টিক ভাষা না হলেও তার ছোটগল্পে পাঞ্জাবের রং প্রস্ফুটিত হয়। পাঞ্জাবি উচ্চারণ এবং স্থানীয় উপভাষাও বেদির ভাষায় গভীর প্রভাব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আকবর উদ্দিন সিদ্দিকী লিখেছেন,

"ان کے افسانے پنجاب کی زندگی کا عکس ہیں اس لئے وہ محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ زبان اتنی رواں، سلیس اور اچھی لکھتے ہیں کہ ان میں تصنع اور آورد کا دخل نظر نہیں آتا"۔[৪২১]

উপেন্দ্র নাথ অশোকঃ উপেন্দ্র নাথ অশোক উর্দু গদ্য সাহিত্যে একজন নন্দিত ছোটগল্পকার। তার ছোটগল্পগুলোতে তিনি নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং যৌন বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তার ছোটগল্পের বিষয় হলো সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে মানুষের জীবনধারা। উপেন্দ্র নাথ অশোক তার লেখনীতে পাঞ্জাবের দৈনন্দিন গ্রামীণ জীবনকে সুন্দর উপায়ে চিত্রায়িত করেছেন। তার সাহিত্য জীবন ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেছিলেন। অসুস্থ হওয়ার পর তিনি এলাহাবাদে চলে আসেন। কিন্তু ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণরূপে উর্দুতে লিখা শুরু করেন। তিনি এলাহাবাদে তার উর্দু ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। একের পর এক বই উর্দুতে প্রকাশ করেন এবং উর্দু সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। তার কয়েকটি পৌরাণিক কাহিনিতে বাস্তবের পাশাপাশি পরিমার্জিত বর্ণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে এবং কিছু কল্পকাহিনিতে রোমান্টিকতাবাদের প্রভাব রয়েছে এবং কিছু কথাসাহিত্যে রাজনৈতিক জীবনকেও প্রতিফলিত করে। তিনি ভারতীয় রাষ্ট্রদ্রোহের এই শ্রেণির বিভিন্ন দিক তার ছোটগল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তার প্রথম ছোটগল্প پھول کا انجام (ফুল কা আঞ্জাম), দ্বিতীয় ছোটগল্প سردار (১৯৩১) (সরদার) । এছাড়াও তিনি আরো অনেক ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- نورتن (১৯৩০) (নোও রতন), جدائی کی شام کے گیت (১৯৪০) (জুদায়ী কি শাম কে গীত), عورت کی فطرت (১৯৩৩) (আওরাত কি ফিতরত), ڈاچی (১৯৪০) (ডাচি), کونپل (কোনপাল) (১৯৪১), چٹان (চটান) (১৯৪৩), ناسور (নাসুর)।[৪২২]

পণ্ডিত বদরীনাথ সুদর্শনঃ প্রেমচাঁদের প্রায় আট থেকে দশ বছর পরে কিংবদন্তি পন্ডিত বদরী নাথ সুদর্শন তার সাহিত্য জীবন উর্দু দিয়ে শুরু করেছিলেন এবং পরে হিন্দি ভাষার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। যদিও সুদর্শন প্রেমচাঁদের অনুসারী ছিলেন, তবুও তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। তিনি শহরের মধ্যবিত্তদের নিয়ে লেখা শুরু করেছিলেন। তার গল্পগুলোর উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও জাতিকে সঠিক পথে নিয়ে আসা। তার গল্পের ভাষা ছিল মসৃণ, কার্যকর এবং মূর্তিমান। তিনি প্রায় ১৫০টি ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো হলোঃ

سولہ سنگار (সোলা সনগার) (১৫টি ছোটগল্প), صبح وطن (সুবহে ওয়াতন) (১৫টি ছোটগল্প), چندن (চন্দন) (১৫টি ছোটগল্প) بہارستان (বাহারিস্তান) (১৫টি জাতিগত ছোটগল্প), قوس قزح (কোস কিজাহ) (৭টি ছোটগল্প), چشم وچراغ (চশম ও চেরাগ) (১৫টি ছোটগল্প), سدابہار پھول (সাদা বাহার ফুল) (১৮টি ছোটগল্প), طائر خیال (তায়েরে খেয়াল) (১৫টি ছোটগল্প), آزمائش (আজমায়িস) (১৫টি ছোটগল্প)।[৪২৩]

গোপাল মিত্তলঃ গোপাল মিত্তল লুধিয়ানা থেকে সাংবাদিক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন মাসিক পত্রিকা "সুবহে উমিদ" প্রকাশের মাধ্যমে, তবে একক ইস্যুর কারণে মাসিক পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপরে তিনি লাহোরে চলে যান। যেখানে তিনি 'ভারত মাতার' সহকারি সম্পাদক হন। তিনি তার চিন্তাভাবনা প্রশান্ত করার জন্য অনেক পশ্চিমা বই এবং অনেক ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে پھول اور کانٹے (ফুল অওর কাঁটে) যা ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪২৪]

দেবীন্দর সত্যরথীঃ দেবীন্দর সত্যরথী ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ২৮ মে পাঞ্জাবের শিগরোয়ার জেলায় ইহলোকে আসেন এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ ফেব্রুয়ারি পরলোকগমন করেন। তিনি উচ্চ বিদ্যালয় শেষ করে ডি, আই, ডি কলেজে ভর্তি হন; কিন্তু পড়াশুনায় বেশি দূর এগুতে পারেননি। তিনি উর্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবি এবং ইংরেজি ভাষায় সাবলীল ছিলেন। তার সাহিত্য জীবন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল। তার প্রথম গল্প "بانسری بجتی رہی" (বাঁশোরী বাঁজতি রাহি) যা ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে "আদব লতিফ" পত্রিকায় লাহোরে প্রকাশিত হয়েছিল। উর্দুতে তার বিশেষ স্থান রয়েছে। কলেজে থাকা অবস্থায় তিনি মানসিক ব্যাধিতে ভুগছিলেন। তবে ভাগ্যক্রমে আল্লামা ইকবাল তার যত্ন নেন। পরবর্তীকালে দেশ ভাগের কারণে তাকে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হন এবং করাচিতে ফিরে এসে সেখানে কাজ চালিয়ে যান। রবীন্দ্রানাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলী'তে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াতেন এবং লোক সংগীত সংগ্রহ করেছিলেন। সে কারণে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার ছোটগল্পের কাহিনি সেই

সময়ের সমস্যাগুলো যেমন পশ্চাৎপদ শ্রেণির দাঙ্গা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের বিষয় আলোচনা করে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো হলো: بانسری بجتی رہی (বাঁশোরী বাঁজতী রাহি) نئے دیوتا (নয়ে দেবতা) میں ہوں خانہ بدوش (মে হুঁ খানা বদোশ), گائے جا ہندوستان (গায়ে জা হিন্দুস্তান)।[৪২৫]

দেবীন্দর সত্যরথীর ছোটগল্পের বিষয় সম্বন্ধে মীর্জা হামিদ বেগ বলেছেন-

"دیویندر ستیار تھی کی نمایاں پہچان ترقی پسندی اور وطن پرستی ہے۔ان کے افسانوں میں وہی فضا کو گرفت میں لینے کے ضمن میں رنگوں اور گیتوں کی خاص اہمیت ہے۔ابتدا میں ستیار تھی نے من کی لہر پر لکھا اور تکنیکی لوازمات کا اتنا خیال نہیں رکھا جس قدر کہ لینڈ اسکیپ اور لوگ گیتوں کے حوالے سے کردار سازی پر توجہ صرف کی۔ لیکن رفتہ رفتہ ان کے ہاں تکنیکی تنوع اہمیت حاصل کرتا گیا اور یوں ان کے کامیاب افسانوں میں تکنیکی مہارت، دھرتی کی بو باس کا انوکھا تال میل اور رابندر ناتھ ٹیگور کی طرز کی کردار نگاری، ایک انوکھے تجربے میں ڈھل گئی۔"[৪২৬]

প্রেমনাথ পরদেশীঃ প্রেমনাথ পরদেশীর আসল নাম মধুসুদন সাধু। উপাধি রওনক এবং কলমি নাম প্রেমনাথ সাধু/প্রেমনাথ পরদেশী। তিনি বাগ দেলোয়ার খান বিদ্যালয় থেকে মেট্রিক পাস করেন। তার একজন মামা ছিলেন যিনি উকিল পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। সেখানে তিনি তার মামার সহকারি হিসেবে কাজ করেন। তারপর রেলওয়েতে চাকরি করেন, সর্বোপরি তিনি রেডিওতে চাকরি পান। সেই সুবাদে তিনি ছোটগল্প লিখতে শুরু করেন। তার প্রথম ছোটগল্প سچی پرارتھنا (সাচ্চি প্রার্থনা) শিরোনামে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি প্রেমচাঁদের ছোটগল্প ও কিংবদন্তির প্রতি অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। তার ছোটগল্প লাহোরের 'আদাব লতিফ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। পরদেশীর এক গল্প "ٹیکہ بٹنی" (টিকা বাটনী) লাহোরে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়েছিল যা সেরা গল্প হিসেবে ঘোষিত হয়েছিল। তার দ্বিতীয় ছোটগল্পের সংগ্রহের ভূমিকাতে রাজেন্দ্র সিং বেদী বলেছেন তিনি প্রাথমিক রোম্যান্স এবং সংবেদনশীলতা ত্যাগ করে বাস্তববাদে পরিণত হয়েছেন। তার ছোটগল্পে কাশ্মিরী মানুষের জীবনযাত্রা ফুটে উঠে। পরদেশী তার ছোটগল্পে কাশ্মিরী মানুষের জীবনযাত্রা শুধু দেখাননি তিনি সেখানকার সমাজের বিপ্লব এবং রাজনীতি, সংস্কৃতি সবকিছুই তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে নুরশাহ বলেছেন-

پردیسی نے اپنے افسانوں میں کشمیر کی عکاسی صحیح معنوں میں کی ہے اور کشمیر کی زندگی، تہذیب و تمدن اور معاشرے کو اصلی رنگ و روپ میں پیش کیا ہے۔انھوں نے اپنی کہانیوں میں مختلف موضوعات کا احاطہ کیا ہے۔ان کے اکثر موضوعات کشمیر اور کشمیریوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے افسانوں کی زبان سادہ اور عام فہم ہے۔وہ زندگی کا مشاہدہ ایک انسان کی طرح کرتے ہیں۔[৪২৭]

তার ছোটগল্পের সংকলনগুলো হলো-

دنیا ہماری (দুনিয়া হামারি) (১৯৪০), شام و سحر (শাম ও সেহের) (১৯৪১), بجھتے چراغ (বেহতে চেরাগ) (১৯৫৫)।[৪২৮]

হানস রাজ রাহবারঃ হানস রাজ রাহবার অল্প বয়সেই রাজনীতির সাথে যুক্ত হন এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। সে কারণে তিনি লাহোর ছেড়ে দিল্লীতে আসেন এবং সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির এম. এল হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও নির্ভীক। তিনি অনেকগুলো ছোটগল্প লিখেছেন। তার প্রথম ছোটগল্প "خواب کی تعبیر" (খোয়াব কি তা'বীর) যা ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে "পুরীয়াত লরী" নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- نیا افق (নয়া উফক), যা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, اب اور تب (আব অওর তব) (১৯৫৭) এবং ہم لوگ (১৯৫৫) (হাম লোগ)।[৪২৯]

ধরম বীরঃ ধরম বীর ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ২৩ সেপ্টেম্বর জাহলুমে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৯ সেপ্টেম্বর ফরিদাবাদে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি স্থানীয় একটি বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্জন করেন। কর্মসংস্থানের জন্য তিনি লাহোরে চলে আসেন এবং সেখানে 'বন্দে মাতরম' এবং 'দেব ভারত' পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন। তারপর তিনি সাহিত্যের সাথে জড়িয়ে পড়েন। তিনি তার জীবনে অনেকগুলো ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে, نیم کے افسانے (নিম কে আফসানে) (১৯৪০)।[৪৩০]

ভারত চাঁদ খান্নাঃ ভারত চাঁদ খান্না ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ২২ জুন পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। দেশ বিভাগের কারণে তিনি পাঞ্জাব ছেড়ে অন্ধ্রপ্রদেশে চলে যান এবং আজীবন কঠোর পরিশ্রমের পরে সেকান্দ্রাবাদে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।[৪৩১] তিনি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ১৩ এপ্রিল পাঞ্জাবের পাটিয়ালায় মারা যান। তিনি পাঞ্জাব সরকারি কলেজ লাহোর থেকে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং জামিয়া আশমানিয়া হায়দ্রাবাদ থেকে এম. এ করেন। তিনি পাঞ্জাবি, উর্দু এবং ইংরেজিতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রশাসনিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভারত সরকারের অধীনে অফিসার হন। তিনি অন্ধ্রপ্রদেশে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এতকিছু সত্ত্বেও তার সাহিত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। তার আগ্রহের কারণে তিনি অনেকগুলো ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পগুলো বিভিন্ন

পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ مسکراتے آنسو (মুসকারাতে আঁসু) এবং مصیبتیں (মুসীবতী)।[৪৩২]

প্রেমনাথ দরঃ প্রেমনাথ দর ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ২৫ শে জুলাই কাশ্মিরের শ্রীনগরে জন্ম নেন। তিনি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ৪ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লীতে মারা যান। তিনি ছিলেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। তার বাবা পন্ডিত রামচন্দ্র সেই সময়ের ফারসি কবি ছিলেন। প্রেমনাথের ছোট বেলাতেই তার বাবা পরলোক গমন করেন এজন্য তিনি তার চাচার কাছে লালিত পালিত হয়েছিলেন। তার প্রাথমিক শিক্ষা শ্রীনগরের একটি মিডল স্কুলে হয়েছিল এবং শ্রী প্রতাপ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পড়াশুনা করেন। তারপরে তিনি শ্রী প্রতাপ কলেজ থেকে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন।[৪৩৩] তিনি ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে জীবিকার সন্ধানে লাহোরে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি কেবল একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি হিসাবেই নয়, একজন রাজনীতিবিদ হিসাবেও পরিচিতি পেয়েছিলেন। তিনি ইংরেজি সংবাদ পত্র হিন্দুস্তান মুনস্টার এবং স্টেটসম্যান-এ কাজ করেছিলেন। এরপরে, তিনি সাপ্তাহিক ভিত্তিতে অল ইন্ডিয়া রেডিওর আন্ত:ভারতীয় শ্রোতা এবং ভয়েস সম্পাদক ছিলেন। অল ইন্ডিয়া রেডিওর ব্যস্ততার কারণে জীবনের শেষ সময়টিতে তিনি সৃজনশীল কাজে বেশি সময় দিতে পারেননি। তবুও তিনি ছোটগল্পে যেভাবে অবদান রেখেছেন, তা কম নয়। তার প্রথম ছোটগল্প "غلط فہمی" (গলত ফেহমি) যা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে "আবদী দুনিয়া" পত্রিকা লাহোরে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি কম লিখতেন তবে চিন্তাভাবনা করে লিখতেন। তার বেশির ভাগ ছোটগল্প কাশ্মিরে সম্মিলিত এবং অর্থনৈতিক জীবনকে প্রতিফলিত করে। প্রেমনাথের অধ্যয়ন ব্যাপক এবং পর্যবেক্ষণমূলক। ছোটগল্পের বিষয়গুলো তার জ্ঞানের প্রতিচ্ছবি। তার ছোটগল্প সম্বন্ধে আব্দুল কাদের সরোরী বলেছেন-

"یہی وجہ ہے کہ جب انھوں نے قلم سنبھالا تو ایسے افسانوں کو تخلیق کرنے لگے جن کو پڑھ کر نقادوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک حساس صاحب فکر کی طرح ہزار شیوہ زندگی کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور اسے اپنے شخصی تجربات کے ساتھ پیش بھی کرتے ہیں۔ وہ کم لکھتے ہیں لیکن سوچ سمجھ کر لکھتے ہیں۔"[৪৩৪]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে-کاغذ کا دائسدیو اور دیگر افسانے (কাগজ কা দায়েসদায়ী অওর দেগার আফসানে) (১৯৪৯) এবং نیلی انکھیں (নীলি আঁখে) (১৯৬০) যার মধ্যে ৯টি ছোটগল্প আছে।[৪৩৫]

শামশীর সিং নিরোলাঃ শামশীর সিং নিরোলা ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ১৫ নভেম্বর পাঞ্জাবের আমর তেসরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজি, হিন্দি এবং উর্দুতে দক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে

মেট্রিক পাস করেন এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে খালসা কলেজ আমর তেসরী থেকে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি প্রগতিশীল লেখকদের সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কাজ করেছিলেন। শুরুতে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেছিলেন। তার প্রথম ছোটগল্প 'সাকী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- جالے (জালে) (১৯৪৬)।[৪৩৬] তার ছোটগল্পের ধরন সম্বন্ধে জালে সংগ্রহের ভূমিকাতে রাজেন্দ্র সিং বেদি বলেছেন-

"یہاں شمشیر سنگھ پوری عقل و ہنر کے ساتھ نبّاضی کرتا ہے اور پھر ہمیں جسم کے مردہ ہونے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔اور ہم یقین کرنے لگتے ہیں کہ اس جسم میں روح بھی ہے"[৪৩৭]

জমনা দাস আখতারঃ জমনা দাস আখতার সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেছেন। তবে তার ছোটগল্প বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি পাঞ্জাবের পরিস্থিতি এবং কাশ্মিরে আদিবাসী আগ্রাসনের ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা স্বচক্ষে দেখেছেন এবং সেগুলো তিনি তার ছোটগল্পগুলোতে তুলে ধরেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো হলো-

کانٹے (কাঁটে), پتھر کی مورتی (পাথ্থর কি মূর্তি), قبرستان کی رات (করবস্তান কি রাত), دہلی کی رات (দিল্লী কি রাত), بمبئی کی رات (বোম্বে কি রাত), ابابیل محل (আবাবিল মহল), شیطان (শয়তান)।[৪৩৮]

মহেন্দ্র নাথঃ মহেন্দ্র নাথ কবিতা দিয়ে তার সাহিত্য জীবন শুরু করলেও খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছোটগল্পে তিনি তার যোগ্যতা তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তার প্রথম ছোটগল্প ریاضت (রিয়াদত) 'সাকী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ একজন প্রগতিশীল লেখক। তিনি প্রগতিশীল চিন্তাধারার মাধ্যমে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণির সমস্যাগুলো তার ছোটগল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- چاندی کی تار (চান্দনি কি তার), گالی (গালি), پاکستان سے ہندوستان تک (পাকিস্তান সে হিন্দুস্তান তক), مائی ڈارلنگ (মায়ী ডারলিং), یہاں سے وہاں تک (ইহাঁ সে ওহাঁ তক), نئی بیماری (নয়ী বেমারি), جہاں میں رہتا ہوں (জাহাঁ মে রেহতা হুঁ), برات (বারাত), تنہا تنہا (তানহা তানহা), مٹی کے چراغ (মিট্টি কে চেরাগ)।[৪৩৯]

হিম্মত রায় শর্মাঃ হিম্মত রায় শর্মা ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ২৩ নভেম্বর পাকিস্তানের শিয়ালকোটে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বি. এ সম্পূর্ণ করেছেন; কিন্তু এম. এ সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হন। তিনি তার বড় ভাই

কেদার নাথ শর্মার সাথে চলচ্চিত্রে কাজ করেন। যদিও তিনি কবিতা দিয়ে তার সাহিত্য জীবন শুরু করেন। তবুও তিনি অনেক ছোটগল্প লিখেছেন। তার জনপ্রিয় ছোটগল্প হচ্ছে- شہاب ثاقب (শাহাব শাকিব) (১৯৮০), ہندو مسلمان (হিন্দু মুসলমান) এবং ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে-مسافراور دیگر افسانے (১৯৮১) (মুসাফির অওর দেগার আফসানে), زمین کے پیراور دیگر افسانے (জমিন কে পের অওর দেগার আফসানে)।[৪৪০]

আর্নিস্ট ডি ডীনঃ আর্নিস্ট ডি ডীনের ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম হয়েছে। তার বাবার নাম এইস. এফ. ডীন ছিল যিনি প্রথম দিকে শিক্ষক ছিলেন পরে পাঞ্জাবের কাউন্সিলর হন। তার মায়ের নাম ওয়াজিয়া দতী ডীন। আর্নিস্ট একজন ভালো পরিবারের আলোকিত সন্তান ছিলেন। তিনি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। ছোটবেলা থেকে তার সাহিত্যের ভাব ছিল। তার লেখনীতে গাম্ভীর্য, হাস্যরস, প্রেম, মূল্যবোধ ও শিক্ষনীয় দিক ছিল। তিনি বিখ্যাত বিখ্যাত লেখকের সাহচর্যে এসেছিলেন। যেমন কলেজের সময়কালে তিনি আখতার শেরানীর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছিলেন। তার প্রথম ছোটগল্প پاربتی مسیحی ہوگئی (পার্বতী মাসিহী হোগায়ী)। এছাড়া তিনি আরো অনেক ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো: اصلاحی افسانے (ইসলাহী আফসানে) এতে ২৬টি ছোটগল্প রয়েছে।[৪৪১]

হিরানন্দ সুজঃ হিরানন্দ সুজ ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ১৯ মে পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ৭ জানুয়ারি হরিয়ানা ফরিদাবাদে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি রেলওয়েতে চাকরি পান।[৪৪২] হিরানন্দ প্রকৃত পক্ষে একজন কবি ছিলেন। তারপর তিনি ছোটগল্পের প্রতি আগ্রহী হন। তার একটি ছোটগল্প آرسی سخف (আরসি সাখফ) যা ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, এতে একটি কুরুচিপূর্ণ মেয়ের মানসিক লড়ায়ের চিত্র লেখক অত্যান্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- کاغذی دیوار (১৯৬১) (কাগজ কি দিওয়ার), ساحل (সাহেল), سمندراور سیپ (১৯৮৮) (সামুন্দর অওর সীপ)।[৪৪৩]

প্রকাশ পণ্ডিতঃ প্রকাশ পণ্ডিত ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ২৪ অক্টোবর পাকিস্তানের লয়েলপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর সুরিয়ানগর, গাজীবাদে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৪৪] পেশা হিসেবে সাংবাদিকতাকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি লয়েলপুর থেকে লাহোরে চলে আসেন এবং সেখানে

সাহিত্য সংঘের সাথে যুক্ত ছিলেন। দেশ বিভাগের কারণে তিনি লাহোর ছেড়ে দিল্লীতে এসে বসবাস করেন। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ছোটগল্প দিয়ে তার সাহিত্যজীবন শুরু করেছেন এবং তিনি সাহিত্যের এই শাখাতে দ্রুত অগ্রগতি করেছেন। প্রকাশ সৌন্দর্যের প্রেমিক ছিলেন এবং মানব মনোবিজ্ঞানের উপর প্রচুর অধ্যয়ন করতেন। তার নান্দনিক বোধ পরিপক্ক। তিনি সর্বদা প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন যার কারণে তার গল্পগুলো সামাজিক চেতনা এবং শ্রেণি সংগ্রামকে প্রতিফলিত করে। এ প্রসঙ্গে ড. কমর রইস এর উদ্ধৃতি দিয়ে দিপক বাদকি বলেছেন-

"پرکاش پنڈت کی کہانیوں میں سماجی اونچ نیچ اور ان سے پیدا ہونے والے درد وکرب کا عرفان جھلکتا ہے۔ وہ اپنے کرداروں کا مطالعہ دقت نظر سے کرتے ہیں۔"[৪৪৫]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে- میراث (মীরাছ), کھڑکی (খিড় কি)।

বিজয় সুমন সুসানঃ বিজয় সুমন সুসান একজন সাংবাদিক ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবি ও উর্দু ভাষায় লিখতেন। তার লিখার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহের কারণে তিনি ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- "چھالے" (ছালে) যা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৪৬]

বিলরাজ বার্মাঃ বিলরাজ বার্মা তার সাহিত্যিক নাম এবং তার আসল নাম বিলরাজ লাল বার্মা। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ১০ জানুয়ারি পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এম.এ. ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি একজন 'তানাজুর' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।[৪৪৭] বিলরাজ প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি উর্দু ছোটগল্পে একটি নতুন মাত্রা এনে দিয়েছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ آگ راکھ اور کندن (আগ রাখ অওর কন্দন), الیوژن (আলী বঝন)।

সোমনাথ যাতশীঃ শৈশবকাল থেকেই সোমনাথ যাতশী কথা সাহিত্যে আগ্রহী ছিলেন এবং তার প্রাথমিক ছোটগল্পগুলো নিয়মিতভাবে শিশুদের ম্যাগাজিন "রতন" জম্মু থেকে প্রকাশিত হতো। তার প্রথম ছোটগল্প شاردا (শারদা) ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ৭ আগস্ট শ্রীনগরে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ছোটগল্পের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত করেছিলেন, যার মধ্যে ৯টি ছোটগল্প ছিল। সেগুলো হলো-

دکھتی رگ(দুখতী রগ), دوراہے پر (দুরাহে পর), بہاؤ (বাহাও), توکل (তোকুল), امانت (আমানত), سیاب وسپید (সিয়াব ও সাপিদ), شاہراہیں (শাহরাহী), آنے والے دن (আনে ওয়ালে দিন), ایک تصویر اور ایک کہانی (এক তাসবীর অওর এক কাহানি)।[৪৪৮]

সরলা দেবীঃ সরলা দেবী ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মিরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৮ মে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কৃষণচন্দ্রের ছোট বোন ছিলেন। তাছাড়া তার আরেকটি পরিচয় তিনি প্রখ্যাত ছোটগল্পকার ও নাট্যকার সরণ শর্মার স্ত্রী। সরলা দেবীর লেখার রীতিটি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকার এবং চিত্তাকর্ষক ছিল। তার কথা হৃদয় থেকে এসে কাগজে ছড়িয়ে পড়ে। তার একটি ছোটগল্প "خودکشی" (খোদকাশী) যা ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে- چاند بجھ گیا (১৯৫৪) (চাঁদ বাজ গিয়া)।[৪৪৯]

ওম প্রকাশ লাগরঃ ওম প্রকাশ লাগর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ২২ শে অক্টোবর পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন এবং তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তার সাহিত্য জীবন কবিতা দিয়ে শুরু হলেও ছোটগল্পে তিনি বিশেষ সম্মান অর্জন করেছেন। তিনি বেশ কয়েকটি ছোটগল্প লিখেছেন। তার একটি ছোটগল্প 'দাদা' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে- اندر دھنش (আন্দর ধানেশ)[৪৫০]

মানিক টালাঃ মানিক টালা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ২১ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের লাহোরে জন্ম নেন। তার আসল নাম গোপাল ক্রিশন। তিনি বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। মানিক টালা ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ছোটগল্প লিখা শুরু করেন। তার প্রথম গল্প آنکھ مچولی (আঁখ মাচুলী) 'স্কুল পত্রিকায়' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৫১] তৎকালীন সময়ে অনেক প্রগতিশীল ছোটগল্পকার ছিলেন। তাই মানিক টালা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেছেন এবং ব্যঙ্গ ও কৌতুককে তার কথাসাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত করেছেন। রাজেন্দ্র সিং বেদি মানিক টালার ব্যক্তিত্ব ও ছোটগল্প লেখার কৌশল সম্বন্ধে তার ছোটগল্পের সংগ্রহ 'গুনাহ কা রেস্তা' এর ভূমিকাতে বলেছেন-

"مانک ٹالا افسانہ کہنے کا فن جانتے ہیں--- جیسے زندگی میں مانک ٹالا شریف النفس انسان واقع ہوئے ہیں ایسے ہی وہ اپنی تحریر میں ہیں۔"[৪৫২]

মানিক টালার গল্পগুলো সরাসরি মানুষের বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া হয়, যতক্ষণ না এটি তার হৃদয় ও মনের গভীরে প্রবেশ করে ততক্ষণ তিনি এটিকে গল্পে স্থান দেন না। তিনি বহু বছর বিভিন্ন জায়গায় অতিবাহিত করেছেন এবং তিনি প্রায়ই সেই পরিবেশগুলোকে তার ছোটগল্পে চিত্রিত

করেছেন। যেমন তিনি আফ্রিকা সম্পর্কে বহু গল্প বলেছেন, যেখানে তিনি বহু বছর ধরে বসবাস করেছিলেন। তিনি মুম্বাই চলচ্চিত্র জগতের অনেকগুলো প্লটও বেছে নিয়েছিলেন। তার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি কোন প্লট ছাড়া গল্প তৈরী করতেন না। তার ছোটগল্পে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোকে স্থান দিতেন। তার গল্পগুলো সহজ-সরল ও সংবেদনশীল। তার গল্পগুলো পাঠকদের মনে এমনভাবে স্থান করে নেয় যেন পাঠকদের হৃদয় তৃপ্ত হয়। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- گناہ کارستہ (১৯৭৪) (গুনাহ কা রেস্তা), پیاسی شام (১৯৬৪) (পিয়াসি শাম), پنجرے کے پنچھی (১৯৮৪) (পীঞ্জেরে কে পান্‌ছী)।[৪৫৩]

ওম কৃষণ রাহাতঃ ওম কৃষণ রাহাত ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ২৬ জানুয়ারি পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় জন্ম নেন। তার আসল নাম ওম এবং পদবী রাহাত। তিনি বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি হরিয়ানা ইলেকট্রিক বোর্ডে চাকরি করতেন।[৪৫৪] রাহাত এমন একজন ছোটগল্পকার ছিলেন যিনি তার গল্প প্রকাশ করার জন্য লিখতেন না পাঠকমনের খোরাক জোগানোর জন্য লিখতেন। এ প্রসঙ্গে জাফর পিয়ামী বলেছেন-

"اوم کرشن راحت کو پڑھتے وقت جو خیال سب سے پہلے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دور کا ایک عجیب وغریب افسانہ نگار ہے جو صرف چھپتے کے لیے نہیں لکھتا بلکہ پڑھے جانے کے لیے لکھتا ہے۔ وہ پڑھا بھی جا سکتا ہے سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ اور پڑھے اور سمجھے جانے کے بعد قاری کو سوچنے پر اس طرح مجبور کرتا ہے کہ بقول جوگندر پال پڑھنے کا عمل لکھنے کے عمل میں شامل ہو جاتا ہے۔"[৪৫৫]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- ایک تصویر ادھوری سی (এক তাসবির আধুরী সি), باسی ہونٹ (বাসি হোঁট) (১৯৯৪), ایک آنکھ والا ہرن (এক আঁখ ওয়ালা হরিণ)। তার ছোটগল্পের ভাষা ছিল সহজ , সরল ও মনোমুগ্ধকর। তিনি একজন বড় মাপের ছোটগল্পকার। তার ছোটগল্প সম্বন্ধে এম এম রাজেন্দ্র বলেছেন-

"بنیادی طور پر راحت صاحب ایک عمدہ افسانہ نگار ہیں۔ انھیں کہانی کہنے اور اسے آگے بڑھانے اور سمیٹنے کا ڈھنگ آتا ہے اور ان کا انداز بیان بھی خاصہ طاقت ور ہے۔ افسانوی زمین سنگلاخ ہے اور وم تحریر افسانوی پیرہن کو سیدھا اور شکنوں اور سلوٹوں سے روکے رکھنا بڑی پختہ کاری کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس پختہ کاری کا نعم البدل بجز گہرے مطالعے اور طویل مشق کے اور کچھ نہیں۔ افسانوں منظر اور واقعات کی اصلیت سے قطع نظر ان کی کردار نگاری عام طور پر بے عیب ہے۔ انسانی نفسیات کا بار بار خوب صورت تجزیہ ان کے اس مخصوص ماحول اور طبقے کے گہر مطالعے اور ان کی فنکارانہ صلاحیتوں کا آئینہ دار بھی ہے۔"[৪৫৬]

বাশিশর প্রদীপঃ বাশিশর প্রদীপ তার সাহিত্যিক নাম এবং আসল নাম বাশিশর লাল ধবন। তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ৬ জুলাই পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মৌতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এম. এস. সি শেষ করেন এবং পি.এইচ. ডি ডিগ্রীও অর্জন করেন। তিনি সরকারি চাকরি করতেন। প্রদীপ ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ছোটগল্প লিখা শুরু করেছিলেন। তিনি প্রায় ২৫০টিরও বেশি ছোটগল্প লিখেছেন। প্রদীপ তার আবেগ দিয়ে বাস্তব জীবনের রোমান্টিকতা তার ছোটগল্পে প্রকাশ করেছেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন কোণ থেকে চরিত্রগুলো অন্বেষণ করেন, তুচ্ছ ঘটনাগুলোকে জীবনের বিষয় করে তোলেন এবং দক্ষতার সাথে মানুষের অনুভূতি এবং সম্পর্কগুলো তার ছোটগল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

پیاس (পিয়াস) (১৯৫৮) کاجل اور دھواں (কাজল অওর ধোয়াঁ) (১৯৬৪) پھر سے اجنبی (ফের সে আজনবী) (১৯৭৩) پہلی بار (পহলি বার) (১৯৭৭) ٹکڑے ٹکڑے (টুকড়ে টুকড়ে) (১৯৮১) وہ سب باتیں (ও সব বাতী) (১৯৮৩) تم صرف تم (তুম সেরফ তুম) (১৯৮৭) ابھی تو درد باقی ہے (আভী তো দরদ বাকী হ্যা) (১৯৯৪) سوغات (সোওগাত) (২০০০) [৪৫৭]

করম চাঁদ ধীমানঃ করম চাঁদ ধীমান সম্ভবত ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেন। তিনি ১৯৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তার ছোটগল্প রচনা শুরু করেন। তিনি কৃষণচন্দ্র ও মিন্টোর ছোটগল্প দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার ছোটগল্পের ভাষা বিশুদ্ধ ও নির্ভুল। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে- ٹیلیفون گرل (টেলিফোন গ্রীল) (১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১৫ সেপ্টেম্বর) [৪৫৮]

হরচরণ চাওলাঃ হরচরণ চাওলা ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ৯ জুন পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালীতে জন্ম নেন এবং ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ৫ নভেম্বর মারা যান। দেশভাগের পরে তিনি মিয়ানওয়ালী থেকে পানিপথে চলে এসেছিলেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় চন্ডীগড় থেকে স্নাতক করেন। তিনি উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি ও পাঞ্জাবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে জার্মানি ফ্রান্স হয়ে নরওয়েতে চলে আসেন। অর্থাৎ তিনি দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তি সম্পর্কে তীব্র সচেতন ছিলেন এবং সেগুলোকে তার ছোটগল্পের বিষয় হিসাবে তৈরি করেন। তার জনপ্রিয় একটি ছোটগল্প হচ্ছে- گھوڑے کا کرب (ঘোড়ে কা কারব) যা ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে ঘোড়াটি রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেখানে মানুষকে জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিযোগিতার জন্য হাজার হাজার চাকরি প্রার্থী ঘোড়ার মতো দৌড়াচ্ছে। এছাড়া তিনি আরো অনেক ছোটগল্প

লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে- *ریت سمندر اور جھاگ* (১৯৮০) (রীত সামুন্দর অওর ঝাগ), *عکس آئینے کے* (১৯৭৪) (আকস আয়নে কে), *دریا اور کنارے،* (১৯৮৯) (দরইয়া অওর কিনারে), *ناروے کے بہترین افسانے* (নারওয়ে কে বেহতেরিন আফসানে)।[৪৫৯]

নরেশ কুমার শাদঃ নরেশ কুমার শাদ ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি উর্দু ও ফারসিতে অনেক দক্ষ ছিলেন। তারপর তিনি কর্মের জন্য রাওয়ালপিণ্ডিতে আসেন। সেখানে সরকারি চাকরি পেয়েছিলেন এবং সেখান থেকে আবার জলন্ধর স্থানান্তরিত হন। তিনি সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে লাহোরে মাসিক শালিমারের সম্পাদনা গ্রহণ করেন।[৪৬০] শৈশব থেকেই নরেশ কুমার শাদ কবিতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে তিনি ছোটগল্পের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি কবিতার পাশাপাশি ছোটগল্পও লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- *ڈارلنگ* (ডারলিংগ)।

খীম রাজ সাগর গুপ্তঃ খীম রাজ সাগর গুপ্ত ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে চমরাতে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৬১] তার আসল নাম খীম রাজ গুপ্ত এবং সাগর উপাধি। তিনি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আকাশবানী সিমলায় সহকারি প্রযোজক হিসাবে কাজ করেছেন। খীম রাজ ছোটবেলা থেকেই ছোটগল্প লিখতেন। তার প্রথম ছোটগল্প *گپتان کی بیٹی* (গুপ্তান কি বেটি) জন্মুতে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'চাঁদ' এ প্রকাশিত হয়। এছাড়া তার আরো অনেক ছোটগল্প রয়েছে। সেগুলো হলো- *گپتان خان* (গুপ্তান খান), *بیس سال بعد* (বিস সাল বা'দ), *کھلتے پھول* (খিলতে ফুল), *شکاری لوگ* (শিকারী লোগ), *ایک چاند کی بیٹی* (এক চাঁদ কি বেটি), *جھمبو کی راکھ* (ঝমবু কি রাখ)।[৪৬২]

তার ছোটগল্পগুলোতে প্রেমচাঁদ এবং উপেন্দ্র নাথ অশোকের প্রভাব স্পষ্টভাবেই দৃশ্যমান। তার ছোটগল্প সম্বন্ধে ড. শাবাব ললিত বলেছেন-

"ساغر گپت کی سبھی کہانیاں ہماچل کی عوامی زندگی سے متعلق ان کے گہرے مشاہدے کی غماز ہیں۔ پانگی، ضلع چمبہ کی ایک دور افتادہ وادی ہے جو شہری ماحول سے بالکل الگ تھلگ رہی ہے۔ ساغر گپت نے اس وادی کی اچھوتی زندگی کے متعلق بھی بہت عمدہ کہانیاں سپردِ قلم کی ہیں۔ بدھ لاماؤں کی زندگی پر بھی ساغر نے کچھ اچھے افسانے لکھے ہیں۔ ان کے رومانی افسانوں میں 'پھرکی' ایک اچھی کہانی ہے۔ ان کی رومانی کہانیوں میں ہماچل کے مناظر قطرت، یہاں کے دیہات اور قصبات کے لوگوں کی

نرم رو اور ست، رفتار زندگی اور پسماندگی کی عکاسی بڑی صداقت سے کی گئی ہے۔ اور ذات پات کے ان کڑے بندھنوں اور قیانوسی رسوم و وواجات کی بھی، جن کی قربان گاہ پر اکثر گوریوں کے پیار بلی چڑھادے جاتے ہیں۔"[৪৬৩]

গরদিয়াল সিং আরিফঃ গরদিয়াল সিং আরিফ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ১৯ মার্চ পাকিস্তানের শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু ভাষী। তিনি উর্দু, ফারসি, ইংরেজি, হিন্দি, পাঞ্জাবি ও জার্মানি ভাষা জানতেন। তিনি ইংরেজি ও পাঞ্জাবিতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সরকারি কলেজ চন্ডীগড়ে চাকরি করতেন। তিনি উর্দু সাহিত্যে বিশেষ করে ছোটগল্পে খ্যাতি অর্জন করেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে- رتیاں پیراں (রতীয়াঁ পীরাঁ) [৪৬৪]

বংশী নারদোশঃ বংশী নারদোশ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার আসল নাম বংশী লাল ওলী এবং সাহিত্যিক নাম বংশী নারদোশ। তিনি ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ২১ আগস্ট মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে মেট্রিক পাস করেন। তিনি প্রগতিশীল সংবাদপত্র নয়া যামানায় জলান্ধরে কাজ করতেন। বংশী নারদোশ তার বাবা শ্যাম লাল ওলীর কাছ থেকে সাহিত্যে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তিনি জলান্ধরে তার প্রথম ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পগুলো প্রগতিবাদ, কাশ্মির, কাশ্মিরের পিছিয়ে পড়া ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির দুর্দশার প্রতিফলন ঘটায়। তিনি যখন দশম শ্রেণিতে পড়াশুনা করতেন তখন مادھورام (মাধুরাম) নামে তার প্রথম ছোটগল্প দৈনিক 'হামদারদী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এছাড়া তিনি আরো অনেক ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- تار سوت (তার সুত)।[৪৬৫]

দেবেন্দ্র ইসসারঃ দেবেন্দ্র ইসসার ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের কীমবলপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ৪ই নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বি.এ এবং ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং সাংবাদিক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। তার সাহিত্য লিখা শুরু কলেজ ম্যাগাজিন মশাল থেকে। তার প্রথম ছোটগল্প جنگل (জঙ্গল) যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। তার ছোটগল্পের মধ্যে তিনি অস্তিত্বের রহস্য এবং মানবজীবনে তাদের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ گیت اور انگارے (১৯৫২) (গীত অওর আংগারে), شیشوں کا مسیحا (১৮৫৫) (শিশোঁ কা মাসীহা), کالے گلاب کی صلیب (১৯৭৫) (কালে গোলাপ কি সালিব), کینوس کا صحرا (১৯৮৩) (কীনুস কা সেহরা), پرندے اب کیوں اڑتے (পারিন্দে আব কিউঁ উড়তে)।[৪৬৬]

বলরাজ কোমলঃ বলরাজ কোমল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ২৫ শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের শিয়ালকোটে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ২৬ শে নভেম্বর দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার আসল নাম বলরাজ এবং পদবী কোমল। তিনি উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং তিনি সরকারি চাকরি করতেন। শৈশব শিয়ালকোটে অতিবাহিত হয়েছিল; কিন্তু দেশ বিভাগের পর তিনি দিল্লীতে চলে আসেন। তিনি তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন কাব্য দিয়ে। তারপর তিনি আস্তে আস্তে ছোটগল্প লিখা শুরু করেন। বলরাজ কোমলের ছোটগল্প বেশি নয়। তবে তিনি যে ছোটগল্পগুলো লিখেছেন সেগুলো উর্দু সাহিত্যে উচ্চস্থান অর্জনে সফল হয়েছে। তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক ছোটগল্পকার। তার ছোটগল্পগুলোতে মানুষের সম্পর্কের ভাঙ্গন, একাকীত্ব ও মানসিক বিভ্রান্তি চিত্রায়িত হয়। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে-آنکھیں اور پاؤں (আঁখে অওর পাও) [৪৬৭]

রাজ কানুয়ালঃ রাজ কানুয়াল ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে শাংকলী সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে ২৬ শে মার্চ মৃত্যুবরণ করেন। তার আসল নাম সরদার চিরেনজিৎ সিং এবং সাহিত্যিক নাম রাজ কানুয়াল।[৪৬৮] তিনি তার বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে সিমলায় একটি পাঞ্জাবের সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তার সাহিত্য জীবন বিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল। তার ছোটগল্পগুলোতে প্রাকৃতিক দৃশ্য, বাস্তববাদী ও রোমান্টিকের চিত্র রয়েছে। তিনি বেশিরভাগ রোমান্টিক কল্পকাহিনি লিখেছেন। যেখানে নারীর মনোবিজ্ঞান, প্রেমের গোপনীয়তা এবং নগরায়নের চিত্র স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে ড. শাবাব লালিত বলেছেন-

ان کے افسانوں میں مناظر قدرت کا بیان ایسے حقیقی اور رومان انگیز انداز میں ملتا ہے کہ قاری مسحور سا ہو جاتا ہے۔انھوں نے زیادہ تر رومانی افسانے لکھے جس میں عورت کی نفسیات محبت کے راز و نیاز اور ہماچل کی شہری سوسائٹی کی منہ بولتی تصاویر ملتی ہیں۔ حسین مناظر فطرت اور فلک بوس دیوار کے پیڑوں سے گھرا ہوا شملہ کا رومان پرور شہر ہی ان کی پیشتر کہانیوں کا مرکز و موضوع ہے[৪৬৯]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহ عورت ایک پہلی (আওরাত এক পেহলি), اندھا کنواں (আন্ধা কানুয়ান) چنار کے سائے (চুনার কে সায়ে)।

অমর সিংঃ অমর সিং ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন এবং সরকারি চাকরি করতেন। তিনি খুব বেশি ছোটগল্প লিখেননি তবুও তিনি

যতটুকুই লিখেছেন ততটুকুই উর্দু গদ্যসাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে- تیوری (তেওরি) যা ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে 'আফকার' পত্রিকা করাচীতে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৭০]

কনুর সেনঃ কনুর সেন ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজিতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। কনুর সেন হলেন একজন আধুনিক ছোটগল্পকার। যিনি তার গল্পগুলোতে ভারতীয় কল্পকাহিনি এবং পৌরাণিক কাহিনিতে দক্ষতার সাথে প্রতীক এবং উপমা ব্যবহার করেন। তার কল্পিত কাহিনি মানুষের মানসিকতা এবং মানুষের অস্তিত্ব ও দরিদ্রকে চিত্রিত করে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- ایک ٹانگ کی گڑیا (এক টাংগ কি গুড়িয়া), شاید والا معاملہ (শায়েদ ওয়ালা মু'আমেলা)।[৪৭১]

কিশোরী মনচিন্দাঃ কিশোরী মনচিন্দা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ২রা মার্চ জম্মুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দুতে এম. এ এবং বি. এড ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। শৈশবে কিশোরী মনচিন্দা ছোটগল্প রচনায় আগ্রহী হয়ে উঠেন। তার ছোটগল্পগুলো পাঞ্জাবের পত্রিকায়, পরে জম্মু ও কাশ্মির সাংস্কৃতিক একাডেমির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমদিকে তার ছোটগল্পের ভাষা ছিল সহজ ও সরল। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তার স্টাইল আরো সাবলীল হয়ে উঠেছে। তার ছোটগল্পগুলোতে দারিদ্র্য, জীবনের দুর্দশা, মানুষের বাধ্যবাধকতা ইত্যাদি চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا (১৯৬৭) (অওর ভী গম হে জমানে মে মহব্বত কে সেওয়া) ہرے پودے بخبر زمین (১৯৬৮) (হিরে পুদে বাখবর জমিন) سڑک انصاف کرتی ہے (১৯৭১) (সড়ক ইনসাফ করতি হ্যা) احساس کے گھاؤ (১৯৭৮) (এহসাস কে ঘাঁও) شکست آرزو (১৯৮০) (শিকাস্ত আরজু) تکون کا کرب (১৯৮২) (তাকুন কা কারব) کہرے کی وادی (১৯৮৬) (কেহরে কি ওয়াদী)[৪৭২]

বলদিব শান্তঃ বলদিব শান্ত ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই মার্চ পাকিস্তানের শেখুপুরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০5 খ্রিস্টাব্দে ২৩ শে জুলাই দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন। তার আসল নাম বলদিব রাজ বাজাজ এবং সাহিত্যিক নাম বলদিব শান্ত। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাস করেন। এর পরে তিনি শুল্ক বিভাগে সিনিয়র পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার ছোটগল্পগুলো দেশের নামকরা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন তার একটি ছোটগল্প سرخ چینی (সুরখ চিননী) সাপ্তাহিক পত্রিকা 'আজকাল' ২০০5 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পে বলা হয়েছে যে, ক্ষুধার্ত মানুষ যে কোন কিছু খাওয়ার

জন্য প্রস্তুত থাকে। তার আরেকটি ছোটগল্প ماہیا (মাহিয়া) যা ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল এবং এতে বলা হয়েছে একজন ধার্মিক মানুষ বিভিন্ন ধর্মের প্রধান উপসনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তাকে পথে হত্যা করা হয়েছিল। তবে তিনি মরে যাওয়ার পরেও কারও নাম উল্লেখ করেননি। তার আরো একটি ছোটগল্প بیان (বয়ান); যা ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্পে একটি মেয়ের মনের কথা ও আকাঙ্খা প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া তার আরো ছোটগল্প রয়েছে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-بلدیو شانت کی بارہ کہانیاں (২০০২) (বালাদিব শান্ত কী বারাহ কাহানিয়াঁ)।[৪৭৩]

সুরেন্দর প্রকাশঃ সুরেন্দর প্রকাশ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে একটি ছোটগল্প লিখেছেন যা অন্য একজন প্রকাশ করেছিল এবং তা খুব বিখ্যাত হয়েছিল। তার পর থেকে তিনি ছোটগল্পের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। তার প্রথম গল্প دیوتا (দেবতা) ১৯৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি আধুনিক উর্দু ছোটগল্পের রূপক হিসেবে বিবেচিত হন। তার গল্পগুলো নিষ্ঠুরতার মতো রহস্যময় দক্ষতা এবং গীতায় পূণ। সুরেন্দর প্রকাশ অভিবাসনের কষ্ট সহ্য করেছেন। নিজের শহরে কর্মসংস্থানের সন্ধানে ঘুরেছেন এবং অসহায় হয়ে পড়েন। এই দুঃখকে তিনি তার কল্পকাহিনিতে তুলে ধরেছেন অত্যন্ত নিপুনভাবে। তার কল্পকাহিনি দার্শনিক চিন্তাভাবনা এবং হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত। তার ছোটগল্প উর্দু গদ্যসাহিত্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো হলো- دوسرے آدمی کا ڈرائنگ روم (১৯৬৮) (দোসরে আদমী কা ড্রয়িং রোম), برف پر مکالمہ (১৯৮০) (বরফ পর মাকালেমা), باز گوئی (১৯৮৮) (বাজগোয়ী), حاضر حال جاری (২০০২) (হাজির হাল জারি)।[৪৭৪]

প্রেম প্রকাশ কাহনবীঃ প্রেম প্রকাশ কাহনবী ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ৭ই এপ্রিল পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা ভাদসন গ্রামে এবং পরে খান্না থেকে মেট্রিক পাস করেন এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উর্দুতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি কিছুদিন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করেন। পরে পত্রিকার উপ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। প্রেম প্রকাশ ছোটগল্পে অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। তার ছোটগল্পগুলোর বিষয় ছিল পিছিয়ে পড়া সমাজ এবং যৌন বিধিনিষেধ।তার গল্পগুলো বাস্তবের প্রতিচ্ছবি ছিল। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

کچ کڑے (১৯৬৬) (কুচ কিড়ে) نمازی (১৯৭১) (নামাজি) مکتی (১৯৮০) (মুক্তি) شوتیمبر نے کہا سی (১৯৮৩) (শোতীমবর নে কাহাসী) کج ان کہادی (১৯৯২) (কিজ উন কাহাদি) رنگ منچ تے جھلشو (১৯৯৫) (রং মঞ্চ

তে ভাকশু) سند خلیفہ (২০০১) (সিন্দে খলিফা) پریم کہانیاں (১৯৮৫) (প্রেম কাহানিয়াঁ) پریم پرکاش کی منتخب کہانیاں (প্রেম প্রকাশ কি মুনতাখাবে কাহানিয়াঁ)[৪৭৫]

সাবিত্রী গোস্বামীঃ সাবিত্রী গোস্বামী ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মথুরায় জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম সাবেরা। ড. আনন্দ লাল গোস্বামীর সঙ্গে বিয়ে করায় তার নাম সাবেত্রী গোস্বামী হয়ে যায়। সাবেত্রীর মায়ের ইচ্ছায় তিনি প্রথমে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশুনা করেন এবং পরে তা ছেড়ে দিয়ে নার্সিং পেশায় যুক্ত হন এবং ড. গোস্বামীর সঙ্গে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বিয়ে হয়। তারা প্রথমে হিন্দু ছিলেন পরে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি ৬৫ বছর বয়সে ছোটগল্প রচনা শুরু করেছিলেন এবং এ পর্যন্ত ৬০টিরও বেশি ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পগুলোতে দেশভাগের বেদনা, সামাজিক সমস্যা, বেকারত্ব এবং নারীদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- ساوتری گوسوامی کے افسانے (২০০০) (সাবিত্রী গোস্বামী কে আফসানে), درد کے فاصلے (২০১৪) (দরদ কে ফাসেলে)।[৪৭৬]

নরেন্দ্রনাথ সুজঃ নরেন্দ্রনাথ সুজ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ৩১ জুলাই পাকিস্তানে জন্ম নেন। তিনি মেট্রিক পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। প্রথম থেকেই তিনি পারিবারিক প্রিন্টিং প্রেসের কাজে জড়িত ছিলেন। তার সাহিত্যের খুব শখ ছিল তাই তিনি ছোটগল্প লেখার প্রতি আগ্রহী ছিলেন।[৪৭৭] তার ছোটগল্পগুলো ছিল বাস্তববাদ ও মনস্তাত্ত্বিক। তার ছোটগল্প সম্বন্ধে তার ছোটগল্পের সংগ্রহ 'উফক কে উসপর' এর পেশ লফজ-এ হিরানন্দ সুজ বলেছেন-

"نریندر ناتھ سوز نے اپنے عہد کی زندگی کو بدلتی ہوئی اخلاقی قدروں اور منہدم ہوتے ہوئے عقائد کے تناظر میں دیکھا ہے۔اس لیے ان کی کہانیوں کے کردار اپنے سماجی اور نفسیاتی محاکمہ کی اذیت ناک منزلوں سے گزرتے نظر آتے ہیں۔نریندر ناتھ سوز اپنے خارجی ماحول اور عمرانی گردوپیش سے وابستہ ہو کر اپنے داخلی تخلیقی احساس سے رشتہ استوار رکھتے ہیں۔اس طرح ان کے افسانوں کی روداد، کردار اور ان کے گردوپیش کا ماحول ان کے ماضی کی دستاویزی داستان بن گیا لگتا ہے۔"[৪৭৮]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- افق کے اس پار (উফক কে উসপার)। এই বইয়ে ১১টি ছোটগল্প রয়েছে।

কৃষণ বেতাবঃ কৃষণ বেতাব ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মিসৌরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম কৃষণ কুমার। তিনি বি.এ ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন। কৃষণ বেতাবের ছোটগল্পগুলো পাঞ্জাবি সমাজের একটি আয়না। তার সাহিত্যিক জীবনের সূচনা কবিতা দিয়ে কিন্তু তার পর পরই তিনি ছোটগল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেন। তার ছোটগল্পগুলো একদিকে যেমন মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্মমতা এবং

কঠোরতা প্রতিফলিত করে অন্যদিকে মানবভক্তি, নির্দোষতারও উদাহরণ রয়েছে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

لمحوں کی داستان (লমহোঁ কি দাস্তান) (২০০৯), دردکی فصل (দরদ কি ফসল) (২০১০), شعلوں پر برفباری (শো'লো পর বারফিবারী) (২০১২)।[৪৭৯]

বেদ রাহীঃ বেদ রাহী ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে জম্মুতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। তিনি কবিতা দিয়ে সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন এবং তারপরে প্রেমচাঁদ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পগুলোতে মানুষের আবেগ ছাড়াও জম্মুর দৃশ্যাবলী এবং সেখানকার সমস্যাগুলোও রয়েছে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- کالے ہاتھ (কালে হাত) যা ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে।[৪৮০]

ইয়াশ সুরুজঃ ইয়াশ সুরুজ ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে জম্মুতে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম ইয়াশ রামপাল এবং সাহিত্যিক নাম ইয়াশ সুরোজ। তিনি জম্মু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি উর্দু, হিন্দি ও পাঞ্জাবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন এবং রাশিয়ান দুতাবাসের প্রকাশনায় অনুবাদক হিসেবে চাকরি করেন। প্রথমে তিনি পাঞ্জাবি ভাষায় লিখতেন এবং পরে উর্দুর প্রতি আকৃষ্ট হন। তার ছোটগল্পগুলোতে রোমান্টিক পরিবেশের পাশাপাশা তিনি পিছিয়ে পড়া শ্রেণির বিশ্বজনীনতা এবং দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলোও দেখান। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- زمین پیاسی ہے (১৯৬৪) (জমিন পিয়াসী হ্যা)।[৪৮১]

আমিশ কোলঃ আমিশ কোল ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি উর্দু, হিন্দি ও কাশ্মিরী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ছোটগল্প লিখার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তার প্রথম ছোটগল্প یاقوت (ইয়াকুত) ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৮২] তার ছোটগল্পগুলোতে কাশ্মিরীদের দারিদ্র্য, নারীর অসহায়ত্ব এবং মানসিক বিভ্রান্তির কথা বলা হয়েছে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- تارسوت (তার সুত)।

বলরাজ মিনরাঃ বলরাজ মিনরা ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সাংবাদিক ছিলেন। তিনি একজন আধুনিক ছোটগল্পকার। তিনি ১৯৫৭ খ্রি. থেকে ১৯৭২ খ্রি. পর্যন্ত ৩৭টি ছোটগল্প লিখেছেন।[৪৮৩] তার ছোটগল্পগুলো হলো বিরোধী গল্পের উদাহরণ, তবে তিনি নিজস্ব স্বতন্ত্রতা গ্রহণ

করেছিলেন। তিনি আধুনিক ছোটগল্পগুলোকে নতুন শৈলীতে তৈরি করেন। এ প্রসঙ্গে সারোয়ারুল হুদা বলেছেন-

"بلراج میں رانے اپنی کہانیوں کے ذریعے جس جدیدیت کے خدوخال کو ابھارا تھا، وہی اصل جدیدیت تھی"[৪৮৪]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- مقتل (মাকতল) (২০০৭), سرورالہدیٰ (সরোরুল হাদি) (২০০৪)।

ব্রজ কোতিয়ালঃ ব্রজ কোতিয়াল ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি জম্মুতে জন্মগ্রহণ করেন। তি্নি উর্দু ও হিন্দি ভাষায় লিখতেন। তার সাহিত্যের রুচির জন্ম ছাত্রজীবনেই। ব্রজ কোতিয়ালের অনেক ছোটগল্প জনপ্রিয় হয়েছিল। যেমন لڑکی (লাড়কি), انند (আনন্দ), نقاب اور چہرے (নেকাব অওর চেহরে), مایا پنجابن (মায়া পাঞ্জাবান), چھوکرا (ছোকরা), آئینہ اور موت کے راہی (আয়না অওর মওত কে রাহি)। তার এই গল্পগুলোর নতুনত্ব ও স্বতন্ত্রতা রয়েছে। তবে তার রোমান্টিক বিষয়ের উপর ছোটগল্প نرگس کے پھول (নারগিস কে ফুল) ও آئینہ (আয়না) খুব আকর্ষণীয়। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে- موت کے راہی (মওত কে রাহি)।[৪৮৫]

কুমার পাশীঃ কুমার পাশী ছোটবেলা থেকেই কবিতার প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং তারপর পরই ছোটগল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- پہلی آسمان کا زوال (১৯৭২) (পেহলি আসমান কা যাওয়াল)।[৪৮৬]

ড. ব্রজ প্রেমীঃ ড. ব্রজ প্রেমী ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ৯ সেপ্টেম্বর শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম ব্রজ কিশন এবং সাহিত্যিক নাম ব্রজ প্রেমী। তিনি ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ২০ই এপ্রিল জম্মুতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ছোটগল্প লিখে সাহিত্যে সুপরিচিত হয়েছেন। তার প্রথম ছোটগল্প آقا (আকা) ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'যুওতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৮৭]

তার ছোটগল্পগুলোতে কাশ্মিরের দরিদ্র, কৃষক-মজুর ও অসহায়দের বিষয় তুলে ধরেছেন। কৃষণচন্দ্রের চিন্তাভাবনা ও রীতিটি তার প্রাথমিক ছোটগল্পগুলোতে দেখা যায়, তবে পরে তিনি সাদাত হোসেন মিন্টোর দ্বারা প্রভাবিত হন। ব্রজ প্রেমী ৬০টিরও বেশি ছোটগল্প লিখেছেন। রোমান্স, প্রকৃতিবাদ এবং বাস্তববাদের বিবর্তন তার ছোটগল্পে দেখা যায়। ব্রজ প্রেমীর ছোটগল্প সম্বন্ধে আব্দুল কাদের সরোরী বলেছেন-

"برج پریمی بھی اپنے عہد کی ترقی پسندی سے متاثر ہیں۔ چنانچہ ان کے افسانوں میں بھی مہاجن، ٹھیکہ دار، لمبی توندوں کے ڈراونے سائے، سارے عناصر موجود ہیں۔"[৪৮৮]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে- سپنوں کی شام (১৯৯৫) (সপ্নোঁ কি শাম)।

সতীশ বত্রাঃ সতীশ বত্রা ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ১৯ শে মার্চ পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই জানুয়ারি ফরিদাবাদে মৃত্যুবরণ করেন। লক্ষ্মৌতে তিনি প্রায়শই কফি হাউসে যেতেন, সেখানে শিল্প ও সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিতরা সমবেত হতেন। তার সাহিত্যিক জীবনের সূচনা সম্পর্কে সতীশ বত্রা নিজেই বলেছেন যে কৃষণচন্দ্র তার হৃদয়ে ছোটগল্পের মোমবাতি জ্বালানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। কারণ তিনি কৃষণচন্দ্রের ছোটগল্পগুলো পড়েছেন এবং সেগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এবং এভাবে তিনি ছোটগল্প লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন। এই প্রেরণা থেকেই তিনি অনেকগুলো ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- ویران بہاریں দিরান বাহারেঁ), بوند بوند ساگر (বুন্দ বুন্দ সাগর), آڑی ترچھی لکیریں (আড়ি তারঝি লাকরেঁ)।[৪৮৯]

গুলজারঃ গুলজার ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই আগস্ট পাকিস্তানের জাহলুমে জন্মগ্রহণ করেন।[৪৯০] তার আসল নাম সাপূরান সিং কালরা এবং সাহিত্যিক নাম গুলজার। প্রথমে তিনি গাড়ি মেকানিক্স হিসেবে কাজ করেছিলেন এবং তারপরে তিনি চলচ্চিত্রের সাথে জড়িত হয়েছিলেন। ছবিগুলোতে তিনি গীতিকার, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পরিচালক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি মেট্রিক পর্যন্ত উর্দুতে পড়াশুনা করলেও হিন্দি ভাষাও জানতেন। প্রথমে তিনি কবিতা দিয়ে তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন এবং পরে ছোটগল্পে আগ্রহী হন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- راوی پار (রাদী পার), دھواں (ধোয়াঁ)।

সরদার সরণ সিংঃ সরদার সরণ সিং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে ২৭শে অক্টোবর কাশ্মিরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বি. এস. সি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বি. সি. এস পরীক্ষায় পাস করে বনবিভাগে সহকারি বন সংরক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। সরণ সিং মূলত একজন পাঞ্জাবি ছোটগল্পকার। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উর্দু শিখেছিলেন। যদিও তিনি পাঞ্জাবি ছোটগল্পকার তবুও তিনি উর্দুতে ছোটগল্প লিখেছেন। কলেজে পড়া অবস্থায় তার সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল। উর্দুতে তার ছোটগল্পের সংগ্রহ ننگی دھوپ (নানগী ধুপ), যা ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৯১]

কেদারনাথ শর্মাঃ কেদারনাথ শর্মা ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের মুলতানে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি উর্দু ও হিন্দিতে এবং ইতিহাসে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি উর্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবি এবং ইংরেজি ভাষা জানতেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো হলো- افسانے اپنے اپنے (২০০০) (আফসানে আপনে আপনে), افسانے اپنے پرائے (২০০৩) (আফসানে আপনে পরায়ে), افسانے اچھے اچھے (আফসানে আচ্ছে আচ্ছে), افسانے پیارے پیارے (২০০৩) (আফসানে পিয়ারে পিয়ারে), افسانے نئے نئے (আফসানে নয়ে নয়ে) ও افسانے نئے پرانے (আফসানে নয়ে পুরানে) [৪৯২]

কেদারনাথ এর ছোটগল্প সম্বন্ধে দিপক বাদকি বলেছেন-

"کدارناتھ آس پاس کے ماحول سے کہانیاں چنتے ہیں اور زندگی کی چھوٹی بڑی گھٹناؤں کو اپنی کہانیوں کا موضوع بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں بوقلمونی نظر آتی ہے۔ان کے پلاٹ مربوط ہوتے ہیں اور ان کے خاکے پہلے ہی سے منصوبہ بند طریقے سے طے کیے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر افسانوں میں افسانہ نگار خود ہی راوی بن کر کہانی سناتا ہے اور اپنے تجربے کو تخیلی پیراہن پہنا کر کہانی کا روپ دے دیتا ہے۔ ان کے افسانے ابتدا سے ہی قاری کو اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ وہ نہ لمبی چوڑی تمہید باندھتے ہیں اور نہ طویل منظر نگاری کا سہارا لے کر اپنی عبارت کو مسجع مرصع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔"[৪৯৩]

বীরেন্দ্র পাটোয়ারীঃ বীরেন্দ্র পাটোয়ারী তার বাবা প্রেমনাথ পাটোয়ারীর কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে সাহিত্য পেয়েছেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল।[৪৯৪] বীরেন্দ্র পাটোয়ারীর ছোটগল্পগুলোতে কেবল ব্যক্তিগত যন্ত্রনার চিহ্নই পাওয়া যায়নি। তার ছোটগল্পে সমাজে প্রচুর পরিমাণে অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনাও প্রস্ফুটিত হয়েছে। উর্দু সাহিত্যে আধুনিকতার আধিপত্য ছিল এমন সময়ে তার কলম সর্বাধিক সক্রিয় ছিল। তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো হলো-

فرشتے روتے ہیں (ফেরেশতে রোতে হ্যাঁ) (১৯৮১), دوسری کرن(দোসরী কিরণ) (১৯৮৪), بے چین لمحوں کا تنہا (বেচিন লমহু কা তানহা) (১৯৮৮), اواز سرگوشیوں کی (আওয়াজ সারগুসীও কী) (১৯৯৪), ایک ادھوری کہانی (এক আধুরি কাহানি) (২০০৩), افق (উফক) (২০০৩) دائرے (দায়েরে) (২০১০)।[৪৯৫]

রতন সিং হামেশঃ রতন সিং হামেশের জনপ্রিয় ছোটগল্পগুলো হলো- بدلتے رشتے (বদলতে রেস্তে), سلسلے (সিলসিলে), حسن فطرت میں نہائی زندگی (হুসনে ফিতরত মে নাহায়ি জিন্দেগী) ও مٹھی میں بند خوشبو (মুটঠি মে বন্দ খুশবু)।[৪৯৬]

তার ছোটগল্পগুলোতে তিনি হিমাচলের প্রাকৃতিক দৃশ্যকে সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন। তার ছোটগল্পগুলোতে পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত শ্রমজীবীদের সাধারণ জীবনযাত্রা, বিস্তৃতি, দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা এবং শোষণ পরিষ্কারভাবে চিত্রিত হয়েছে। রতন সিং একজন বাস্তববাদী ছোটগল্পকার

যার উদ্দেশ্য প্রাধান্য পায়। তার অন্যতম ছোটগল্প برادر خورد (বেরাদর খুরদ) সম্বন্ধে ড. শাবাব ললিত বলেছেন-

"ہمیش کے دوسرے افسانوں کی طرح برادر خورد کے مکالموں کی لطافت میں کہانی کی گہری مقصدیت اور معنوی تہہ داری مستور رہتی ہے جو بالکل برہنہ ہو کر قاری کے ذہن کو بوجھل نہیں کرتی۔ ان کی مقصدیت کا انداز ایمائی ہے جسے وہ سلیقے اور فنکارانہ رکھ رکھاو سے برتتے اور نباہتے ہیں۔"[৪৯৭]

বিজয় সুরীঃ বিজয় সুরী ছোটবেলা থেকেই ছোটগল্পের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। এজন্য তিনি অনেক ছোটগল্প পড়তেন এবং ছোটগল্পকার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। তার ছোটগল্পের মধ্যে মানব মনোবিজ্ঞান ও হাস্যরস পাওয়া যায়। তার একটি জনপ্রিয় ছোটগল্প হলো- ایک کہانی (এক কাহানি)। তার ছোটগল্পগুলোতে জীবনের ছোট ছোট কথাগুলো সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে। তার ছোটগল্পের ভাষা খুব মিষ্টি। এ প্রসঙ্গে পুষ্কর নাথ বিজয় সুরীর উপন্যাস 'এক নাও কাগজ কী' এর প্রারম্ভে বলেছেন-

"ان افسانوں میں زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں نہایت خلوص سے کہی گئی ہیں۔ زبان کی مٹھاس اور جذبے کی صداقت پر محنت کی گئی ہے اور افسانوں کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے اصل موضوع کو مسخ یا مجروح نہیں ہونے دیا ہے۔"[৪৯৮]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- آخری سودا (আখেরি সওদা)।

মদন মোহন শর্মাঃ মদন মোহন শর্মা জম্মুর একজন বুদ্ধিমান ছোটগল্পকার ছিলেন। তিনি তার চিন্তা-ভাবনার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন এবং নতুন অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি ছোটগল্প লিখতেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-جہاں گناہ پلتے ہیں (জাহাঁ গুনাহ পালতে হ্যাঁ) چاند کے آنسو (চাঁদ কে আঁসু) [৪৯৯]

গীরধারী লাল খেয়ালঃ গীরধারী লাল খেয়াল ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ১৩ই অক্টোবর জুম্মুর রামগড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উর্দুতে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। গীরধারী লাল খেয়ালের ছোটগল্পে অসহায় মানুষ ও কৃষক, দরিদ্র এবং বস্তিতে বসবাসরত শ্রমিকদের দুর্দশার গল্প বলা হয়েছে। এছাড়াও অভিজাতদের বিভ্রান্তি এবং বৈষম্য সম্পর্কে ফোকাস করা হয়েছে। তার বিখ্যাত ছোটগল্প چراغ چراغ امیدیں (চেরাগ চেরাগ উমিদে)। এই গল্পে একজন বৃদ্ধ, যিনি অপমান সহ্য করেন না এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে এক আশ্রমে আশ্রয় নেন, তবে বন্ধুর ব্যাখ্যাতে তার পুত্র লজ্জায় তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তার আরেকটি ছোটগল্প امانت میں خیانت (আমানত মে খিয়ানত) যা কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একটি বিধবা ও তার মেয়ে পীড়া সম্পর্কে একটি রোমান্টিক গল্প। তার ছোটগল্পের

সংগ্রহ হলো- *چراغ چراغ امیدیں* (চেরাগ চেরাগ উমিদে) এতে ২৫টি ছোটগল্প আছে এবং *آخری پڑاؤ* (আখেরী পাড়াও)।[৫০০]

দিপক কানুলঃ দিপক কানুল তার ছোটগল্পে পশ্চাৎপদ শ্রেণির সমস্যা এবং মানুষের আবেগের নরম দিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তার রীতিটি অত্যন্ত কার্যকর এবং প্রত্যক্ষ যা প্রথম থেকেই পাঠককে মোহিত করে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- *برف کی آگ* (বরফ কি আগ) ও *پمپوش* (পাম্পুশ)। তার বরফ কী আগ ছোটগল্পের সংগ্রহে ১৪টি ছোটগল্প আছে যার সবগুলো ছোটগল্প কাশ্মির সম্পর্কিত।[৫০১]

কুলদ্বীপ রানাঃ কুলদ্বীপ রানার ছোটগল্পে একটি প্রবাহিত পরিবেশ ছিল যা বস্তবের খুব কাছাকাছি ছিল। তিনি প্রেমচাঁদের ছোটগল্প দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার প্রথম দিকের ছোটগল্পগুলোতে প্রেমচাঁদের স্টাইল দৃশ্যমান ছিল। কুলদ্বীপের ছোটগল্পগুলো একটি সুন্দর গদ্য কবিতার মতো। তার বিখ্যাত ছোটগল্পগুলো হলো-

نفرت (নফরত), *ایک خط ایک گیت* (এক খত এক গীত), *زندگی* (জিন্দেগী), *بھوک اور سپنا* (ভুক অওর সপ্না) ও *کرائے کا کمرہ* (কিরায়ে কা কামরা)।

তার অধিকাংশ ছোটগল্পে কাশ্মিরের চিত্র প্রষ্ফুটিত হয়। এ প্রসঙ্গে আব্দুল কাদের সরোরী বলেছেন-

"کلدیپ میں افسانہ نگار کے جوہر ہیں اور وہ اپنے موضوع اور اپنے کرداروں سے بخوبی واقفیت رکھتے ہیں۔ وادی کے دوسرے افسانہ نگاروں کی طرح ان کے افسانوں کا پس منظر بھی عموماً کشمیر کی زندگی ہے، اور کشمیری زندگی کے حسن و قبح کا انھیں عرفان ہے، اکثر وہ نیچے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کی زندگی کو موضوع بناتے ہیں۔"[৫০২]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- *ادھورے خواب* (আধুরে খোয়াব) ও *تنہائیاں* (তানহায়ীয়াঁ)।

রাজেন্দ্র বার্মাঃ রাজেন্দ্র বার্মা ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজেন্দ্র বার্মা একজন ছোটগল্পকার হিসেবে সুপরিচিত। তার ছোটগল্পে সামাজিক চেতনা খুঁজে পাওয়া যায়। তার গল্পগুলোতে সাধারণত হিন্দু মধ্যবিত্তকে তুলে ধরেছেন। তার একটি ছোটগল্প *جاکورا کے سائیاں* (জাকুরা খে ছায়ীয়াঁ) যা ২০০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এটি একটি শিশুদের গল্প। এছাড়া তিনি আরো ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- *پتے ہرے پیلے* (পাত্তে হরে পীলে)।[৫০৩]

উপি শাকিরঃ উপি শাকির সাহিত্য জীবন কবিতা দিয়ে শুরু করলেও তিনি একজন সফল ছোটগল্পকার। তার জনপ্রিয় ছোটগল্পগুলো, نئی راہوں کے متلاشی (নয়ী রাহু কে মিতলাশী), مہمل خیال (মোহমাল খেয়াল), جنات کی کانفرنس (জান্নাত কি কানফারেন্স), تحریک (তাহরিক), راج سپتاہ (রাজ সপ্তাহ), تسکین (তাসকীন) ও شان ہند (শানে হিন্দ)। এছাড়াও তিনি অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- موسم سرما کی پہلی بارش (২০০৫) (মৌসুম সর্মা কে পেহলি বারিশ) এই সংগ্রহে ৩টি ছোটগল্প ও ২টি উপন্যাস ছিল এবং جیتا ہوں میں (২০০৭) (জিয়তা হু মেঁ)।[৫০৪]

হারবাঁস গঙোত্রাঃ হারবাঁস গঙোত্রা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে হিমাচল প্রদেশে জন্ম নেন। তিনি সরকারি চাকরি করতেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই ছোটগল্পের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- زاوے (জাবিয়ে) যা ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে ১২টি ছোটগল্প রয়েছে।[৫০৫] তার এই সংগ্রহের বেশির ভাগ গল্পতে হিমাচলের খুব সুন্দর উপত্যকার বর্ণনা রয়েছে। যেখানে দৃশ্যাবলী, রক্তাক্ত মানুষ এবং সভ্যতার চিত্র রয়েছে। এখানে মনস্তাত্ত্বিক বিভ্রান্তি, আমলাতান্ত্রিক কৌশল এবং শোষণ উপাদানও রয়েছে। তার ছোটগল্প সম্বন্ধে ড. শাবাব ললিত বলেছেন-

"زاویے کے افسانوں میں بعض جگہ پلاٹ کے ڈھیلے پن اور تکنیکی کمزوریوں کے باوجود قاری کی دلچسپی آخر تک بنی رہتی ہے۔ یہ افسانے کوری واقعہ نگاری کے باعث کہیں کہیں سپاٹ پن کا شکار نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کے تانے بانے کے زیر سطح مصنف کا خلوص، دردمندی انسان دوستی اور اصلاح کا جذبہ ان کو کامیاب کہانیوں کے زمرے میں لا کھڑا کرنے کا جواز مہیا کرتے ہیں۔"[৫০৬]

বিলরাজ বখশঃ বিলরাজ বখশ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ১০ই ডিসেম্বর কাশ্মিরে জন্ম নেন। তার আসল নাম বিলরাজ কুমার বখশ। তিনি ইংরেজি, উর্দু, হিন্দি, পাহাড়ি এবং পাঞ্জাবি ভাষায় দক্ষ ছিলেন। তিনি বি. এস. সি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সাংবাদিকতার পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। তার প্রথম ছোটগল্প چاندی کا دھواں (চাঁদী কা ধোয়াঁ) ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৫০৭] এছাড়া তিনি অনেক ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- ایک بوند زندگی (এক বুন্দ জিন্দেগী)। ড. মুশতাক সাদাফ বিলরাজ বখশ-এর 'এক বুন্দ জিন্দেগী' বইয়ে তার ছোটগল্প সম্বন্ধে বলেছেন-

"بلراج بخشی ایک معتبر اور صاف ستھرے کہانی کار ہیں۔ وہ کہانی کو کہانی کی طرح پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمیں کسی فریب میں الجھاتے نہیں اور نہ خود الجھتے ہیں بلکہ کہانی کو بڑی معصومیت کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں اور اسی لے ان کی کہانیوں میں حسن آفرینی اور حقیقت پسندی کی فضا کا احساس ہوتا ہے جو انھیں انفراد بخشتا ہے۔"[৫০৮]

দিপক বাদকিঃ দিপক বাদকি ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ১৫ই ফেব্রুয়ারি কাশ্মিরের শ্রীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম দিপক কুমার বাদকি এবং সাহিত্যিক নাম দিপক বাদকি। তিনি এম. এইচ. সি এবং বি. এড ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়া তিনি পি. এইচ. ডি ডিগ্রীও অর্জন করেন। দিপক বাদকির প্রথম ছোটগল্প سلمی (সালমী) ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীনগরে দৈনিক পত্রিকা 'হামদারদ'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।[৫০৯] দিপক বাদকি একজন বাস্তববাদী ছোটগল্পকার। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হওয়ায় তার ছোটগল্পগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে থাকে। দিপক বাদকি হিজরত, মানব মনোবিজ্ঞান, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যুতে সুন্দর ও সুনির্দিষ্টভাবে ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের তিনটি সংগ্রহ হলো- ادھورے چہرے (১৯৯৯) (আধুরে চেহরে), چنار کے پنجے (২০০৫) (চুনার কে পানজে), زیبرا کراسنگ پر کھڑا آدمی (২০০৭) (জেব্রা ক্রসিং পর খাড়া আদমী)।[৫১০] দিপক বাদকির ছোটগল্প সম্বন্ধে ড. কমর রইস বলেছেন-

"میری فہم یہ ہے کہ آپ نہایت عقلی ذہن اور روشن سوچ رکھتے ہیں جو لگ بھگ آپ کی ہر کہانی سے مترشح ہوتی ہے اس لیے جس مجلہ میں کہیں آپ کی کہانی نظر آتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح اسے پڑھ کر لطف اٹھاؤں۔ پچھلے دنوں 'زیبرا کراسنگ۔۔۔' والی کہانی اسی طرح لپک کر پڑھ ڈالی تھی۔اس کی نازک اور معنی خیز رمزیت نے شدت سے متاثر کیا تھا۔ آپ کے تخلیقی ذہن کی انفرادیت، دکھوں اور محرومیوں سے نڈھال انسانی روح کی تلاش میں ہی ملتی ہے۔راجندر سنگھ بیدی کے علاوہ کسی دوسرے کہانی کار کے یہاں ایسا رچا ہوا Compassionate رویہ اور Pathos کم از کم مجھے نظر نہیں آیا۔ کہیں ہے بھی تو سرسری۔ قاری کے دل میں تیر کی طرح نہیں اترتا۔"[৫১১]

জসবন্ত মানহাসঃ জসবন্ত মানহাস ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে জম্মুতে জন্মগ্রহণ করেন।[৫১২] তিনি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। তিনি ছোটগল্পের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি সমাজের খারাপ ও ভুল রীতিনীতিগুলোকে তার ছোটগল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করতেন। তিনি তার ছোটগল্পগুলোতে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেন সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা, ব্যক্তির একাকীত্ব, নৈতিক মূল্যবোধের লঙ্ঘন, আনন্দ, ঘুষখোর, যুবক-বৃদ্ধ এবং নারী, সাম্প্রায়িকতা ইত্যাদি। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- مسکراتے ناسور (২০০4) (মুসকারাতে নাসুর), توجہ (২০০২) (তোয়াজ্জা), یادیں (২০০৯) (ইয়াদী) ও اندھیرے اجالے (আন্ধেরে উজালে)।

ইন্দিরা শবনমঃ ইন্দিরা শবনম ইন্দু ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ শে নভেম্বর পাকিস্তানের করাচীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার আসল নাম ইন্দিরা পুনাওয়াল এবং সাহিত্যিক নাম ইন্দিরা শবনম ইন্দু। তিনি বি. এ

এবং বি. এড ডিগ্রী অর্জন করেন। তার মাতৃভাষা সিন্ধি। এছাড়া তিনি উর্দু, হিন্দি ও মারাঠি ভাষা জানতেন। তার সাহিত্য জীবন কবিতা দিয়ে শুরু হলেও সামাজিক বিষয় নিয়ে অনেক মজার ছোটগল্প লিখেছেন। ছোটগল্পকার নারীবাদী, তাই নারীদের বিষয়গুলো তার ছোটগল্পে প্রস্ফুটিত হয়। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- عبادت (২০০৪) (ইবাদত), ضمیر اپنا اپنا (২০০৮) (জামির আপনা আপনা)।[৫১৩]

আনন্দ লেহেরঃ ছাত্র অবস্থায় আনন্দ লেহের ছোটগল্পের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তার প্রথম ছোটগল্প پتھر کے آنسو (পাথ্থর কে আঁসু) কলেজ ম্যাগাজিনে সম্ভবত **১৯৭২** খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তার আদর্শের দিক থেকে তিনি সাহিত্যিক যাত্রা প্রগতিবাদ থেকে শুরু করেছিলেন। তার যাত্রা অত্যন্ত সফলতা অর্জন করেছিল। তিনি সাহিত্যের অনেকগুলো দিকও আবিষ্কার করেছেন। তিনি একজন আধুনিক ছোটগল্পকার। তার চিন্তাভাবনা কৃষণচন্দ্রের মতো। তার ছোটগল্পগুলোতেও রোমান্টিক প্লট এবং চরিত্র রয়েছে। তার ছোটগল্পগুলো আদর্শবাদী ও বস্তুনিষ্ঠ দ্বারা পরিপূর্ণ।

তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো হলো- سرحد کے اس پار (সারহাদ কে উসপার) এবং انحراف (ইনহেরাফ)।[৫১৪]

বিহারী লাল বিহারীঃ বিহারী লাল বিহারী একজন বুদ্ধিমান ও আধুনিক ছোটগল্পকার। তিনি ছোটগল্প লিখে উর্দু গদ্যসাহিত্যে যে অবদান রেখেছেন তা অতুলনীয়। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- آئینۂ زندگی کے (আয়নে জিন্দেগী কে) যা ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৫১৫] এই সংগ্রহ সম্বন্ধে ড. শাবাব ললিত বলেছেন-

"ان (مجموعۂ آئینۂ زندگی کے) میں سے چند کہانیاں انھوں نے ہلکے پھلکے مزانیہ رنگ میں لکھی ہیں، جیسے کہ 'اپریل فول'، 'مالِ غنیمت'، کنبہ بندی، وغیرہ۔ یہ ان کی طبعی بذلہ سنجی اور باغ و بہار طبیعت کی عکاس ہیں۔ان کی سنجیدہ کہانیوں میں مقصدیت اور افادیت کی ایک زیریں لہر دوڑتی ہے جو کہانی کے اختتام پر اُبھر کر سامنے آجاتی ہے۔"[৫১৬]

বালুনাত সিংঃ বালুনাত সিং বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের একজন স্বনামধন্য ছোটগল্পকার। তিনি ১৯ বছর বয়সে سزا (সাজা) নামে একটি ছোটগল্প লিখেছেন এবং ২৩ বছর বয়সে তার ছোটগল্পের সংগ্রহ جاگا (জাগা) প্রকাশিত হয়েছিল, যা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তার আরেকটি ছোটগল্প کٹھن ڈگریا (কঠিন ডিগরীয়া) যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। বালুনাত সিংয়ের ছোটগল্পে পাঞ্জাবের গ্রামগুলো বিশেষত

মাঝিয়া অঞ্চলের জীবনের প্রতিটি বিষয় উপস্থাপন করা হয়। তিনি উর্দু ভাষার সাথে পাঞ্জাবি রীতি এবং কৃষকদের জীবনী তার লিখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বালুনাত সিং ছোটগল্পে শিখদের জীবনকেও চিত্রায়িত করেছেন। তার ছোটগল্পের চরিত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে জগা বিনতি সিং, কর্ণেল সিং, দিলীপ সিং প্রমুখ। তিনি রোমান্সে বিশ্বাস করেন যার মধ্যে মানসিকতা তীব্রতা প্রেমের মর্যাদা এবং মন্দকে ভালো পরিণত করার শক্তি রয়েছে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হচ্ছে- جاگا (জাগা) (১৯৪৩), نارو پود (নারোপুদ) (১৯৪৪), ہندوستان ہمارا (হিন্দুস্তান হামারা) (১৯৪৭), سنہرا دیس (সুনাহারা দেশ), چراغ کا بجھنا اور دوسرے افسانے (চেরাগ কা বুঝনা অওর দোসরে আফসানে), پہلا پتھر (পেহলা পাথ্থর), پنجاب کی کہانیاں (পাঞ্জাব কি কাহানিয়াঁ) ও میں ضرور روؤں گی (মে জরুর রোওন্গী)।[৫১৭]

ঠাকুর পুঞ্জিঃ ঠাকুর পুঞ্জি উর্দু গদ্য সাহিত্যে উপন্যাস লিখে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি অসংখ্য ছোটগল্পও লিখেছেন তবে মাত্র দুটি সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তার প্রথম ছোটগল্প راجہ (রাজা) স্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল। তার ছোটগল্পে পাহাড়ের কোলে বাস করা গ্রামের হতদরিদ্র, সরল-নিরীহ মানুষদের শোকের কান্না শোনা যায়। ঠাকুর সাহেব মানুষের মন, রাজনীতি, সমাজকে খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন এবং সেগুলো তার গল্পে অতি সহজে তুলে ধরতেন। এ প্রসঙ্গে নুরশাহ বলেছেন-

"ٹھاکر پونچھی انسانی نفسیات اور سیاسی و سماجی باریکیوں پر گہری نظر رکھتے تھے۔ مدھم سروں میں انسانی فطرت کا فنکارانہ چابکدستی سے عکاسی کرتے تھے۔ انداز نگارش کی دلکشی و دلاویزی اور فنی بلندیوں کا متزاج ٹھاکر پونچھی کے فن کی خوبی رہی ہے۔"[৫১৮]

তিনি তার জীবনে অনেকগুলো ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- زندگی کی دوڑ (জিন্দেগী কি দৌড়) (১৯৫৯) এতে ১০টি ছোটগল্প আছে এবং چناروں کے چاند (চুনারোঁ কে চাঁদ)।[৫১৯]

রামলালঃ রামলাল উর্দু উপন্যাসে যেমন অবদান রেখেছেন, তেমনি ছোটগল্পেও বিশেষ অবদান রেখেছেন। উর্দু ছোটগল্পে একটি নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় নাম রামলাল। রামলাল স্বাধীনতার আগে লেখালেখি শুরু করেছিলেন এবং আশির দশক পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। তার প্রথম ছোটগল্প تھوک (থোক) যা সাপ্তাহিক পত্রিকা "খায়াম" লাহোরে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৫২০] কৃষণচন্দ্র ও শাহাদত হোসেন মিন্টোর প্রভাব তার প্রাথমিক ছোটগল্পগুলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠে। পরে তিনি তার নিজস্ব রীতি গ্রহণ করেছিলেন যা প্রেমচাঁদের ঐতিহ্যের নিকটবর্তী ছিল। এই প্রক্রিয়াটি তার ছোটগল্পে

সাধারণত প্রবাহিত হয় এবং তার ছোটগল্পের চরিত্রগুলো সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রেণির অন্তর্গত। উর্দু প্রীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তিনি ভারতের চেয়ে পাকিস্তানে বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তার দক্ষতা তাকে উর্দু সংঘের প্রাণবন্ত করে তুলেছিল। নারীদের সম্মান, খ্যাতি সবকিছু তিনি তার গল্পে তুলে ধরেন। এ প্রসঙ্গে ডক্টর গিয়ানচাঁদ বলেছেন-

"رام لعل جہاں کسی خاتون کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ان کے حسن کو ناپتے ہیں۔"[৫২১]

তিনি মনোবিজ্ঞান এবং যৌন বিষয়ে অনেক সুন্দর ছোটগল্প লিখেছেন। যেহেতু রামলাল রেলপথে নিযুক্ত ছিলেন তাই তিনি বিভিন্ন জায়গা দেখার এবং বিভিন্ন চরিত্রের সাথে সাক্ষাত করার সুযোগ পেয়েছিলেন যা তার ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ছিল। তার তিনটি ছোটগল্প- ادسی (উদসী), نئی دھرتی پرانے لوگ (নয়ি ধরতী পুরানে লোগ) ও ایک شہر پاکستان کا (এক শহর পাকিস্তান কা) খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। এছাড়া তার অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত ছোটগল্প রয়েছে। তিনি প্রায় দু'শটি ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো হচ্ছে-

آئینے (আয়েনে) (১৯৪৫), انقلاب آنے تک (ইনকিলাব আনে তক) (১৯৪৯), جو عورت ننگی ہے জো আওরাত নানগি হ্যা) (১৯৪৯), وہ مسکرائے گی(ও মুসকারায়ে গী), نئی دھرتی پرانے گیت (নয়ী ধরতী পুরানে গীত) (১৯৫৮), گلی گلی (গলি গলি) (১৯৬২), آواز تو پہچانو (আওয়াজ তু পেহচানো) (১৯৬৩), چراغوں کا سفر (চেরাগু কা সফর) (১৯৬৬), انتظار کے قیدی (ইনতেজার কে কয়েদি) (১৯৬৭), کل کی باتیں(কুল কি বাতে) (১৯৬৭), اکھڑے ہوئے لوگ (উখড়ে হোয়ে লোগ) (১৯৬৭), گزرتے لمحوں کی چاپ (গুজরতে লমহু কি চাপ) (১৯৭৪), معصوم آنکھوں کا بھرم (মা'সুম আঁখে কা ভ্রম) (১৯৭৭), رام لعل کے منتخب افسانے(রাম লাল কে মুনতাখাব আফসানে) (১৯৮৫)।[৫২২]

এম এম রাজেন্দ্রঃ এম এম রাজেন্দ্র একজন বিখ্যাত ছোটগল্পকার। তার লেখনী বিভিন্ন ধারায় ছিল। তিনি উপন্যাস লিখতেন, তবে তার ছোটগল্প বেশি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। তার ছোটগল্পে রোমান্টিকতা, বাস্তবতা রয়েছে যা বারবার তার কাল্পনিক জগতকে স্পর্শ করে। একটি সভ্য সমাজ যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ এবং শ্রেণি নয়, যেখানে আন্তরিকতা এবং নৈতিকতার প্রাচুর্য রয়েছে এবং যেখানে মানবতা দেখা যায়। এগুলোকেই তিনি তার গল্পের বিষয় করতে চান। তার গল্পগুলো গ্রামীন জীবন এবং হিন্দু মুসলিম চরিত্রগুলো দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির অন্তর্গত বলে মনে হয়। তিনি অনেক ছোটগল্প লিখেছেন, যার মধ্যে রয়েছে- خوشیوں کی بارات (খুশিও কি বারাত)। এর মধ্যে রয়েছে

আন্তরিকতা এবং নিঃস্বার্থতার একটি গল্প, যেখানে একজন মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে এক করে পুরো গ্রামে সমৃদ্ধি এনে দেয়। তার আরেকটি ছোটগল্প ایک سبک (এক সবক), এটি এমন এক গল্প যেখানে একজন ব্যক্তি তার দুটো স্ত্রীদের কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করেন। کاکا سنکر کا مندر (কাকা শংকর কি মন্দির) তার এমন একটি ছোটগল্প যা গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এ গল্প একজন নিরক্ষর, নীতিগত নিরপেক্ষ কারিগর, কুস্তিগীরের গল্প যার আগে, এমনকি শিক্ষিত লোকেরা মাথা নত করে। তার আরো একটি ছোটগল্প جات نہ پوچھو سادھو کی (জাত না পুছো সাধু কি) গল্পটিতে জোর দেওয়া হয়েছিল যে ঈশ্বরের জপগুলোতে আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে, যাদের কোনো ধর্ম নেই এবং জাত নেই তাদের সরলতা এবং তাদের প্রতি মানুষের আস্থা তাদের জন্য যথেষ্ট। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- نقوش (১৯৪৯) (নাকুশ), کھوکھلے انبار (১৯৫৪) (খোখলে আনবার)।[৫২৩]

দেশ চিত্রাকরঃ দেশ চিত্রাকর সাহিত্যিক নাম এবং আসল নাম এইসপি মালহোত্রা। তিনি ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ১৮ই নভেম্বর পাকিস্তানের গৌহাটে জন্ম নেন। তিনি বি. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। শৈশব থেকেই তিনি সাহিত্যের দিকে ঝুঁকে পড়েন। তিনি ছোটগল্প লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করেছেন। তার প্রথম ছোটগল্প تین چہرے (তিন চেহরে) যা ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে 'আজকাল' পত্রিকায় নয়াদিল্লীতে প্রকাশিত হয়েছিল। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- شمشیر وسناں اول (১৯৮৬) (শামশীর ও সুনান আওয়াল), عورت ایک روپ انیک (আওরাত এক রূপ অনেক)।[৫২৪]

জোগিন্দর পালঃ জোগিন্দর পাল শুরু থেকে উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি ছোটগল্পের আগ্রহী ছিলেন। কৃষণচন্দ্র, মিন্টো, বেদী থেকে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার প্রথম গল্প تیاگ سے پہلے (তৈয়াগ সে পেহলে) মাসিক পত্রিকা "সাকী" দিল্লীতে ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বিভিন্ন জায়গায় হিজরত করতেন, সে জন্য তার ছোটগল্পে আফ্রিকান জীবনের বিভিন্ন দিক, ভারতীয় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ এবং নতুন রাজনীতি ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, দক্ষতার সাথে চিত্রিত করেছেন। তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় এবং আন্তরিকতার সাথে তার ছোটগল্প রচনা করেন। তিনি তার ছোটগল্পে প্রচুর প্রতীক, রূপক এবং আরো অনেক কিছু ব্যবহার করেছেন। তিনি ছোটগল্পের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে আছেন যেন, এটি তার জীবনের একটি অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠেছে। তিনি তার জীবনে অনেকগুলো ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংকলনগুলো হলো-

دھرتی کا کال (ধরতী কা কাল) (১৯৬১), مٹی کے اور ایک (মিট্টি কে অওর এক) (১৯৭১), میں کیوں سوچوں (মে কেউ সোচু), رسائی (রসায়ী), لیکن (লেকিন), سلوٹین (সলুটিন) (১৯৭৫), بے محاورہ (বে মহাবারাহ), بے ارادہ (বেইরাদাহ), کتھانگر (কথাঙ্গীর) (১৯৮৬), کھلا (খোলা) (১৮৮৯), کھود بابا کا مقبرہ (খোদ বাবা কা মাকবারাহ), جوگندر پال کے افسانوں کا انتخاب (জোগিন্দর পাল কে আফসানোঁ কা ইন্তিখাব), جوگندر پال کے شاہکار افسانے (জোগিন্দর পাল কো শাহকার আফসানে) (১৯৯৬), پرندے (পারিন্দে) (২০০০), بستیاں (বস্তিয়া) (২০০০), نہیں رحمان بابو (নেহি রহমান বাবু) (২০০৫)।[৫২৫]

রতন সিংঃ রতন সিং ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের পর পাঞ্জাবিতে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। তবে তার সহকর্মী রামমলের পরামর্শে তিনি ছোটগল্পের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেন। রতন সিং এর ছোটগল্পে ভারতীয় সভ্যতার পুনরুদ্ধার দেখা যায়। তিনি তার ছোটগল্পের মাধ্যমে সত্যকে সামনে আনতে চেয়েছিলেন। যেমন তার ছোটগল্প چاچا گور بخش سنگھ (চাচা গোর বখশ সিং), যেখানে আসল চরিত্র চাচা গোরবখশের মতো জীবনে কিছু সত্য প্রকাশ করেন। তার আরেকটি ছোটগল্প ایک تھا دانشور (এক থা দানশুর)। এখানে লেখক বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যে জাতি বুদ্ধিজীবীদের সম্মান করে সে জাতি উন্নতির শিখরে যেতে পারে এবং بوجھ (বোঝ) ছোটগল্পে লেখক ভারতীয় অতিথি ও তার চূড়ান্ত চিত্র চিত্রায়িত করেন। তার حوصلہ (হোসলা) ছোটগল্পে শিশুরা দ্রুত বেড়ে উঠার জন্য আগ্রহী, তবে যতো তাড়াতাড়ি বড় হয় ততো তাদের অনুভূতি বাড়তে থাকে তা দেখানো হয়েছে। এছাড়া রতন সিং এর ہزاروں سال لمبی رات (হাজারোঁ সাল লম্বি রাত) ছোটগল্প সাহিত্যে নিজের জায়গায় তৈরি করেছে। দেশের মানুষের মানসিক বিশ্লেষণ এবং মূল্যবোধের পতন তার ছোটগল্পের বিষয়। তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো হলো-

پہلی آواز (পেহলি আওয়াজ) (১৯৬৯), پنجرے کا آدمی (পিঞ্জীরে কা আদমী) (১৯৭২), کاٹھ کا گھوڑا (কাঠ কা ঘোড়া), پناہ گاہ (পানাহ গাহ), پانی پر لکھا نام صبح کی پری (পানি পর লিখা নাম সুবহে কি পরী), مانک موتی (মানিক মোতী)।[৫২৬]

মোহন ইয়াবারঃ মোহন ইয়াবার দেশভাগের আগে সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন; কিন্তু স্বাধীনতার পরে তিনি ছোটগল্প রচনা করতে থাকেন। তার গল্প কাহিনিতে তিনি জীবনের নতুন দিক উন্মোচনের

চেষ্টা করেছেন। তার ছোটগল্পগুলো মানব সচেতনতা এবং মানব মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। তার ছোটগল্প সম্বন্ধে নুর শাহ বলেছেন-

"موہن یاور کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے اس پاس سے کہانیوں کا مواد سمیٹ لیتے تھے، واقعت کی دنیا سے زندہ کردار منتخب کرتے تھے اور پھر انہیں فن اور تکنیک کے قالب میں ڈھال دیتے تھے۔ وہ انسانی نفسیات پر بھی کافی گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کے افسانوں میں انسانیت کا گہرا خلوص بھی ملتا ہے۔"[৫২৭]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহগুলো হলো- وہسکی کی بوتل(ওহসকী কি বোতল) (১৯৫৮) এতে ১২টি ছোটগল্প রয়েছে। سیاہ تاج محل(সিয়া তাজমহল) (১৯৬১)। تیسری آنکھ (তেসরী আঁখ)। دو کنارے (দো কিনারে)।[৫২৮]

রামকুমার আবরুলঃ রামকুমার আবরুল তার সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন ছোটগল্প দিয়ে। তার ছোটগল্পগুলোতে প্রকৃতিবাদ এর ধারা স্পষ্ট। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- بے بنگلہ بے بھارت (বে বাংলা বে ভারত)। এই সংগ্রহের প্রায় সব ছোটগল্প বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ক।[৫২৯]

শরণ কুমার বার্মাঃ শরণ কুমার বার্মা একজন প্রখ্যাত ছোটগল্পকার। তার প্রথম ছোটগল্প پردیسی (পারদেশী) যা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়েছিল। তার অধিকাংশ গল্পই প্রবীনদের জীবন ও সমস্যার প্রতিফলন করে, যেখানে একাকীত্ব এবং অসচ্ছলতা পাওয়া যায়। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

نیم کے پتے (নিম কে পাত্তে) (১৯৬০), گرتے ہوئے درخت (গিরতে হুয়ে দরখত), دل دریا(দিল দরিয়া) (১৯৮৫), جنگل(জঙ্গল) (২০০১), راگ رام کلی(রাগ রাম কলী) (১৯৭০)।[৫৩০]

নন্দকিশোর বিক্রমঃ নন্দকিশোর বিক্রম একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক ছিলেন। কিন্তু ছোটগল্পেও তার নান্দনিকতা কোন অংশে কম নয়। তার প্রথম ছোটগল্প ادیب (আদিব) মাসিক পত্রিকা 'নিরালা' ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে ছাপা হয়েছিল। তার ছোটগল্পগুলো বাস্তব ধর্মী এবং এতে দেশভাগের চিত্রও দেখা যায়। তার ছোটগল্পে দেশভাগের সময়ের সমস্যা ও সামাজিকীকরণ প্রাধান্য পেয়েছিল। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- منتخب افسانے (মুনতাখাব আফসানে) (১৯৮২) ও آدھا سچ (১৯৭০) (আধা সাচ)।[৫৩১]

শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্যঃ শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্য একজন ছোটগল্পকার হিসেবে উর্দু গদ্য সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নাম। শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্য মূলত একজন গবেষক, তবে তিনি সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন

ছোটগল্পের মাধ্যমে। তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলেও উর্দু ছোটগল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে কলম তুলেছিলেন। তার প্রথম গল্প *امر کہانی نمرا* (অমর কাহানি নাম্বারা), যা ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে 'পিয়াম' নামে দৈনিক পত্রিকায় হায়দ্রাবাদে প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে সে সময় তার সব ছোটগল্প হায়দ্রাবাদের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। তার ছোটগল্পগুলো দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং কৃষকদের দুর্দশার প্রতিফলন ঘটায়। শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পর্কে মোঃ ইমরানকোরেশী বলেছেন-

"اس طرح شانتی رنجن بھٹاچاریہ نے اپنے زمانے کے واقعات وحالات ہی کو اپنے افسانوں میں کامیابی اور خوبصورتی کے ساتھ پیش کردیا ہے انھوں نے حسن وعشق کے قصے نہیں سنائے ہیں بلکہ حیدر آباد کی تلنگانہ تحریک اور بنگال کی کمیونسٹ تحریک سے جڑے رہتے ہوئے جس زمینی سچائی کو دیکھا اور محسوس کیا تھا اسے افسانے کی شکل میں پیش کردیا۔"[৫৩২]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- *راہ کانٹا* (রাহ কাঁটা) (১৯৬০) ও *شاعر کی شادی* (শায়ের কি শাদী)।[৫৩৩]

সত্বীয়াপাল আনন্দঃ সত্বীয়াপাল আনন্দের সাহিত্য জীবন আনুষ্ঠানিকভাবে পঞ্চম দশকে শুরু হয়েছিল। তার প্রথম ছোটগল্পের সংগ্রহ ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি শিয়া ও বিংশ শতাব্দীর জন্য শতাধিক ছোটগল্প লিখেছেন। আনন্দের ছোটগল্পে জীবনের বিভিন্ন রং পাওয়া যায়। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

جینے کے لیے (জিনে কে লিয়ে) (১৯৫৪), *اپنے مرکز کی طرف* (আপনে মারকায কি তরফ) (১৯৫৬), *بستی* (বস্তি) (১৯৫৭), *پچاس اور ایک*(পাচাশ অওর এক), *اپنی اپنی زنجیر*(আপনি আপনি জাঞ্জির) (১৯৯০), *پتھر کی صلیب* (পাথ্থর কি ছালীব)।[৫৩৪]

তেজ বাহাদুর ভানঃ তেজ বাহাদুর ভান ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে লেখা শুরু করেছিলেন। তিনি কালচুরাল কংগ্রেসের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাই শুরুতে তিনি বাস্তববাদকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু রোমান্স থেকে বিচ্যুত হননি। প্রথম দিকে তিনি *لال چیزیں* (লাল চীজেঁ) এবং *سرمایہ دار کا خواب* (সারমায়া দার কা খাব) নামে দুটি ছোটগল্প লিখেছেন, যেখানে সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যু তুলে ধরেছেন। তার ছোটগল্প সম্বন্ধে নুরশাহ বলেছেন-

"تلاش، جوتے، سہارا، عورت، میری اپنی بچی، اندازہ اور سنتوش بھی مخصوص انداز تحریر کی بدولت مقبول ہوئیں۔ ان کہانیوں میں عام لوگوں کے مسائل ملتے ہیں، متوسط طبقے کی پریشانیاں، دکھ سکھ، ناکامیاں اور محرومیاں ملتی ہیں۔"[৫৩৫]

তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

جہلم کے سینے پر (জোহলাম কে সিনে পর) (১৯৬০), عورت (আওরাত) (১৯৬৫), تلاش (তালাশ) (১৯৮৯)।[৫৩৬]

দিলীপ সিংঃ দিলীপ সিং উর্দু গদ্য সাহিত্যে একজন সুপরিচিত নাম। তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। দিলীপ সিং ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে লেখালেখি শুরু করেছিলেন। তিনি উর্দু, ফারসি, পাঞ্জাবি এবং ইংরেজিতে দক্ষ ছিলেন। তার ছোটগল্পগুলো কৌতুক ও রসিকতায় পরিপূর্ণ ছিল। তার ছোটগল্প سردار ہرکارہ (সর্দার হারকারাহ) খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তার প্রথম ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো- سارے جہاں کا درد (১৯৯০) (সারে জাহা কা দারদ) ও দ্বিতীয় گوشے میں قفس کے (১৯৯২) (গোশে মে কফস কে)।[৫৩৭]

গুলশান খান্নাঃ গুলশান খান্না উর্দু গদ্য সাহিত্যে একজন বিশিষ্ট নাম। তিনি ছাত্র অবস্থায় ছোটগল্প রচনা করেন। তার গল্পগুলোতে জীবনের ভাঙ্গা সম্পর্কের তিক্ততা রয়েছে, মানব সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিকতা ও চরিত্রের গুরুত্বেও জোর দেওয়া হয়েছে। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

بارش میں ایک آدمی (বারিশ মে এক আদমী), درد جو آنکھوں بہا(দারদ জো আঁখু বাহা), کھوئی کھوئی جنت(খোয়ী খোয়ী জান্নাত), اور انسان جاگ اٹھا(অওর ইনসার জাগ উঠা)।[৫৩৮]

পুষ্কর নাথঃ পুষ্কর নাথ শৈশব থেকে জ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। পুষ্কর নাথকে আধুনিক সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় ছোটগল্পকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তার ছোটগল্পগুলো সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা, মূল্যবোধ, মনস্তাত্ত্বিক, পারিবারিক ও পরিবেশ ভিত্তিক হয়ে থাকে। তার অধিকাংশ ছোটগল্পগুলো কাশ্মিরী জীবন, মানুষের দারিদ্র্য, দুর্দশা ও অজ্ঞতার প্রতিফলন করে। এ প্রসঙ্গে আব্দুল কাদের সরোরী বলেছেন-

پشکر ناتھ کے افسانوں کا محرک کشمیر کی زندگی اور اس کی حسین فضائیں ہیں، لیکن وہ فطرت کے ان حسین مناظر کے درمیان عوام کی غربت اور ان کا افلاس ایک تضاد ہے، جس کے نقوش وہ بڑی جانکاری کے ساتھ ابھارتے ہیں۔[৫৩৯]

তিনি তার জীবনে অসংখ্য ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

اندھیرے اجالے (আন্ধেরে উজালো) (১৯৬১), ڈل کے باسی (ডাল কে বাসি) (১৯৬৭), عشق کا چاند اندھیرا (ইশক কা চাঁদ আন্ধেরা) (১৯৮১), کانچ کی دنیا(কাঁচ কী দুনিয়া) (১৯৮৪)।

অনিল ঠাকুরঃ অনিল ঠাকুর প্রকৃতপক্ষে একজন নাট্যকার। তবে তিনি উপন্যাস এবং ছোটগল্প লিখেছেন। অনিল ঠাকুরের ছোটগল্পগুলো সমাজের আয়নাস্বরূপ। তিনি তার ছোটগল্পে সমসাময়িক বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। তিনি অনেকগুলো ছোটগল্প লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

گرم برف (গরম বরফ) (১৯৯০), موسمی پرندے (মৌসুমী পারিন্দে) (১৯৯৯)।[৫৪০]

জতীন্দ্র বিল্লুঃ জতীন্দ্র বিল্লু উর্দু গদ্য সাহিত্যে একজন সৃজনশীল লেখক। তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। পূর্ব ও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মূল্যবোধগুলোর সংঘর্ষ তার ছোটগল্পে স্পষ্টতই দৃশ্যমান। তিনি মনস্তাত্বিক এবং যৌন বিষয়ের উপর লিখতেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

پہچان کی لوگ پر (পেহচান কি লোগ পর) (১৯৮৬) جزیرہ (জাজিরা) (১৯৯৪) نئے دیس میں(নয়ে দেশ মে) (১৯৯৮) سودا (সওদা) (১৯৭০) آخری پڑاؤ (আখেরি পড়াও) (২০১২) انجانا کھیل(আনজানা খেল) (২০০১) درد کی حدسے پر(দারদ কি হাদসে পর) (১৯০০) چکر (চক্কর) (১৯৭০)[৫৪১]

ডক্টর কেওয়াল ধীরঃ ডক্টর কেওয়াল ধীরের دھرتی روپڑی (ধরতী রো পাড়ী) প্রথম ছোটগল্প ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তার ছোটগল্পগুলো একদিকে বাস্তববাদ এবং অন্যদিকে রোমান্সে ভরপুর। তিনি সন্ত্রাসবাদ এবং সম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

بکھری ہوئی زندگی (বিখরী হুয়ী জিন্দেগী) (১৯৮৩) اپنادامن اپنی آگ (আপনা দামন আপনি আগ) (১৯০০)[৫৪২]

মালিক রামঃ মালিক রাম ছাত্র থাকাকালীন সাহিত্যে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তার সাহিত্য জীবন ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কবিতা দিয়ে শুরু করেন এবং পরে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ছোটগল্প ও উপন্যাসে মনোযোগী হন। তার ছোটগল্পগুলোতে রোমান্স ও বাস্তববাদের মিশ্রণ রয়েছে। তিনি তার ছোটগল্পে মধ্যবিত্তের অত্যন্ত সরলতা ও নির্দোষতার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি সাধারণের বাইরে গিয়ে তার ছোটগল্পে নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি কোন গল্প বলার সময়, নতুন শৈলী, নতুন থিম এবং নতুন কৌশল নিয়ে আসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-

پیاراور ترازو (পিয়ার অওর তরাজু), عشق ہوگیاہے (ইশক হোগিয়া হ্যা)। عشق میں پھول نہیں (ইশক মে ফুল নেহি) جانے وہ کیسے لوگ تھے (জানে ও কেইসে লোগ থে) شہر کی خوشبو (শহর কি খুশবু) تصویر کے پھول (তাসবির কে ফুল)।[৫৪৩]

অমর মাল মুহীঃ অমর মাল মুহী একজন গঠনমূলক ছোটগল্পকার। চাকরির সময় তিনি উর্দু ছোটগল্পের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তার ছোটগল্পগুলোতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উচ্চতা এবং নিম্ন স্তরের বর্ণনা রয়েছে। তার সবচেয়ে জনপ্রিয় গল্প احساس کا کرب (এহসাস কা কারব) ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ হলো-زعفران زار (জাফরান জার)।[৫৪৪]

৩.৪ প্রবন্ধ

গদ্য হলো মানুষের কথ্য ভাষার লেখ্যরূপ। সাহিত্যে বর্ণনামূলক গদ্যকে প্রবন্ধ বলা হয়। প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম একটি শাখা। এর সমার্থক শব্দগুলো হলো- সংগ্রহ, রচনা, সন্দর্ভ। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু শৈল্পিক, কাল্পনিক, জীবনমুখী, ঐতিহাসিক কিংবা আত্মজীবনীমূলক হয়ে থাকে। প্রবন্ধে মূলত কোন বিষয়কে তুলে ধরে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। অর্থাৎ কল্পনা শক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে লেখক যে নাতিদীর্ঘ সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করেন তাই প্রবন্ধ।[৫৪৫] প্রবন্ধকে ইংরেজিতে Essay বলা হয়। প্রবন্ধের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে-

Essay an analytic, interpretative, or critical literary composition usually much shorter and less systematic and formal than a dissertation thesis and usually dealing with its subject from a limited and often personal point of view.[৫৪৬]

উর্দুতে প্রবন্ধের সংজ্ঞা ফাহিম উদ্দীন নূরী এভাবে দিয়েছেন-

"سمجھانے کے لئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ کسی چیز، واقعہ یا بات کے متعلق جو کچھ معلوم ہو اس کی روشنی میں اس چیز یا واقعہ یا بات کے مختلف پہلوؤں پر تحریر کے ذریعہ سے اظہار خیال کئے جانے کو مضمون کہتے ہیں"[৫৪৭]

উর্দুতে গদ্যের প্রবর্তক হচ্ছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান তার আগে গদ্যের ধারা ছিল না শুধু পদ্য লিখা হতো। তিনিই প্রথম গদ্যকে জনসাধারণের সামনে নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ প্রবন্ধ তার হাত ধরেই উর্দুতে এসেছে। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উর্দু সাহিত্যে প্রথম প্রাবন্ধিক হচ্ছেন স্যার সৈয়দ আহমদ খান। যদিও উর্দু গদ্য সাহিত্যের প্রবন্ধে মুসলিম সাহিত্যিকদের অবদান বেশি তবুও প্রবন্ধে অমুসলিম সাহিত্যিকরা অল্প বিস্তর অবদান রেখেছেন।

কৃষণচন্দ্রঃ অমুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে কৃষণচন্দ্র প্রবন্ধে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন। তিনি গদ্য সাহিত্যে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প লিখে যেমন চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তেমনি প্রবন্ধ লিখেও উর্দু গদ্য সাহিত্যে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। প্রবন্ধের মাধ্যমেও তিনি সমাজের ভালো খারাপ দিকগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে

ধরেছেন। তার উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো- غلط فہمی (গলত ফেহমি), بدصورتی (বদ সুরতি), گانا (গানা), رونا (রোনা), جان پہچان (জান পেহচান) ইত্যাদি। এছাড়া তার আরো অনেক প্রবন্ধ রয়েছে। তার প্রবন্ধের সংকলনগুলো হলো مضامین کرشن چندر (মাজামিনে কৃষণচন্দ্র) چڑیوں کی الف لیلی (চিড়িয়োঁ কী আলিফ লায়লা), دیوتا اور کسان (দেবতা অওর কিসান)।

পণ্ডিত ব্রজ মোহন দাতাতরিয়া কাইফীঃ পণ্ডিত দাতাতরিয়া কাইফী উর্দু পদ্য ও গদ্য সাহিত্যে দাপটের সাথে অবদান রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা আখলাক দেহলবী বলেছেন-

وہ ادیب تھے، شاعر تھے۔ شاعر گر تھے۔ زبان دان تھے۔ اہل زبان تھے۔ اور نفسیات زبان کے ماہر تھے۔[৫৪৮]

তিনি উর্দু কাব্য সাহিত্যে যেমন উজ্জ্বল নক্ষত্র তেমনি গদ্য সাহিত্যে সমুজ্জ্বল। তিনি উর্দু সাহিত্যে যেমন উপন্যাস লিখে অনেক সুনাম অর্জন করেছেন তেমনি প্রবন্ধে অশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছেন। তার প্রবন্ধের সংগ্রহ হলো- ہماری زبان (হামারি জবান)।

পণ্ডিত কিষণ পরশাদ কোলঃ পণ্ডিত কিষণ পরশাদ কোল উর্দু গদ্য সাহিত্যে একটি বিশেষ নাম। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটক লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যে নিজের অবস্থান দখল করে নিয়েছেন। তিনি প্রবন্ধেও বিশেষ অবদান রেখেছেন। তিনি ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলো বেশি লিখতেন। তার প্রবন্ধের বইগুলো হচ্ছে- انقلاب روس (ইনকিলাবে রুশ) যা ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। ہندوستان کا نیا دستوار حکومت (হিন্দুস্তান কা নয়া দাস্তুয়ারে হুকুমাত) এটিও ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। انڈیا نیشنل کانگریس (ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস) এবং ادبی اور قومی تذکرے (আদবি অওর কওমী তাজকিরে)।[৫৪৯]

জিয়া ফতেহ আবাদীঃ জিয়া ফতেহ আবাদী প্রকৃতপক্ষে একজন কবি ছিলেন। তবুও তিনি গদ্য সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তিনি উর্দু গদ্য সাহিত্যে ছোটগল্প ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তার ছোটগল্পের সংগ্রহ মাত্র একটি; কিন্তু প্রবন্ধের সংগ্রহ রয়েছে ৩টি। অর্থাৎ তিনি ছোগটল্পের চেয়ে প্রবন্ধ বেশি লিখেছেন। তার প্রবন্ধের সংগ্রহগুলো হলো- شعر و شاعر (শের ও শায়ের) ১৯৭৪ খ্রি., اویہ نگاں (আওইয়ায়ে নিগাঁ) ১৯৮৩ এবং مضامین ضیا پر صدارت (মাজামিন জিয়া পর সদারাত) ১৯৮৫ খ্রি.।[৫৫০]

শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্যঃ শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্য উর্দু গদ্য সাহিত্যে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি একাধারে ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধকার ও সমালোচক হিসেবে উর্দু গদ্য সাহিত্যে বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। তিনি বাংলাদেশের একমাত্র উর্দু অমুসলিম সাহিত্যিক। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে পশ্চিম বঙ্গের কৃষ্টিকালচার, সংস্কৃতি সবকিছুই সুনিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি প্রবন্ধ লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যে অশেষ অবদান রেখেছেন। তার প্রবন্ধের সংকলন হচ্ছে- چند مضامین (চান্দ মাজামিন) যা ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।[৫৫১]

মাস্টার রামচন্দ্রঃ মাস্টার রামচন্দ্র উর্দু গদ্য সাহিত্যে এক বিশিষ্ট নাম। তিনি ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সুন্দরলাল। তার বাবা ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন। তাই তিনি তার মায়ের কাছেই লালিত-পালিত হন। যেহেতু তার পিতা ছিলেন না তাই তিনি বেশি পড়াশুনা করতে পারেন নি। খুব শীঘ্রই চাকরিতে যোগ দেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত মেধাবী হওয়ার কারণে চাকরি ছেড়ে আবার পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি যেহেতু পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেহেতু বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখতেন এবং সেগুলো পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো- علم الحساب (ইলমুল হিসাব)। তিনি দিল্লী কলেজের শিক্ষক ছিলেন এবং তার এগারোটি বই প্রকাশিত হয়েছিল।[৫৫২]

৩.৫ সাংবাদিকতা

সংবাদ মূলত মুদ্রণজগৎ, সম্প্রচার কেন্দ্র, ইন্টারনেট অথবা তৃতীয় পক্ষের মুখপাত্র-কিংবা গণমাধ্যমে উপস্থাপিত বর্তমান ঘটনাপ্রবাহের একগুচ্ছ নির্বাচিত তথ্যের সমষ্টি যা যোগাযোগের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।[৫৫৩] এক কথায় বলা যায়- সংবাদ হলো চলতি ঘটনার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ যা পাঠকের আগ্রহ উদ্দীপিত করে। সংবাদ যারা তৈরি করেন তারা হলেন সাংবাদিক। সংবাদিকরা যা করেন, তা হচ্ছে সাংবাদিকতা।

Journalism is the production and distribution of reports on current events based on facts and supported with proof or evidence.[৫৫৪]

উর্দুতে সাংবাদিকতাকে সাহাফত "صحافت" বলা হয়। সাহাফত শব্দটি আরবি শব্দ- صحيفه (সহীফা) থেকে নেওয়া হয়েছে যার আভিধানিক অর্থ প্রকাশিত পৃষ্ঠা।[৫৫৫] আব্দুস সালাম খোরশেদ বলেছেন-

"صحافت کا لفظ صحیفہ سے نکلا ہے اور صحیفہ کے لغوی معنی کتاب یا رسالہ کے ہیں۔ بہر حال عملاً ایک عرصۂ دراز سے صحیفہ سے مراد ایک ایسا مطبوعہ مواد ہے، جو مقررہ وقتوں پر شائع ہوتا ہے۔ چنانچہ تمام اخبارات و رسائل صحیفہ ہیں"[৫৫৬]

সংবাদ সাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান তুলে ধরা হলো।

সাদাসুখলালঃ উর্দু সাংবাদিকতায় যে অমুসলিম সাংবাদিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তিনি হলেন সাদাসুখলাল। তার পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়নি, তবে তিনি চাকরির জন্য কলকাতায় আসেন এবং ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মুন্সী হিসেবে যোগদান করেন। তার সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি কলকাতার প্রথম সংবাদপত্র "جام جہاں نما" (জামে জাহান নুমা) এর সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকা ২৭ মার্চ ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৫৫৭] এছাড়া তিনি উর্দুতে "আনয়ারুল আবসা" নামে আরো একটি সংবাদ পত্র আগ্রাতে প্রকাশ করেছেন।

লালালাজপাত রায়ঃ লালালাজপাত রায় ভারতীয় প্রেস এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বিশিষ্ট নাম। তিনি ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুন্সী রাধা কিশণ। তিনি উর্দু, ফারসি এবং আরবি ভাষায় শিক্ষার্জন করেছেন।[৫৫৮] তিনি ওকালতি পেশায় যুক্ত থাকলেও লিখালেখির প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন সংবাদপত্রে উর্দুতে প্রবন্ধ লিখতেন। ১৯ বছর বয়সে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে তিনি "بھارت دیش سدھارک" (ভারত দেশ সধারক) নামে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৫৫৯] তিনি স্বপ্ন দেখতেন তার নিজস্ব একটি সংবাদপত্র থাকবে। অবশেষে তার স্বপ্ন সফল হলো। তিনি "بندے ماترم" (বন্দে মাতরাম) নামে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতেন।[৫৬০]

বসন্ত কুমার চ্যাটার্জীঃ বসন্ত কুমার চ্যাটার্জী প্রকৃতপক্ষে একজন বাঙ্গালি কিন্তু তিনি পাঞ্জাবে বসবাস করতেন। তার সাংবাদিক জীবন স্বাধীনতার পূর্বে শুরু হয়। প্রথমে তিনি نئی روشنی (নয়ী রৌশনি) পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্বাধীনতার পরে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। সেখানে তিনি 'রোজানা হিন্দ' এবং 'উসরী জাদীদ' পত্রিকায় তার প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন। এরপর তিনি কলকাতা ছেড়ে দিল্লীতে চলে আসেন। দিল্লীতে তিনি 'নয়ী দুনিয়া' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন এবং সর্বশেষ তিনি দৈনিক পত্রিকা 'প্রতাপ' এর সঙ্গে সংযুক্ত হন।[৫৬১]

মুন্সী দয়া নারায়ণ নিগমঃ মুন্সী দয়া নারায়ণ নিগম জন্মগতভাবে বুদ্ধিমান, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক ছিলেন। তিনি কানপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ২২ শে মার্চ ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল শিব প্রসাদ নিগম যিনি একজন বিখ্যাত উকিল ছিলেন। তিনি কায়স্থ বংশোদ্ভূত ছিলেন।[৫৬২] তিনি বি. এ. ডিগ্রী অর্জন করলে তার বাবা তাকে উকিল করতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু তার সাহিত্যে বেশি আগ্রহ ছিল। সেই আগ্রহের দরুণ তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। সেই সময় বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'যামানা' বারিলিতে প্রকাশিত হয়েছিল যার মালিক ছিল মুন্সী রাজ বাহাদুর। তিনি মুন্সী দয়া নারায়ণ নিগমের মেধা দেখে 'যামানা' পত্রিকার সম্পাদক করতে চান। যেহেতু তিনি কানপুরে বাস করতেন তাই মুন্সী রাজ বাহাদুর তার পত্রিকা 'যামানা'র অফিস কানপুরে নিয়ে যান। তারপর থেকেই দয়া নারায়ণ নিগম 'যামানা' পত্রিকার ৪০ বছর ধরে দায়িত্ব পালন করেন এবং এই পত্রিকায় সাহিত্যের বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হতো। তারপর তিনি **১৯১২** খ্রিস্টাব্দে কানপুরে 'আজাদ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই দু'টি পত্রিকা **১৯৪২** খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে।[৫৬৩]

মাহাশী কৃষণঃ মাহাশী কৃষণ **১৯০৬** খ্রিস্টাব্দে সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন যখন তার বয়স ২৫ বছর ছিল। তার প্রথম সাপ্তাহিক পত্রিকা پرکاش (প্রকাশ) ৩০ মার্চ **১৯১৯** খ্রিস্টাব্দে এবং তিনি আরো একটি পত্রিকা پرتاپ (প্রতাপ) লাহোরে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার কারণে তাকে জেলেও যেতে হয়। অবশেষে তিনি ৮৪ বছর বয়সে ২৫ ফেব্রুয়ারি **১৯৬৩** খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৬৪]

দেওয়ান সিং মাফতুনঃ দেওয়ান সিং মাফতুন ১৪ আগস্ট **১৮৯০** খ্রিস্টাব্দে মিয়ানওয়ালীতে জন্মগ্রহণ করেন। খুব ছোটবেলায় তিনি তার বাবাকে হারান।[৫৬৫] তাই তিনি পড়াশুনায় বেশি দূর এগোতে পারেননি। তিনি **১২** বছর বয়সে রোজগার করতে থাকেন। উপার্জনের জন্য তিনি লাহোর চলে আসেন এবং সেখানে কয়েকটি পত্রিকায় কাজ করেন। তারপর তিনি লক্ষ্মৌয়ে ہمدم (হামদাম) এবং رعیت (রয়ীত) পত্রিকায় কাজ করেন। ২৪ শে আগস্ট **১৯২৪** খ্রিস্টাব্দে তার নিজের পত্রিকা ریاست (রিয়াসত) চালু করেন যা সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসেবে চলতে থাকে।[৫৬৬]

মুন্সী হর সুখ রায়ঃ মুন্সী হর সুখ রায় **১৮৫০** খ্রিস্টাব্দে ১৪ জানুয়ারি সাপ্তাহিক পত্রিকা کوہ نور (কোহিনুর) লাহোরে প্রকাশ করেন। তিনি কায়স্থ বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং পাঞ্জাবের বাসিন্দা ছিলেন। কোহিনুর পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে জমনা প্রসাদও নিযুক্ত ছিলেন।[৫৬৭]

মুন্সী দেওয়ান চাঁদঃ মুন্সী দেওয়ান চাঁদ সম্ভবত **১৮৫১** খ্রিস্টাব্দে শিয়ালকোটে ریاض الاخبار (রিয়াজুল আখবার) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ যুগে তাকে উর্দু সাংবাদিকতার পিতা বলা হতো।

তিন চশমায়ে ফয়েজ, খোরশেদ আলম, হিমায়ে বেবাহা, নুর আ'লা, অক্টোরিয়া পিপর নামে দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[৫৬৮]

মুন্সী নওল কিশোরঃ মুন্সী নওল কিশোর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে اودھ اخبار (আউধ আখবার) লক্ষ্মৌতে প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রথমে সাপ্তাহিক এবং পরে দৈনিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকায় নাম করা কবি সাহিত্যিকরা তাদের সাহিত্যকর্ম লিখতেন। বিশেষ করে বিখ্যাত ঔপন্যাসিক রতন নাথ সরশার তার সফল উপন্যাস 'ফাসানায়ে আজাদ' এই পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন এবং পরে তা বই আকারে প্রকাশ করেন।[৫৬৯]

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে উর্দুতে সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা سرکاری اخبار (সরকারি আখবার) চালু হয়। প্রথম দিকে যার দায়িত্বে ছিলেন পণ্ডিত অযোধ্যা প্রসাদ। এরপরে মুন্সী পিয়ারে লাল এই পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি اتالیق پنجاب (আতালিকে পাঞ্জাব) নামে মাসিক পত্রিকারও দায়িত্বে ছিলেন।[৫৭০]

প্রফেসর ধরম নরায়ণ قران السعدین (কুরআনুস সায়েদিন) নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে বারেলিতে عمدۃ الاخبار (উমদাতুল আখবার) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় যার সম্পাদক প্রথমে মৌলবী আব্দুর রহমান ছিলেন এবং পরে লঝমন প্রসাদ এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৫৭১] পণ্ডিত মুকুন্দর লাল তার চাচা পণ্ডিত গোপীনাথ গোরী ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা اخبار عام (আখবারে আম) চালু করেন। কিছুদিন পরে এই পত্রিকাটির নাম পরিবর্তন করে 'আম আখবার' রাখা হয় এবং পত্রিকাটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।[৫৭২]

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১ ড. আসলাম আজাদ, *উর্দু নাবেল আজাদি কে বা'দ* (নয়াদিল্লীঃ সীমনাথ প্রকাশন, তা. বি.), পৃ. ৯ ।

২ সাহিল বুখারি, *উর্দু নাবেল নিগারি* (দিল্লীঃ আলহামরা পাবলিশার্স, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ১১ ।

৩ *তদেব*, পৃ. ১১ ।

৪ ড. আসলাম আজাদ, *উর্দু নাবেল আজাদিকে বা'দ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭ ।

৫ *তদেব*, পৃ. ১০ ।

৬ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকাঃ আবিষ্কার, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৮ ।

৭ *তদেব*, পৃ. ৮ ।

৮ সাহিল বুখারি, *উর্দু নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১ ।

৯ E. M Forster, *Aspects of the novel* (London: 1962), p. 34.

১০ আলে আহমেদ সরুর, *তানক্বীদী ইশারে* (লক্ষ্মৌঃ ইদারায়ে ফুরুগে উর্দু, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ১৪ ।

১১ ড. মেহজাবিন, *কৃষণচন্দ্র কি নাবেল নিগারি অওর নিসায়ি কিরদার* (নয়াদিল্লীঃ মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৭ ।

১২ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০ ।

১৩ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কী তারিখ* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২৪৪ ।

১৪ *তদেব* ।

১৫ প্রফেসর ইবনে কানুল, *উর্দু আফসানা* (দিল্লীঃ কিতাবি দুনিয়া, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৩ ।

১৬ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫ ।

১৭ প্রফেসর ইবনে কানুল, *উর্দু আফসানা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩ ।

১৮ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ শাখছিয়্যাত অওর কারনামে* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৩১০ ।

১৯ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬ ।

২০ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু (দিল্লীঃ উর্দু কিতাব ঘর, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ . ২৪৯ ।

২১ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি* (হায়দ্রাবাদঃ আলিয়াস ট্রিট্রেস পাবলিশার্স বুক, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৪৪ ।

২২ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩ ।

২৩ *প্রেমচাঁদ, জলওয়ায়ে-ঈছার* (লাহোরঃ কিতাবি মঞ্জিল, তা. বি.), পৃ. ১৬০ ।

২৪ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার* (দিল্লীঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৩৪ ।

২৫ *তদেব*

২৬ *প্রেমচাঁদ, জলওয়ায়ে-ঈছার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩ ।

২৭ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২ ।

২৮ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩ ।

২৯ *তদেব*।

৩০ ড. মো: রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯।

৩১ *প্রেমচাঁদ*, *বাজারে-হুসন* (দিল্লী: নিউ তাজ অফস পোস্ট, ১৯৫৬ খ্রি.), পৃ. ১৩।

৩২ *তদেব*, পৃ. ৪০-৪১।

৩৩ *তদেব*, পৃ. ১২৭।

৩৪ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।

৩৫ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫।

৩৬ ড. মো: রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

৩৭ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

৩৮ ড. মো: রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

৩৯ সরদার জাফরী, *তারাক্কি পছন্দ আদব* (আলীগড়: আঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু হিন্দ, ১৯৫৭ খ্রি.), পৃ. ১৩২।

৪০ ড. মো: রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।

৪১ মুন্সী প্রেমচাঁদ, *গোশায়ে আফিয়াত*, প্রথম খণ্ড (দিল্লী: ইদারায়ে ফরুগে উর্দু, তা.বি.), পৃ. ২০।

৪২ প্রেমচাঁদ, *গোশায়ে আফিয়াত*, ২য় খণ্ড (দিল্লী: ইদারায়ে ফুরুগে উর্দু, তা. বি.), পৃ. ৪৫১-৪৫২।

৪৩ ড. মো: রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৬।

৪৪ সৈয়দ মুহাম্মদ আজিম, *প্রেমচাঁদ কা ফন্নী ও ফিকরি মুতালি'আ* (দিল্লী: উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমি, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৯১।

৪৫ সরদার জাফরী, *তারাক্কি পছন্দ আদব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

৪৬ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।

৪৭ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১০।

৪৮ *তদেব*, পৃ. ২০৮।

৪৯ ড. মো: রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

৫০ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।

৫১ মুন্সী প্রেমচাঁদ, *চৌগান হাস্তি*, প্রথম খণ্ড (লাহোর: দারুল আশায়াত পাঞ্জাব, ১৯৩৬ খ্রি.), পৃ. ১৪৭।

৫২ মুন্সী প্রেমচাঁদ, *চৌগান হাস্তি*, ২য় খণ্ড (দিল্লী: আদবী মারকিয, তা. বি.), পৃ. ৩৯১।

৫৩ ড. মো: রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৪।

৫৪ মুন্সী প্রেমচাঁদ, *চৌগান হাস্তি*, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭।

৫৫ *তদেব*, পৃ. ৪৬৮।

৫৬ ড. মো: রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।

৫৭ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩।

৫৮ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াতে নাবেল নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮।

৫৯ ড. মো: রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

৬০ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬-১১৭।

৬১ মুন্সী প্রেমচাঁদ, *বেওয়া* (দিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিডেট, ১৯৫৫ খ্রি.), পৃ. ১৭৯।

৬২ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০।

৬৩ *তদেব*, পৃ. ১৩০।

৬৪ মুন্সী প্রেমচাঁদ, *বেওয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০।

৬৫ *তদেব*, পৃ. ১১-১২।

৬৬ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২-১২৩।

৬৭ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭।

৬৮ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯-২০০।

৬৯ মুন্সী প্রেমচাঁদ, *গবন*, ১ম খণ্ড (লাহোরঃ লাজপাতরায়ে ইন্ডাজট্রিস, ১৯৩৯ খ্রি.), পৃ. ২৮৪।

৭০ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬।

৭১ মুন্সী প্রেমচাঁদ, *গবন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।

৭২ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬।

৭৩ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।

৭৪ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০।

৭৫ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৪।

৭৬ *তদেব*, পৃ. ১৩১-১৩২।

৭৭ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২।

৭৮ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪।

৭৯ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩।

৮০ মুন্সী প্রেমচাঁদ, *ময়দানে আমল* (দিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া, ১৯৪৩ খ্রি.), পৃ. ৩৫৩।

৮১ ড. কমর রইস, *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৪।

৮২ সৈয়দ মুহাম্মদ আজিম, *প্রেমচাঁদ কা ফন্নী ও ফিকরি মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪।

৮৩ প্রদীপ দাশ গুপ্ত, *প্রেমচাঁদ শত বার্ষিকী সংকলন* (কলিকাতাঃ অন্বেষা, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৪; ড. সগির আফরাহিম, *উর্দু আফসানা তারাক্কি পছন্দ তাহরিক সে ক্বাবল* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৩৬-৩৭; জাফর রেজা, *প্রেমচাঁদ অওর তা'মির এ ফন* (এলাহাবাদঃ সাবিস্তার এশাহাগঞ্জ, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৯৬।

৮৪ প্রদীপ দাশ গুপ্ত, *প্রেমচাঁদ শত বার্ষিকী সংলকন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪; ড. সগির আফরাহিম, *উর্দু আফসানা তারাক্কি পছন্দ তাহরিক সে ক্বাবল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭; জাফর রেজা, *প্রেমচাঁদ অওর তা'মির এ ফন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

৮৫ প্রদীপ দাশ গুপ্ত, *প্রেমচাঁদ শত বার্ষিকী সংলকন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫; জাফর রেজা, *প্রেমচাঁদ অওর তা'মির এ ফন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

৮৬ জাফর রেজা, *প্রেমচাঁদ অওর তা'মির এ ফন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬।

৮৭ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৮৮ প্রদীপ দাশ গুপ্ত, *প্রেমচাঁদ শত বার্ষিকী সংকলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩; জাফর রেজা, *প্রেমচাঁদ অওর তা'মির এ ফন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৮৯ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

৯০ *তদেব*।

৯১ ড. জহির আলী সিদ্দিকী, *আফসানে কে মি'মার* (দিল্লী: মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫৭।

৯২ জগদীশ চন্দ্র বিধাভান, *কৃষণচন্দ্র শাখছিয়্যাত অওর ফন* (নয়াদিল্লী: মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ২০-২১।

৯৩ *তদেব*, পৃ. ২৩।

৯৪ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কি তারিখ* ,প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭।

৯৫ কে কে খুল্লার, *উর্দু নাবেল কা নিগার খানা* (নয়াদিল্লী: সীমানাত প্রকাশন, ১৯৮৩ খ্রি.), পৃ. ৬১।

৯৬ *তদেব*, পৃ. ৬৩।

৯৭ হায়াত ইফতেখার এম. এ., *কৃষণচন্দ্র কে নাবেলোঁ মে তারাক্কি পছন্দি* (লক্ষ্ণৌ: নাসিম বুক ডিপো, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৫৮-৫৯।

৯৮ ওকার আজীম, *দাস্তান সে আফসানে তক* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৮৮।

৯৯ ড. মুহাম্মদ আহসান ফারুকী, *উদু নাবেল কি তানক্বীদী তারিখ* (লক্ষ্ণৌ: ইদারায়ে ফুরুগে উর্দু, ১৯৬২ খ্রি.), পৃ. ২২২।

১০০ আজীজ আহমেদ, *তারাক্কি পছন্দ আদব* (দিল্লী: চমনবুক ডিপো, উর্দু বাজার, তা. বি.), পৃ. ১১২।

১০১ *তদেব*, পৃ. ১৫৩।

১০২ কৃষণচন্দ্র, *শিকাস্ত* (দিল্লী: মাতবুআ দিল্লী প্রিন্টিং রাকস, তা. বি.), পৃ. ২০৫।

১০৩ সালহা জারিন, *উর্দু নাবেল কা সমাজি অওর সিয়াসি মুতালি'আ* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ২১৬।

১০৪ কৃষণচন্দ্র, *শিকাস্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

১০৫ সাহিল বুখারি, *উর্দু নাবেল নিগারি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩।

১০৬ খলিলুর রহমান আজমী, *উর্দু মে তারাক্কি পছন্দ আদবী তাহরিক* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২০৯।

১০৭ ড. আসলাম আজাদ, *উর্দু নাবেল আজাদিকে বা'দ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯।

১০৮ সাহিল বুখারি, *উর্দু নাবেল নিগারি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫।

১০৯ হায়াত ইফতেখার এম. এ., *কৃষণচন্দ্র কে নাবেলোঁ মে তারাক্কি পছন্দি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০।

১১০ খলিলুর রহমান আজমী, *উর্দু মে তারাক্কি পছন্দ আদবী তাহরিক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪।

১১১ হায়াত ইফতেখার এম. এ., *কৃষণচন্দ্র কে নাবেলোঁ মে তারাক্কি পছন্দি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২।

১১২ কৃষণচন্দ্র, *তুফান কী কালিয়া* (বোম্বাই: বুক হাউস, ১৯৫০ খ্রি.), 'পেশ লফজ'

১১৩ হায়াত ইফতেখার এম. এ., *কৃষণচন্দ্র কে নাবেলোঁ মে তারাক্কি পছন্দি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

১১৪ *তদেব*

১১৫ *তদেব*, পৃ. ৬৯ ।

১১৬ *তদেব*, পৃ. ১২৩ ।

১১৭ কৃষণচন্দ্র, *গাদ্দার* (নয়াদিল্লীঃ আরালী পাবলিশার্স, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৫ ।

১১৮ https://www.mukaalma.com/90293/

১১৯ *তদেব*

১২০ কৃষণচন্দ্র, *গাদ্দার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪ ।

১২১ হায়াত ইফতেখার এম. এ., *কৃষণচন্দ্র কে নাবেলোঁ মে তারাক্কি পছন্দি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯ ।

১২২ কৃষণচন্দ্র, *এক আওরাত হাজার দিওয়ানে* (দিল্লীঃ সিরালা বিসুবী সাদি, ১৯৬০ খ্রি.), পৃ. ৩৭ ।

১২৩ *তদেব*, পৃ. ২০৩ ।

১২৪ সরদার জাফরী, *তারাক্কি পছন্দ আদব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১ ।

১২৫ হায়াত ইফতেখার, *কৃষণচন্দ্র কে নাবেলোঁ মে তারাক্কি পছন্দ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪ ।

১২৬ কৃষণচন্দ্র, *দিল কি দাদিয়া সোগায়ি* (নয়াদিল্লীঃ বিসুবি সাদী দরিয়াগঞ্জ, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৩ ।

১২৭ হায়াত ইফতেখার এম. এ., *কৃষণচন্দ্র কে নাবেলোঁ মে তারাক্কি পছন্দি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫ ।

১২৮ *তদেব*, পৃ. ৬৬ ।

১২৯ ড. মেহজাবিন, *কৃষণচন্দ্র কি নাবেল নিগারি অওর নিসায়ি কিরদার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩ ।

১৩০ *তদেব* ।

১৩১ *তদেব*, পৃ. ৯৮ ।

১৩২ *তদেব*, পৃ. ৯০ ।

১৩৩ জগদীশ চন্দ্র বিধাভান, *কৃষণচন্দ্র শাখছিয়্যাত অওর ফন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৯ ।

১৩৪ ড. মেহজাবিন, *কৃষণচন্দ্র কি নাবেল নিগারি অওর নিসায়ি কিরদার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪ ।

১৩৫ জগদীশ চন্দ্র বিধাভান, *কৃষণচন্দ্র শাখছিয়্যাত অওর ফন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২১ ।

১৩৬ *তদেব*, পৃ. ৪২২ ।

১৩৭ *তদেব*, পৃ. ৪২২ ।

১৩৮ ড. মেহজাবিন, *কৃষণচন্দ্র কি নাবেল নিগারি অওর নিসায়ি কিরদার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩ ।

১৩৯ *তদেব*, পৃ. ৯৪ ।

১৪০ *তদেব*, পৃ. ৯৫ ।

১৪১ *তদেব*, পৃ. ৯৬ ।

১৪২ ড. জগদীশচন্দ্র বিধাভান, *কৃষণচন্দ্র শাখছিয়্যাত অওর ফন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩১ ।

১৪৩ ড. মেহজাবিন, *কৃষণচন্দ্র কে নাবেল নিগারি অওর নিসায়ি কিরদার*, , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭ ।

১৪৪ *তদেব*

১৪৫ *তদেব*, পৃ. ৯৯ ।

১৪৬ জগদীশ বিধাভান, *কৃষণচন্দ্র শাখছিয়্যাত অওর ফন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩২-৬৩৩ ।

১৪৭ ড. মেহজাবিন, *কৃষণচন্দ্র কে নাবেল নিগারি অওর নিসায়ি কিরদার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১ ।

১৪৮ সাজ্জিদা খাতুন, *বিসুবি সাদী কে উর্দু মুসন্নেফীন* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ৩৬৫ ।

১৪৯ ড. আসলাম আজাদ, *উর্দু নাবেল আজাদি কে বা'দ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২ ।

১৫০ hamariweb.com/articles/72442

১৫১ আখতার অরণী, *শায়ের কৃষণচন্দ্র নাম্বার* (বোম্বেঃ কাসরুল আদব, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৩২১ ।

১৫২ আজীজ আহমেদ, *তারাক্কি পছন্দ আদব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১ ।

১৫৩ প্রেমপাল অশোক, *সরশার এক মুতালি'আ* (দিল্লীঃ আজাদ কিতাব ঘর, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৭২ ।

১৫৪ প্রেমপাল অশোক, *রতন নাথ সরশার হায়াত, শাখছিয়্যাত অওর কারনামে* (দিল্লীঃ তারাক্কি উর্দু ব্যুরো, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৯ ।

১৫৫ ড. সৈয়দ লতিফ হুসাইন, *রতন নাথ সরশার কি নাবেল নিগারি* (করাচীঃ আঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ৩৮ ।

১৫৬ প্রেমপাল অশোক, *সরশার এক মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪ ।

১৫৭ ড. সৈয়দ লতিফ হুসাইন, *রতন নাথ সরশার কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০ ।

১৫৮ প্রেমপাল অশোক, *সরশার এক মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪ ।

১৫৯ ড. সৈয়দ লতিফ হুসাইন, *রতন নাথ সরশার কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২ ।

১৬০ *তদেব*, পৃ. ১০৯ ।

১৬১ সৈয়দ সাফী মুরতাজী, *হামারে নসর নিগার* (লক্ষ্ণৌঃ নাসিম বুক ডিপো, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৪৬ ।

১৬২ রতন নাথ সরশার লক্ষ্ণৌবী, *ফাসানায়ে* আজাদ (নয়াদিল্লীঃ তারাক্কি উর্দু ব্যুরো, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৬৬ ।

১৬৩ ড. কমর রইস, *রতন নাথ সরশার* (নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৬১-৬২ ।

১৬৪ ওকার আজীম, *দাস্তান সে আফসানে তক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮ ।

১৬৫ http://www.punjnud.com/viewpage.aspx?Book ID=4423&BookpageID=113321& BookpageTitle=Fasana%20Azad

১৬৬ আলে আহমেদ সুরুর, *তানক্বীদী ইশারে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪ ।

১৬৭ প্রেমপাল অশোক, *সরশার এক মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭ ।

১৬৮ ছালহা জারিন, *উর্দু নাবেল কা সমাজি অওর সিয়াসি মুতালি'আ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২ ।

১৬৯ http://www.punjnud.com/viewpage.aspx?Book ID=4423&BookpageID=113321& BookpageTitle=Fasana%20Azad

১৭০ ড. কমর রইস, *রতন নাথ সরশার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০ ।

১৭১ *তদেব*, পৃ. ৪৮ ।

১৭২ রতন নাথ সরশার, *জামে সরশার* (করাচীঃ মাকতুবায়ে আসলুব, ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ১৫ ।

১৭৩ ড. সৈয়দ লতিফ হুসাইন, *রতন নাথ সরশার কি নাবেল নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪ ।

১৭৪ প্রেমপাল অশোক, *রতন নাথ সরশার হায়াত, শাখছিয়্যাত অওর কারনামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮-৫৯।

১৭৫ ড. কমর রইস, *রতন নাথ সরশার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০।

১৭৬ প্রেমপাল অশোক, *রতন নাথ সরশার হায়াত, শাখছিয়্যাত অওর কারনামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।

১৭৭ রতন নাথ সরশার, *সায়রে কোহসার*, ১ম খণ্ড (লক্ষ্মৌঃ মুন্সী নওল কিশোর, ১৯৩৪ খ্রি.), পৃ. ২৯৯।

১৭৮ ড. কমর রইস, *রতন নাথ সরশার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪।

১৭৯ প্রেমপাল অশোক, *রতন নাথ সরশার হায়াত, শাখছিয়্যাত অওর কারনামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।

১৮০ রতন নাথ সরশার, *কামিনী* (লক্ষ্মৌঃ নাসিম সাজটপো, তা. বি.), পৃ. ৭৫।

১৮১ *তদেব*, পৃ. ২৮।

১৮২ প্রেমপাল অশোক, *রতন নাথ সরশার হায়াত, শাখছিয়্যাত অওর কারনামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ .৬৫-৬৬।

১৮৩ রতন নাথ সরশার, *তুফান বেতামিযি*, ১ম খণ্ড (লক্ষ্মৌঃ মাতবুয়া শাম আউধ, তা. বি.), পৃ. ১০২।

১৮৪ প্রেমপাল অশোক, *রতন নাথ সরশার হায়াত, শাখছিয়্যাত অওর কারনামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬১।

১৮৫ *তদেব*, পৃ. ৬১-৬২।

১৮৬ *তদেব*, পৃ. ৬২-৬৩।

১৮৭ *তদেব*, পৃ. ৭১।

১৮৮ *তদেব*, পৃ. ৭৪।

১৮৯ ওয়ারেশ আলবী, *রাজেন্দ্র সিং বেদি* (দিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ৭।

১৯০ *তদেব*।

১৯১ *তদেব*।

১৯২ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কি তারিখ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮।

১৯৩ প্রফেসর ওহাব আশরাফী, *রাজেন্দ্র সিং বেদি কি আফসানা নিগারি* (দিল্লীঃ এডুকেশনাল পাবলিসিং হাউস, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ২৯।

১৯৪ *তদেব*, পৃ. ৩৯।

১৯৫ ওয়ারেশ আলবী, *রাজেন্দ্র সিং বেদি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।

১৯৬ *তদেব*।

১৯৭ *তদেব*, পৃ. ৬৮।

১৯৮ গীয়ানচাঁদ, *উপেন্দ্র নাথ অশোক* (দিল্লীঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০ খ্রি.), পৃ. ৯।

১৯৯ *তদেব*, পৃ. ২২।

২০০ গুরবচন চন্দন, *জমনা দাস আখতার শাখছিয়্যাত অওর আদবী ও সাহাফতি খেদমত* (দিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৪৬।

২০১ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার* (শ্রীনগরঃ মীজান পাবলিশার্স এণ্ড ডিসট্রিবিউটার্স, ২০১৭ খ্রি.), পৃ. ৭২।

২০২ গুববচন চন্দন, *জমনা দাস আখতার শাখছিয়্যাত অওর আদবী ও সাহাফতি খেদমত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১-১৫২ ।।
২০৩ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *বালুনাত সিং কে বেহতেরিন আফসানে* (দিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৭২ ।
২০৪ *তদেব*, পৃ. ৭৪ ।
২০৫ ইমাম মর্তুজা নাকবী, *উর্দু আদব মে শিখোঁ কা হিস্‌সা* (দিল্লীঃ কোহিনুর প্রেস, ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ১৯৬ ।
২০৬ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৭ ।
২০৭ কৃষণ গোপাল আবিদ, *বুন্দ অওর সমুন্দর* (দিল্লীঃ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ২ ।
২০৮ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার* (কাশ্মিরঃ মিজান পাবলিশার্স, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৪৭ ।
২০৯ Urdulinks.com/Urj/?P=3263
২১০ *তদেব* ।
২১১ নাসিম আরা, *উর্দু মুখতাছার আফসানে কা ইর্তেকা* (এলাহাবাদঃ তাজ অফসেট প্রেস, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ১৯৮ ।
২১২ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯ ।
২১৩ Urdulinks.com/Urj/?P=3263
২১৪ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬ ।
২১৫ Urdulinks.com/Urj/?P=3263
২১৬ রমানন্দ সাগর, *অওর ইনসান মর গিয়া* (বোম্বেঃ নো হিন্দ পাবলিশার্স লিমিডেট, ১৯৪৮ খ্রি.), পৃ. ২৫ ।
২১৭ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা* (দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২০৩-২০৪ ।
২১৮ Urdulinks.com/Urj/?P=3263
২১৯ *তদেব* ।
২২০ নুরশাহ, *জম্মু কশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯ ।
২২১ *তদেব*, পৃ. ১০৩ ।
২২২ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু* (শ্রীনগরঃ জম্মু ইন্ড কাশ্মির একাডেমি, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২০২
২২৩ Urdulinks.com/Urj/?P=3263
২২৪ *তদেব* ।
২২৫ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১ ।
২২৬ Urdulinks.com/Urj/?P=3263
২২৭ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬ ।
২২৮ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩-১১৪ ।
২২৯ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯ ।
২৩০ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১ ।
২৩১ *তদেব*, পৃ. ২৪৪-২৪৫ ।

২৩২ *তদেব*, পৃ. ১৪৬-১৪৮।

২৩৩ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০৩।

২৩৪ মাজহার সেলিম, *সুরেন্দর প্রকাশ শাখছিয়্যাত অওর ফন* (মুম্বাই: তাকমিল পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৯০-৯৪।

২৩৫ *তদেব*, পৃ. ২৫৫।

২৩৬ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭।

২৩৭ *তদেব*, পৃ. ৬০।

২৩৮ ড. জগদীশ মেহতা দরদ, *উর্দু কে নান মুসলিম শু'আরা ও আদীব* (নয়াদিল্লী: হাকীকত বিয়ানী পাবলিশার্স, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ২৬৩।

২৩৯ দিলীপসিং, *দিল দরিয়া* (নয়াদিল্লী: শানে হিন্দ পাবলিকেশন্স, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৯।

২৪০ হারুন বি এ. *বিবাক: গুলশান খান্না নাম্বার ০৫৯* (আগ্রা: সাব্বির সাতীর কম্পাউন্ড, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ১৪।

২৪১ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫।

২৪২ সৈয়দ জামির জাফরী, *চাহার সো: অনিল ঠাকুর নাম্বার ২০* (রাওয়ালপিন্ডি: ফয়জুল ইসলাম প্রিন্টিং প্রেস, ২০১১ খ্রি.), পৃ. ৪।

২৪৩ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

২৪৪ জতীন্দ্র বিল্লু, *বিশ্বাসঘাত* (মুম্বাই: কলম পাবলিকেশন্স, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৭।

২৪৫ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫০।

২৪৬ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫।

২৪৭ *তদেব*, পৃ. ২৯-৩০।

২৪৮ সাজ্জিদা খাতুন, *বিসুবি সাদী কে উর্দু মুসন্নেফীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।

২৪৯ মীর্জা জাফর হুসেইন, *বিসুবি সাদী কে বা'জ লাক্ষৌবী আদীব* (লক্ষৌ: উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমি, ১৯৭৮ খ্রি.), পৃ. ২৬১।

২৫০ সেলিম হামিদ রিজভী, *উর্দু আদব কী তারাক্কি মে ভুপাল কা হিস্সা* (ভুপাল: বাবুল ইলম পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪১২-৪১৩।

২৫১ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১০।

২৫২ *তদেব*, পৃ. ৬২৫।

২৫৩ জহীর আফাক, *রাম লাল কী আফসানা নিগারী* (নয়াদিল্লী: শানে হিন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১০২।

২৫৪ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৯।

২৫৫ আবু জহীর রুবানী, *জোগিন্দর পাল কি আফসানা নিগারি* (দিল্লী: এডুকেশনাল পাবলিসিং হাউস, ২০১৫ খ্রি.), পৃ. ২৫।

২৫৬ *তদেব*, পৃ. ৫৪।

২৫৭ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১২২।

২৫৮ রতন সিং, *চাহার সো নাম্বার-১৯* (রাওয়ালপিন্ডি: ফজল ইসলাম প্রিন্ট, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৫ ।

২৫৯ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮ ।

২৬০ *তদেব*, পৃ. ২৫৭ ।

২৬১ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৯ ।

২৬২ *তদেব*, পৃ. ৮০ ।

২৬৩ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮ ।

২৬৪ নন্দ কিশোর বিক্রম, *হানস রাজ রাহবার কে আফসানে* (দিল্লীঃ সঞ্জু অফসেট প্রিন্টিংস, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২২ ।

২৬৫ *তদেব*, পৃ. ২৬ ।

২৬৬ Urdulinks.com/Urj/?P=3263

২৬৭ *তদেব* ।

২৬৮ ড. মোহাম্মদ শাহেদ হুসাইন, *ড্রামা ফন অওর রেওয়ায়াত* (দিল্লীঃ এডুকেশনাল পাবলিসিং হাউস, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ১০-১১ ।

২৬৯ www.sheroadab.org/20/8/4/07/blog-past-19. html.

২৭০ ড. শাহনাজ সাবেহ, *উর্দু ড্রামা আজাদি কে বা'দ* (লক্ষ্মৌঃ নসরত পাবলিশার্স, হায়দারী মার্কেট আমিন আবাদ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১ ।

২৭১ ড. মুহাম্মদ শাহেদ হুসাইন, *ড্রামা ফন অওর রেওয়ায়াত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০ ।

২৭২ *তদেব*, পৃ. ৯ ।

২৭৩ ড. শাহনাজ সাবেহ, *উর্দু ড্রামা আজাদি কে বা'দ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪ ।

২৭৪ *তদেব*, পৃ. ৫ ।

২৭৫ ড. মুহাম্মদ শাহেদ হুসাইন, *ড্রামা ফন অওর রেওয়ায়াত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০ ।

২৭৬ ড. শাহনাজ সাবেহ, *উর্দু ড্রামা আজাদি কে বা'দ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১ ।

২৭৭ *তদেব* ।

২৭৮ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯ ।

২৭৯ ড. কমর রইস, *মুন্সী প্রেমচাঁদ শাখছিয়্যাত অওর কারনামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩-৩১৪ ।

২৮০ *তদেব*, পৃ. ৩১৪ ।

২৮১ *তদেব*, পৃ. ৩১৯ ।

২৮২ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯ ।

২৮৩ *তদেব* ।

২৮৪ ড. কমর রইস, *মুন্সী প্রেমচাঁদ শাখছিয়্যাত অওর কারনামে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৩ ।

২৮৫ ড. শাহনাজ সাবেহ, *উর্দু ড্রামা আজাদি কে বা'দ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩ ।

২৮৬ খলীলুর রহমান আজমি, *উর্দু মে তারাক্কি পছন্দ আদবী তাহরিক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭ ।

২৮৭ ড. জহুর উদ্দীন, *হাকিকত নিগারি অওর উর্দু ড্রামা* (দিল্লীঃ সীমানাত প্রকাশন, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ২২০ ।

২৮৮ *তদেব*, পৃ. ২২১ ।

২৮৯ *তদেব*, পৃ. ২৩৩ ।

২৯০ *তদেব*, পৃ. ২৪১ ।

২৯১ *তদেব*, পৃ. ২৫৬-২৬৬ ।

২৯২ ড. শাহনাজ সাবেহ, *উর্দু ড্রামা আজাদি কে বা'দ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২ ।

২৯৩ উপেন্দ্র নাথ অশোক, *পাপী* (লাহোর: মাকতুবায়ে উর্দু, তা. বি.), পৃ. ৪ ।

২৯৪ ড. শাহনাজ সাবেহ, *উর্দু ড্রামা আজাদি কে বা'দ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২ ।

২৯৫ উপেন্দ্র নাথ অশোক, *চরোয়াহে* (লাহোর: মাকতুবায়ে উর্দু, তা. বি.), পৃ. ৫ ।

২৯৬ গীয়নাচাঁদ, *উপেন্দ্র নাথ অশোক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩ ।

২৯৭ ড. শাহনাজ সাবেহ, *উর্দু ড্রামা আজাদি কে বা'দ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২ ।

২৯৮ গীয়ানচাঁদ, *উপেন্দ্র নাথ অশোক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪ ।

২৯৯ ড. শাহনাজ সাবেহ, *উর্দু ড্রামা আজাদি কে বাদ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩ ।

৩০০ *তদেব*, পৃ. ৪৩ ।

৩০১ উপেন্দ্র নাথ অশোক, *তোলিয়ে* (এলাহাবাদ: নয়া ইদারা, ১৯৭৯ খ্রি.), পৃ. ৪ ।

৩০২ ড. শাহনাজ সাবেহ, *উর্দু ড্রামা আজাদি কে বা'দ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩ ।

৩০৩ উপেন্দ্র নাথ অশোক, *পড়োসন কা কোট* (এলাহাবাদ: নয়া ইদারা, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৫ ।

৩০৪ রাজেন্দ্র সিং বেদি, *সাত খেল* (নয়াদিল্লী: মাকতুবায়ে লিমিটেড, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ৫ ।

৩০৫ রাজেন্দ্র সিং বেদি, *বেজান চীজেঁ* (লাহোর: পাঁচদরিয়া নিসবত রোড, ১৯৪৩ খ্রি.), পৃ. ৪ ।

৩০৬ ইমাম মর্তুজা নাকবী, *উর্দু আদব মে শিখোঁ কা হিস্‌সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬ ।

৩০৭ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১২ ।

৩০৮ সাজ্জিদা খাতুন, *বিসুবি সাদী কে উর্দু মুসন্নেফীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪ ।

৩০৯ মীর্জা জাফর হুসেইন, *বিসুবী সাদী কে বা'জ লক্ষ্ণৌবী আদীব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬১ ।

৩১০ নাসিম আরা, *উর্দু মুখতাছার আফসানে কা ইর্তেকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১ ।

৩১১ সেলিম হামিদ রিজভী, *উর্দু আদব কী তারাক্কি মে ভুপাল কা হিস্‌সা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১২ ।

৩১২ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫ ।

৩১৩ *তদেব*, পৃ. ৭৫ ।

৩১৪ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৫ ।

৩১৫ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৭ ।

৩১৬ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯ ।

৩১৭ *তদেব* ,পৃ. ২৫৬-২৫৭ ।

৩১৮ নুর আহমেদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা* (করাচী: ইদারায়ে ফিকরে নো, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৪৯৫ ।

৩১৯ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৯-৪৪০ ।

৩২০ *তদেব*, পৃ. ১৪৩-৪৪ ।

৩২১ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮ ।

৩২২ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১ ।

৩২৩ *তদেব*, পৃ. ১৭৪-১৭৫ ।

৩২৪ দিলীপ সিং, *মোম কী গুড়িয়া* (নয়াদিল্লীঃ শানে হিন্দ পাবলিকেশন্স, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৯-২০ ।

৩২৫ সৈয়দ জামির জাফরী, *চাহার সোঃ অনিল ঠাকুর নাম্বার ২০*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪ ।

৩২৬ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু* ,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৫ ।

৩২৭ *তদেব*, পৃ. ২৫৪ ।

৩২৮ ড. শাবাব ললিত, *কলম কারিশ্মো* (নয়াদিল্লীঃ মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৮৫ ।

৩২৯ *তদেব*, পৃ. ১৯০ ।

৩৩০ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৬-২৬৭ ।

৩৩১ ড. ফেরদোসী ফাতেমা নাসির, *মুখতাছার আফসানা কা ফন্নী তাজজিয়া* (দিল্লীঃ আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, ১৯৭৫ খ্রি.) পৃ. ১৮ ।

৩৩২ অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথা সাহিত্যে শওকত ওসমান* (রাজশাহীঃ ইউরেকা বুক হাউস, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৭-৮ ।

৩৩৩ ড. সগির আফরাহিম, *উর্দু আফসানা তারাক্কি পছন্দ তাহরিক সে ক্বাবল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫ ।

৩৩৪ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প* (কলিকাতাঃ ডি.এম লাইব্রেরী, ১৩৭৪ বাং.), পৃ. ৩০৮-৩০৯ ।

৩৩৫ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫ ।

৩৩৬ William Henry Hudson, *A Introduction truth study of Literature* (london: Grorge G. Harrapand, Co. Ltd. 1949), p. 236.

৩৩৭ ড. ফেরদৌসি ফাতেমা নাসির, *মুখতাছার আফসানা কা ফন্নী তাজজিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭ ।

৩৩৮ প্রফেসর ইবনে কানুল, *উর্দু আফসানা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩ ।

৩৩৯ আজিমুল হক জুনায়দী, *উর্দু আদব কি তারিখ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫ ।

৩৪০ Urdunotes, com/lesson/munshi-premchand-ki-afsana-nigari-in Urdu.

৩৪১ প্রফেসর ইবনে কানুল, *উর্দু আফসানা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬ ।

৩৪২ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু*,, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯-২৫০ ।

৩৪৩ ড. আসলাম জমশেদপুরী, *উর্দু আফসানা তা'বিদ ও তানক্বিদ* (নয়াদিল্লীঃ মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৪৪ ।

৩৪৪ *তদেব*, পৃ. ৪১ ।

৩৪৫ প্রফেসর গোপীচাঁদ নারায়ণ, *উর্দু আফসানা রেওয়ায়াত অওর মাসায়েল* (দিল্লীঃ এডুকেশনাল পাবলিসিং হাউস, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৪৫ ।

৩৪৬ *তদেব*, পৃ. ১৪৫ ।

৩৪৭ ড. নিগহাত রেহানা খান, *উর্দু মুখতাছার আফসানা: ফন্নী ও তেকনিকী মুতালি'আ* (দিল্লী: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৬ খ্রি.), পৃ. ৬৫।

৩৪৮ প্রেমচাঁদ, *ইন্তেখাবে আফসানা* (লক্ষ্মৌ: উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমি, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ১৬।

৩৪৯ প্রেম গোপাল মিত্তল, *প্রেমচাঁদ কে সো আফসানে* (নয়াদিল্লী: মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৭০৩।

৩৫০ *তদেব*, পৃ. ৭০৩।

৩৫১ *তদেব*, পৃ. ৭৯।

৩৫২ প্রেমচাঁদ, *ইন্তেখাবে আফসানা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

৩৫৩ *তদেব*, পৃ. ৯।

৩৫৪ *তদেব*, পৃ. ১১।

৩৫৫ প্রেম গোপাল মিত্তল, *প্রেমচাঁদ কে সো আফসানে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৭।

৩৫৬ *তদেব*, পৃ. ৫১১।

৩৫৭ *তদেব*, পৃ. ২১৯।

৩৫৮ *তদেব*, পৃ. ২২৬।

৩৫৯ *তদেব*, পৃ. ২২৭।

৩৬০ *তদেব*, পৃ. ২২৭।

৩৬১ ড. জহির আলী সিদ্দিকী, *আফসানে কে মি'মার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৩৬২ *তদেব*, পৃ. ৩০।

৩৬৩ প্রেমচাঁদ, *সুজ ওয়াতন* (এলাহাবাদ: তাহজীব নো পাবলিকেশনার, পৃ. ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৩১।

৩৬৪ ড. জহির আলী সিদ্দিকী, *আফসানে কে মি'মার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

৩৬৫ *তদেব*, পৃ. ৩০।

৩৬৬ প্রেমচাঁদ, *সুজ ওয়াতন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৩৬৭ ড. জহির আলী সিদ্দিকী, *আফসানে কে মি'মার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৩৬৮ *প্রেমচাঁদ*, *সুজ ওয়াতন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৩৬৯ ড. ওয়াজেদ কোরেশী, *প্রেমচাঁদ কে আফসানোঁ মে হাকীকত কা আমল* (নয়াদিল্লী: মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৯২।

৩৭০ ড. জহির আলী সিদ্দিকী, *আফসানে কে মি'মার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬-৪৭।

৩৭১ *তদেব*, পৃ. ৪৭।

৩৭২ ড. আসলাম জমশেদপুরী, *উর্দু আফসানা তা'বীর ও তানক্বিদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৩৭৩ ড. মো: রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭।

৩৭৪ প্রফেসর ইবনে কানুল, *উর্দু আফসানা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৩৭৫ *তদেব*, পৃ. ২২।

৩৭৬ ড. সাদিক, *তারাক্কি পছন্দ তাহরিক অওর উর্দু আফসানা* (দিল্লী: উর্দু মজলিস, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৩৪।

৩৭৭ dawnnews. tv/news/1053525.

৩৭৮ প্রফেসর গোপীচাঁদ নারায়ণ, *উর্দু আফসানা রেওয়ায়াত অওর মাসায়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৮।

৩৭৯ ফারজানা শাহীন, *উর্দু কে নুমায়েন্দাহ আফসানা নিগার* (কলকাতা: ডায়মন্ড আর্ট প্রেস, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ৫৯।

৩৮০ ড. শফিক আজমি, *কৃষণচন্দ্র কি আফসানা নিগারি* (গোরাখপুর: ইনসিয়েট প্রেস, ১৯৯০ খ্রি.), পৃ. ৯২।

৩৮১ *তদেব*, পৃ. ৯১।

৩৮২ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬।

৩৮৩ WWW.qaumiawaz.com/literature/rad-story-Jamun-ka-ped-which-is-now-excluded-from-icse-syllabus

৩৮৪ শাহজাদ মানজার, *কৃষণচন্দ্র কে দাস বেহতেরিন আফসানে* (দিল্লী: বুক কর্পোরেশন, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৩৬।

৩৮৫ *তদেব*, পৃ. ১৪০।

৩৮৬ কৃষণচন্দ্র, *হাম ওহাশী হ্যায়* (বোম্বে: কানব পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৯ খ্রি.), পৃ. ৪১।

৩৮৭ *তদেব*, পৃ. ৪৪।

৩৮৮ কৃষণচন্দ্র, *উলঝী লাড়কি কালে বাল* (হায়দ্রাবাদ: আদবী টেস্টবুক ডিপো, ১৯৭০ খ্রি.), পৃ. ১৪৭।

৩৮৯ *তদেব*, পৃ. ১৫৭।

৩৯০ কৃষণচন্দ্র, *তালসিম খেয়াল* (দিল্লী: আরাভেলী পাবলিশার্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৯৩।

৩৯১ ড. শফীক আজমি, *কৃষণচন্দ্র কি আফসানা নিগারি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২।

৩৯২ ড. জহির আলী সিদ্দিকী, *আফসানে কে মি'মার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩।

৩৯৩ কৃষণচন্দ্র, *আনদাতা* (দিল্লী: এশিয়া পাবলিশার্স, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫৩।

৩৯৪ আলে আহমেদ সরুর, *তানক্বীদী ইশারে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

৩৯৫ কৃষণচন্দ্র, *নজারে* (লাহোর: কুতুবখানা আদবী দুনিয়া, ১৯৪০ খ্রি.), পৃ. ৩৭।

৩৯৬ ড. আসলাম জমশেদপুরী, *তারাক্কি পছন্দ উর্দু আফসানা অওর চান্দ আহাম আফসানা নিগার* (দিল্লী: মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ৭৫।

৩৯৭ কৃষণচন্দ্র, *হাম ওহাশী হ্যায়*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

৩৯৮ *তদেব*, পৃ. ১০০।

৩৯৯ কৃষণচন্দ্র, *তালসিম খেয়াল*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

৪০০ *তদেব* পৃ. ৩৭।

৪০১ কৃষণচন্দ্র, *জিন্দেগী কে মোড় পর* (দিল্লী: এশিয়া পাবলিশার্স, ১৯৭৫ খ্রি.), পৃ. ৫।

৪০২ সাজ্জিদা খাতুন, *বিসুবি সাদী কে উর্দু মুসন্নেফীন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬।

৪০৩ ওকার আজীম, *নয়া আফসানা* (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৯০।

৪০৪ ড. জহির আলী সিদ্দিকী, *আফসানে কে মি'মার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮।

৪০৫ *তদেব*, পৃ. ৬৮।

৪০৬ ড. মোহাম্মদ হুসেন, *কৃষণচন্দ্র নাম্বার শায়ের শুমারা* ৩-৪ (বোম্বে: কাসরুল আদব, ১৯৭৭ খ্রি.), পৃ. ৩৫।

৪০৭ মুহাম্মদ হুসাইন আসকরী, *কৃষণচন্দ্র নাম্বার শায়ের শুমারা* ৩-৪ (বোম্বে: কাসরুল আদব, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ৪০৭-৪০৮।

৪০৮ http://urdufiction.com/mazamin.detail?zid=OTM=

৪০৯ ড. জহির সিদ্দিকী, *আফসানে কে মি'মার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

৪১০ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫-২৬৬।

৪১১ প্রফেসর ইবনে কানুল, *উর্দু আফসানা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

৪১২ রাজেন্দ্র সিং বেদি, *আপনে দুখ মুঝে দে দো* (নয়াদিল্লী: মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ৮।

৪১৩ Urdulinks.com/Urj//?p=1768.

৪১৪ রাজেন্দ্র সিং বেদি, *আপনে দুখ মুঝে দে দো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬।

৪১৫ রাজেন্দ্র সিং বেদি, *গ্রহণ* (লাহোর: মাকতুবায়ে উর্দু, তা.বি.) পৃ. ১৫-১৬।

৪১৬ *তদেব*, পৃ. ১০।

৪১৭ *তদেব*, পৃ. ১৬৩।

৪১৮ নাসিম আরা, *উর্দু মুখতাছার আফসানে কা ইর্তেকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৩।

৪১৯ ওকার আজীম, *নয়া আফসানা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

৪২০ *তদেব* পৃ. ১০৩।

৪২১ আকবর উদ্দিন সিদ্দিকী, *প্রেমচাঁদ অওর উন কি আফসানা নিগারি* (হায়দ্রাবাদ: আঞ্জুমানে তিলসানীন উসমানীয়াবাগ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১০২।

৪২২ গীয়ানচাঁদ, *উপেন্দ্র নাথ অশোক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২।

৪২৩ নাসিম আরা, *মুখতাছার আফসানে কা ইর্তেকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

৪২৪ হামিদুল্লাহ নাদবী, *উর্দু কে চান্দ নামওয়ার আদীব অওর শায়ের* (দিল্লী: মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ১৯৪।

৪২৫ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩।

৪২৬ মীর্জা হামিদ বেগ, *শায়ের কে হাম আছর উর্দু আদব নাম্বার* (৯৭-৯৮) (আলীগড়: এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৭৬ খ্রি.), পৃ. ৫৭৩।

৪২৭ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানে নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

৪২৮ ব্রজ প্রেমী, *কাশ্মির কে মাজামিন* (কাশ্মির: দ্বীপ পাবলিশার্স, ১৯৮৯ খ্রি.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

৪২৯ নন্দ কিশোর বিক্রম, *হানস রাজ রাহবার কে আফসানে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬।

৪৩০ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬।

৪৩১ ভারতচাঁদ খান্না, *তেরে নিমকাশ* (হায়দ্রাবাদ: জিন্দা দেলানে, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ১০।

৪৩২ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।

৪৩৩ ব্রজ প্রেমী, *কাশ্মীর কে মাজামিন* , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১।

৪৩৪ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬।

৪৩৫ ব্রজ প্রেমী, *কাশ্মির কে মাজামিন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০ ।

৪৩৬ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৭০ ।

৪৩৭ শামশীর সিং নিরোলা, *জালে* (দিল্লীঃ বারকী প্রেস, তা.বি.), পৃ. ৮-৯ ।

৪৩৮ গুরুবচন চন্দন, *জমনা দাস আখতার শাখছিয়্যাত অওর আদবী সাহাফতি খেদমত* , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১-১৫২ ।

৪৩৯ নাসিম আরা, *উর্দু মুখতাছার আফসানে কা ইর্তেকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯ ।

৪৪০ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬ ।

৪৪১ *তদেব*, পৃ. ৮৭ ।

৪৪২ নুর আহমেদ মেরীঠী, *বাহার যমা বাহার যবা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬২ ।

৪৪৩ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *উর্দু কে হিন্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৪ ।

৪৪৪ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪ ।

৪৪৫ *তদেব*, পৃ. ৯৫ ।

৪৪৬ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৯ ।

৪৪৭ বিলরাজ বার্মা, *ইয়াদোঁ কে ঝারোকে* (দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, তা.বি.), পৃ. ২৭-২৮ ।

৪৪৮ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫-১৭৬ ।

৪৪৯ প্রফেসর সুগরা মেহদি, *উর্দু আদব মে দিল্লী কী খাতুন কা হিস্‌সা* (দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৮০ ।

৪৫০ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৫ ।

৪৫১ *তদেব*, পৃ. ৪৬৪ ।

৪৫২ মানিক টালা, *গুনাহ কা রেস্তা* (আলীগড়ঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৭৪ খ্রি.), পৃ. ৪ ।

৪৫৩ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬৪ ।

৪৫৪ *তদেব*, পৃ. ২০৭ ।

৪৫৫ জাফর পিয়ামী, *শায়ের কে হাম আছর উর্দু আদব নাম্বার ৯৭-৯৮*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৬ ।

৪৫৬ এম এম রাজেন্দ্র, *শায়ের কে হাম আছর উর্দু আদব নাম্বার ৯৭-৯৮*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪৭ ।

৪৫৭ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩-১৩৪ ।

৪৫৮ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০ ।

৪৫৯ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭-১৬৮ ।

৪৬০ আজীম আখতার, *বিসুবি সাদী কে শু'আরায়ে দিল্লী*, ২য় খণ্ড (দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, তা.বি.), পৃ. ১২৪৩-১২৪৪ ।

৪৬১ ড. জগদীশ মেহতা দরদ, *উর্দু কে নান মুসলিম শু'আরা ও আদীব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০ ।

৪৬২ ড. শাবাব ললিত, *কলম কারিশ্মো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪ ।

৪৬৩ *তদেব*, পৃ. ১৮৫ ।

৪৬৪ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪ ।

৪৬৫ *তদেব*, পৃ. ১৩৫-১৩৬ ।

৪৬৬ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২।

৪৬৭ *তদেব*, পৃ. ১৩৫।

৪৬৮ ড. শাবাব ললিত, *কলম কারিশ্মো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২।

৪৬৯ *তদেব*, পৃ. ১৭৩।

৪৭০ অমর সিং, *তৈয়ারি* (দিল্লী: মাকতুবায়ে জামিয়া লিডিটেড, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৩।

৪৭১ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩-১৪৪।

৪৭২ *তদেব*, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

৪৭৩ *তদেব*, পৃ. ১৪৬।

৪৭৪ মাজহার সেলিম, *সুরেন্দর প্রকাশ: শাখছিয়্যাত অওর ফন*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।

৪৭৫ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫-১৬৬।

৪৭৬ সাবিত্রী গোস্বামী, *দরদ কে ফাসলে* (পুনে: আসবাক পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৯-১৪।

৪৭৭ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১।

৪৭৮ নরেন্দ্রনাথ সুজ, *আফক কে উস পর* (নয়াদিল্লী: আনিস অফসেট প্রিন্টার্স, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৯।

৪৭৯ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৩।

৪৮০ প্রফেসর আব্দুর কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।

৪৮১ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬-১৭৭।

৪৮২ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০-১৯১।

৪৮৩ সরোয়ারুল হুদা, বিলরাজ *মিনরা কা এক না তামাম সফর* (দিল্লী: আরশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খ্রি.), পৃ. ৯৫।

৪৮৪ *তদেব*, পৃ. ৮৩।

৪৮৫ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১-১৯২।

৪৮৬ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৪০।

৪৮৭ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।

৪৮৮ আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮।

৪৮৯ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

৪৯০ ড. জগদীশ মেহতা দরদ, *উর্দু কে নান মুসলিম শু'আরা ও আদীব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬।

৪৯১ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১-২০২।

৪৯২ *তদেব*, পৃ. ২০৩-২০৪।

৪৯৩ দিপক বাদকি, *কেদারনাথ শর্মা কে সিধি সাদি কাহানিয়াঁ আসরি শু'য়ুর* (শ্রীনগর: মিজান পাবলিশার্স, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ৫১।

৪৯৪ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪।

৪৯৫ *তদেব*,পৃ. ৯৪-৯৫।

৪৯৬ ড. শাবাব ললিত, *কলম কারিশ্মো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১।

৪৯৭ *তদেব*, পৃ. ১৮২।

৪৯৮ বিজয় সুরী, *এক নাও কাগজ কি* (নায়াদিল্লীঃ অজয় পাবলিশার্স, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ. ১০।

৪৯৯ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯।

৫০০ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২২।

৫০১ নুর শাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৬।

৫০২ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২১।

৫০৩ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬-২২৭।

৫০৪ *তদেব*, পৃ. ২২৮-২২৯।

৫০৫ ড. শাবাব ললিত, *কলম কারিশ্মো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫।

৫০৬ *তদেব*।

৫০৭ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৪।

৫০৮ বিলরাজ বখশ, *এক বুন্দ জিন্দেগী* (জম্মু ও কাশ্মিরঃ আওশীন পাবলিসিং হাউস, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ২৫।

৫০৯ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬।

৫১০ *তদেব*, পৃ. ১৪৬।

৫১১ ড. কমর রইস, *বারক বারক* (শ্রীনগরঃ মিজান পাবলিশার্স, ২০০৯ খ্রি.), পৃ. ২২৯।

৫১২ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯।

৫১৩ *তদেব*, পৃ. ২৪০-২৪১।

৫১৪ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১।

৫১৫ ড. শাবাব ললিত, *কলম কারিশ্মো*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৭।

৫১৬ *তদেব*, পৃ. ১৮৭।

৫১৭ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *বালুনাত সিং কে বেহতেরিন আফসানে*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

৫১৮ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮।

৫১৯ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭।

৫২০ জহীর আফাক, *রামলাল কী আফসানা নিগারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১।

৫২১ প্রফেসর গিয়ান চাঁদ, *রামলাল মেরী নজর মে* (লক্ষ্মৌঃ মাহনামা নয়া দুর, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ১৫।

৫২২ জহীর আফাক, *রামলাল কী আফসানা নিগারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১-১০২।

৫২৩ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫৯।

৫২৪ *তদেব*, পৃ. ২০১।

৫২৫ আবু জহীর রুবানী, *জোগিন্দর পাল কি আফসানা নিগারী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯-৫৪।

৫২৬ নাসিম আরা, *উর্দু মুখতাছার আফসানে কা ইর্তেকা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭০।

৫২৭ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

৫২৮ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩২।

৫২৯ *তদেব*, পৃ. ১৩৫।

৫৩০ *তদেব*, পৃ. ১৪৮।

৫৩১ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০৪।

৫৩২ ইমারান কোরেশী, *বাংগাল মে উর্দু আফসানা আগাজ তা হাল*, ১ম খণ্ড (আসানসোল: তানবীর বুকডিপো, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৫৩।
৫৩৩ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭।
৫৩৪ *তদেব*, পৃ. ৬০।
৫৩৫ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০।
৫৩৬ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩২-৪৩৩।
৫৩৭ দিলীপ সিং, *গোশে মে কফস কে* (নয়াদিল্লী: নয়ী আওয়াজ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫।
৫৩৮ হরুন বি.এ., *বিবাক: গুলশান খান্না নাম্বার ০৫৯*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪।
৫৩৯ প্রফেসর আব্দুল কাদের সরোরী, *কাশ্মির মে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮।
৫৪০ সৈয়দ জামির জাফরী, *চাহার সো: অনিল ঠাকুর নাম্বার ২০*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।
৫৪১ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬।
৫৪২ গোপীচাঁদ নারায়ণ, *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫০।
৫৪৩ নুরশাহ, *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪।
৫৪৪ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫।
৫৪৫ bn.wikipedia.org/wiki/প্রবন্ধ
৫৪৬ britannica.com/art/essay
৫৪৭ ফাহিম উদ্দিন নুরী, *ফনে মাজমুন নিগারি* (দিল্লী: আল ইমান বুকডিপো, তা. বি.), পৃ. ৪।
৫৪৮ আল্লামা আখলাক দেহলবী, *মাজমুন নিগারি* (দিল্লী: আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, ১৯৬৮ খ্রি.), পৃ. ২০৬।
৫৪৯ দিপক বাদকি, *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।
৫৫০ *তদেব*, পৃ. ৫২-৫৩।
৫৫১ *তদেব*, পৃ. ১৫৬।
৫৫২ ড. সৈয়দ ইজাজ হুসাইন, *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪।
৫৫৩ bn.wikipedia.org/wiki/সংবাদ
৫৫৪ bn.wikipedia.rog/wiki/journalism
৫৫৫ ড. সৈয়দ আহমদ কাদরী, *উর্দু সাহাফত বিহার মে* (বিহার: মাকতুবায়ে গোশীয়া, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ১৩।
৫৫৬ আব্দুস সালাম খোরশেদ, *ফনে সাহাফত* (করাচী: আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, ১৯৬৪ খ্রি.), পৃ. ৯।
৫৫৭ নূরুল ইসলাম নদোবী, *রেহনুমায়ে সাহাফাত* (পাটনা: প্রিন্ট মিডিয়া, ২০১২ খ্রি.), পৃ. ৪৮।
৫৫৮ আনওয়ার আলী দেহলবী, *উর্দু সাহাফাত* (দিল্লী: উর্দু একাডেমি, ২০০০ খ্রি.), পৃ. ৯৫।
৫৫৯ *তদেব*, পৃ. ৯৬।
৫৬০ *তদেব*, পৃ. ৯৭-৯৮।
৫৬১ শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্য, *বাঙ্গাল মে উর্দু সাহাফাত কী তারিখ* (কলকাতা: মাগরেবি বাঙ্গাল উর্দু একাডেমি, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩০১-৩০২।
৫৬২ ড. আফজাল মাসবাহী, *উর্দু সাহাফাত আজাদি কে বা'দ* (দিল্লী: আরশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ২০৭।
৫৬৩ *তদেব*, পৃ. ২০৭-২০৮।
৫৬৪ আনওয়ার আলী দেহলবী, *উর্দু সাহাফাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১১।
৫৬৫ ড. আফজাল মাসবাহী, *উর্দু সাহাফাত আজাদি কে বা'দ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯।
৫৬৬ আনওয়ার আলী দেহলবী, *উর্দু সাহাফাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪।

৫৬৭ *তদেব*, পৃ. ১৪৪।

৫৬৮ *তদেব*, পৃ. ১৪৫।

৫৬৯ নূরুল ইসলাম নদোবী, *রেহনুমায়ে সাহাফাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২।

৫৭০ আনওয়ার আলী দেহলবী, *উর্দু সাহাফাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫।

৫৭১ ড. সৈয়দ আখতার জাফরী, *আগ্রা মে উর্দু সাহাফাত* (আগ্রা: মীর্জা গালিব রিসার্চ একাডেমি, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪২।

৫৭২ আনওয়ার আলী দেহলবী, *উর্দু সাহাফাত*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০।

চতুর্থ অধ্যায়

অমুসলিম কবি সাহিত্যিকদের সাহিত্যে বিধৃত সমাজ চিত্র

উর্দু সাহিত্যে অমুসলিম কবি সাহিত্যিকদের অবদান ছিল অতুলনীয়। তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। তারা গ্রামীণ ও নগর জীবন উভয় থেকে তাদের বিষয় নির্বাচন করেন এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের বিচরণ রয়েছে। তাদের লেখনীর মাধ্যমে তারা যেমন গ্রামের চিত্র চিত্রিত করেন, তেমনিভাবে নগরজীবনের চাকচিক্যও তুলে ধরেন। তারা সমাজের প্রতিটি দিক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মভাবে দেখেন। সমাজের অনেক দিক রয়েছে যেগুলো তারা তাদের গদ্য ও কাব্য সাহিত্যে অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

৪.১ কাব্য সাহিত্যে বিধৃত সমাজচিত্র

অমুসলিম কবিগণ তাদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং সেগুলো সমাধানেরও চেষ্টা করেন। তারা তাদের কাব্য সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজে নারীদের অবস্থান অত্যন্ত সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছেন।

ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত একজন অসামান্য কবি। তিনি মেয়েদের জন্য একটি নজম রচনা করেন। সেটি হলো- پھول مالا (ফুল মালা), যা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে চাকবাস্ত নারীদের বিষয়গুলো খুব সুক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। নারীরা সমাজেরই একটি অংশ কিন্তু সমাজের অনেকে নারীদেরকে তুচ্ছ মনে করে। তাদের মধ্যে অনেক গুণাবলী রয়েছে কিন্তু সমাজে কারো চোখে তা পড়ে না। তিনি বেশিরভাগ নজম সমাজ বা মানবিক আচরণকে লক্ষ্যবস্তু করে লিখেছেন। ফুল মালা নজমে কবি মেয়েদের উদ্দেশ্যে এভাবে বলেন-

رنگ ہے جن میں مگر بوئے وفا کچھ بھی نہیں
اسے پھولوں سے نہ گھر اپنا سجانا ہرگز
نقل یورپ کی مناسب ہے مگر یاد رہے
خاک میں غیرت قومی نہ ملانا ہرگز۔[১]

ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্তের নজমের বিষয়গুলো ছিল চমৎকার। তিনি বিধবাদের বিষয়েও একটি নজম রচনা করেছেন। এই নজমের নাম হলো- برق اصلاح (বারকে ইসলাহ) যা ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত

হয়েছিল। এই নজমে কবি বিধবাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এই নজমে কবি বলেন-

دل تو گیا روح بھی اس قید سے آزاد نہیں
یہ ہے وہ ظلم کہ جس کی کہیں فریاد نہیں[২]

জগন্নাথ আজাদ কাব্য সাহিত্যে খুব পরিচিত একটি নাম। তার কবিতাগুলোকে যদি বিষয়ের উপর ভাগ করা হয়, তাহলে তার কবিতাগুলো সামাজিক, প্রেমের, মানবতা, রোমান্টিকতা এবং রাজনৈতিক কবিতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। আজাদের অনেকগুলো কবিতা রয়েছে, যেগুলোতে তিনি সামাজিক চিত্র খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি তার কবিতার মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্র আঁকেন। پس پردہ (পাস পর্দা) তার একটি সমাজের বাস্তব চিত্র বিষয়ক কবিতা বিবেচনা করা হয়। এই কবিতায় তিনি সমাজের দৃশ্য দেখাতে গিয়ে বলেছেন-

خبر نہ تھی کہ وہ سحر نظر کو جس کا شوق ہے
ہر ایک راہ رو کو رہ گزر کو جس کا شوق ہے
جب آئے گئی تو ظلمتوں کا سیل ساتھ لائے گی
قریب ودور پر مہیب رات بن کے چھائے گی۔[৩]

তিনি তার কবিতার মাধ্যমে সমাজের সকল প্রকার কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করেছেন। জগন্নাথ আজাদ এমন একজন কবি যিনি সমাজ এবং সমাজের মানুষকে খুব ভালোভাবে বুঝতেন। সেজন্য তার কবিতায় তিনি সামাজিক চিত্রগুলো খুব চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন।

ফেরাক গোরাখপুরী উর্দু কাব্য সাহিত্যের আরেকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব যিনি তার কবিতার মাধ্যমে সমাজের আচার অনুষ্ঠান এবং সভ্যতাকে তুলে ধরেছেন। তার সমাজের উপর লিখিত একটি নজম হলো نغمۂ حقیقت (নাগমায়ে হাকীকত)। এ কবিতায় কবি মানব জীবনের দর্শন এবং সভ্যতাকে তুলে ধরেছেন। এ কবিতায় কবি সমাজের চিত্র অত্যন্ত সুনিপুনভাবে তুলে ধরেছেন। এ নজমে কবি বলেন-

جسے معلوم ہے میں ناسبب ہوں اور ناپیدا
مرے رنگین جو سارے عالم کو سمجھتا ہے
کبھی ادہام باطل سے وہ دھوکا کھا نہیں سکتا
کہ داغ معصیت سے اس کا دامن پاک ہوتا ہے۔[8]

ফেরাক গোরাখপুরী তার কবিতার মাধ্যমে সমাজের চিত্র চিত্রায়ন করেছেন। তিনি স্বীয় কবিতার মাধ্যমে সমাজের সমস্যাবলী তুলে ধরে তা প্রতিকার করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

আনন্দ নারায়ণ মোল্লা সাহেব তার নজমে সমাজকে বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। সামাজিক ও প্রেমমূলক নজম হচ্ছে- ٹھنڈی کافی (ঠাণ্ডী কাফী)। এ নজমে কবি প্রেমের কাহিনি তুলে ধরেছেন এবং এতে সৌন্দর্যের অনুভূতি রয়েছে। এতে মানুষের জীবনের ঘটনাবলীও রয়েছে। নজমে কবি সামাজিক বিষয়গুলোকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কবি বলেন-

پھر لگی کہنے کہ اس وقت بہت خوب ملے
جانے کے سال اسی آس میں بیٹھے بیتے
شاید آجائے سواری کوئی بھولے بھٹکے
یہ غنیمت تھی کہ جینے کے لے ساتھ مرے
اک تھرماس اور اک جلد حکایات کی تھی۔[৫]

‘ঠাণ্ডী কাফী’ আনন্দ নারায়ণ মোল্লার একটি সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম। এ নজমে জীবনের সব রং প্রতিফলিত হয়েছে। তার যত নজম রয়েছে তার মধ্যে এই নজম অনেক খ্যাতি অর্জন করেছে।

সত্বীয়াপাল আনন্দ কাব্য সাহিত্যের একজন অদম্য কবি যিনি তার কবিতার মাধ্যমে সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি সংস্কার করার চেষ্টা করেছেন। তার সামাজিক বিষয়ের উপর অনেক নজম রয়েছে। তার মধ্যে আলোচিত নজম হলো- آواز شکست ذات (আওয়াজে শিকাস্ত জাত)। এই নজমে কবি সমাজের দৃশ্য দেখাতে গিয়ে বলেন-

اس شکست ذات میں آہنگ کا احساس تو ہے
کوئی با معنی گل نغمہ نہیں ہے
ٹوٹنے کا یہ عمل ناگفتنی ہے
میری آواز شکست ذات اک آہنگ تو ہے
مرثیہ خوانی نہیں ہے![৬]

‘আওয়াজে শিকাস্ত জাত’ কবিতা ছাড়া সত্বীয়াপালের সামাজিক নজমগুলো হলো- خود کلامی (খোদ কালামী), بسر پدرم (বসর পিদরম), گودہ کا انتظار (গোদা কা ইনতেজার), سیلق پورٹریٹ (সয়লিকপুর

ট্রেট), مویشی منڈی (মোয়েশী মাণ্ডী), حویلی (হায়েলী), وصال (ওসাল) ہوس (হোস), آخری چٹان تک (আখেরী চাটান তক), فنکار تھک گیا ہے (ফনকার থক গিয়া হ্যা), کالا جادو ۱،۲،۳ (কালা জাদু- ১,২,৩), نٹ راج (নটোরাজ) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।[৭] সত্বীয়াপাল নারী বা মেয়েদের নিয়েও কবিতা লিখেছেন। এ বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য নজম হলো- بہم وضائے خودکشی (বাহাম ওয়ায়ে খোদকাশী)। এই কবিতায় কবি বলতে চেয়েছেন যে, নারীরা তার স্বামীর জন্য পুরো শরীর বিলিয়ে দেয়, তবুও স্বামীর মন পায় না, যা তাদের কাছে আত্মহত্যার সমান। কবি নারীদের এ সমাজ নীতি সংস্কার সম্পর্কে সোচ্চার হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন-

جس نے پتھر کو بھی زندگی بخش دی تھی
تمہیں اس کا احساس شاید نہیں ہے
کہ دونوں بدن باہمی خودکشی کی
رضا میں بندھے دیر سے مر چکے ہیں![৮]

৪.২ গদ্য সাহিত্যে বিধৃত সমাজচিত্র

অমুসলিম লেখকগণ তাদের গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং তা প্রতিকারের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

প্রেমচাঁদ একজন অন্যতম জনপ্রিয় গদ্য লেখক। প্রেমচাঁদ সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। প্রেমচাঁদ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রেমচাঁদের গদ্য সাহিত্যের আরেকটি দিক হলো- তিনি একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি সমাজ থেকে সকল কুসংস্কার নির্মূল করতে চান। দারিদ্রের উপর নিপীড়ন, পুঁজিবাদী ও ধর্মীয় ঠিকাদারদের বাড়াবাড়ি, উচ্চবর্ণের অবস্থা এ জাতীয় অন্যান্য কুফল তাকে কষ্ট দেয়। এগুলো অপসারণের আকাঙ্খা তার অন্তরে উদয় হয় এবং এ আকাঙ্খা থেকে তিনি তার উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটকে এ ধরনের বিষয় উপস্থাপন করেছেন। প্রেমচাঁদ মূলত শ্রেণি নিপীড়নের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন।

প্রেমচাঁদ তার সমসাময়িক ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তিনি গভীরভাবে তৎকালীন ঘটনাবলী পক্ষপাতহীনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির কামনা করেছেন। তিনি তার প্রবন্ধাবলী ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকতামূলক নিবন্ধে তৎকালীন

ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি, নর-নারী সম্পর্ক, নারীর সামাজিক মর্যাদা প্রভৃতি বিষয়াবলী গভীরভাবে অনুধাবন ও বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি নারীর অধিকার বঞ্চিত অসহনীয় জীবন এবং তা থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করেছেন।[৯]

প্রেমচাঁদ তার গদ্য সাহিত্যে হিন্দুস্তানি নারীদের অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। প্রেমচাঁদ নারীদের খুব সম্মান করতেন, তার অনেক ছোটগল্পে তিনি নারী সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। মোহাম্মদ আকবর উদ্দীন সিদ্দিকী বলেছেন-

"پریم چند نے عورتوں اور دوسرے ہر نقطۂ خیال کو اپنے افسانوں میں پیش کیا"۔[১০]

প্রেমচাঁদের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপন্যাস হলো- 'বাজারে হুসেন'। এই উপন্যাসে লেখক পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এই উপন্যাসে বীঠেল দাশ ও পদ্ম সিংহকে সমাজ সংস্কারক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা পতিতাবৃত্তি সমাজ থেকে দূর করার জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। প্রেমচাঁদ এ উপন্যাসে পদ্ম সিংহের সংস্কারের মাধ্যমে পতিতা পেশায় নিয়োজিত নারীদের নির্লজ্জ, বেহায়াপনা, পাপিষ্ঠ জীবন পরিহার করে সঠিক পথে অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেন এতে তারা যেন পাপ থেকে পরিত্রানের সুযোগ পায়। প্রেমচাঁদ এখানে নিজেকে একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে নয়; বরং সমাজ সংস্কারক হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন যে, যারা পতিতাবৃত্তি এবং নর্তকী পেশায় নিয়োজিত থাকে তারা সমাজের কারণে এই পেশায় আসতে বাধ্য হয়। প্রেমচাঁদ তার লেখনীর মাধ্যমে এই দুর্ভাগা পতিতাদের পাপ ও অপরাধ থেকে পরিত্রাণ দিয়ে তাদেরকে সমাজে সম্মানিত করতে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। এই উপন্যাসে নায়িকা সুমন সমাজের কারণে পতিতালয়ে যায় এবং এক সময় সে পতিতালয় থেকে বের হতে চায়। কিন্তু সমাজ তাকে মেনে নেয়না। পতিতাবৃত্তি ত্যাগ করার পরও তৎকালীন সভ্য সমাজে সে স্থান পায়না। সুমন বাঈ পতিতা পেশা ত্যাগ করে বিধবাশ্রমে কাজ চাইলেও তাকে কাজ দেয়নি। অর্থাৎ বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থা পতিতাবৃত্তি পরিত্যাগের পরও সুমনকে সামাজিক মর্যাদা দেয়নি। প্রেমচাঁদের ভাষায়-

"وہ ان کی اصلاح کر کے سماج میں انہیں ایک باعزت فرد مقام دینا چاہتے ہیں لیکن انھیں اس مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی۔ سمن یہ پیشہ ترک کرنے کے بعد بھی آخر وقت تک سماج کیلئے قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسری طرف وہ انہیں شہر کے ممتاز مقامات سے اسلئے ہٹانا چاہتے ہیں اور تقریبوں میں انکے رقص و سرور کو اسلئے ممنون کرانے کیلئے گوشاں ہے کہ اس سے ان طبقہ کے نوجوانوں لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق پر برا اثر نہ پڑے۔ ان کے سوئے ہوئے جذبات بیدار نہ ہوئی۔"[১১]

প্রেমচাঁদের নারী ভিত্তিক আরেকটি উপন্যাস হলো- بیوہ (বেওয়া)। এই উপন্যাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে সমাজের বাস্তবতা ও আদর্শ চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এছাড়াও হিন্দুসমাজে বিধবাদের করুন অবস্থা ও তাদের পরিণতির চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। বিধবারা পরিশ্রম করে স্বাবলম্বীভাবে বেঁচে থাকতে চাইলেও সমাজ তাদের দিকে আঙ্গুল তুলে কথা বলে। সমাজে তাদের কোন মান-মর্যাদা থাকে না। কিন্তু এই বিধবা হওয়ার পেছনে তাদেরও কোন হাত নেই এই বিষয়টা সমাজের মানুষ বুঝতে চায় না। তাদের দিকে সবাই খারাপ দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু সমাজে কিছু ভালো মানুষও থাকে যে তাদের জন্য চিন্তা-ভাবনা করে বিধবা আশ্রম তৈরি করে। এই উপন্যাসে এইরকমই একটি চরিত্রের জ্বলন্ত উদাহরণ হলো অমৃতরায়।

প্রেমচাঁদের ছোটগল্পে রোমান্স রয়েছে, তবে তার রোমান্স দেশপ্রেমের দ্বারা প্রভাবিত, যা তার প্রথম দিকের গল্পগুলোতে প্রতিফলিত হয়। প্রেমচাঁদের রোমান্সের ধারণার একটি সামাজিক মাত্রা রয়েছে। এতে প্রেমের অনেক রং রয়েছে যার মধ্যে দেশপ্রেম, নিপীড়িত শ্রেণির প্রতি সহানুভূতি ইত্যাদি। প্রকৃতিবাদ, ট্র্যাজেডি এবং উদ্বেগকে প্রেমচাঁদের রোমান্সের মূল উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে অন্যান্য লেখক যেমন ছোটগল্পে প্রেম, ভালোবাসার কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন, প্রেমচাঁদ সেরকম প্রেম-ভালোবাসা তার ছোটগল্পে দেখাননি। তবে তার ছোটগল্পে রোমান্টিকতার বিষয় সামাজিক প্রেক্ষাপটের আলোকে ছিল। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ ওকার আজীম বলেছেন,

"پریم چند کے افسانوں میں لوگ رومان کی کمی محسوس کرتے ہیں لیکن ان کے افسانوں میں جابجا رومان کی جھلک بھی بے حد دلکشی معلوم ہوتی ہے۔ ان کی رومانیت نیاز یا سجاد حیدر کی سی نہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس میں حقیقت اور اصلاحی مقصد کے امتزاج نے ایک نئی بات پیدا کردی ہے۔ ہم رومان میں حقیقت، نفسیات اور سچائی کا لطف اٹھاتے ہیں یا یوں کہتے، کہ زندگی کے سچے اور حقیقی واقعات میں رومان کا لطف آتا ہے۔ ان کے ایسے افسانوں میں "تریاچر تر" " امرت" "منادن" اور "وفا کا جال" خاص طور پر قابل قدر ہیں"۔ [১২]

প্রেমচাঁদ তার ছোটগল্পে হিন্দুস্তানি নারীদের অবস্থান, তাদের ভালো ও খারাপ অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ড. ওয়াজেদ কোরেশী বলেছেন,

"پریم چند نے اپنے افسانوں میں ہندوستانی عورت کی زبوں حالی پر مختلف زادیوں سے روشنی ڈالی ہے۔ عورت کا استحصال، اس کی لاعلمی، اس کی توہم پرستی اور ان تمام چیزوں کے ردّ عمل میں اس کی بد سے بدتر ہوتی ہوئی حالت پر اپنے قلم کو جنبش دی ہے۔ وہ عورت کو اتنے ہی اختیارات دینے کے حق میں ہیں"۔ [১৩]

প্রেমচাঁদ সমাজে যেমন নারীদের মর্যাদার জন্য সোচ্চার ছিলেন, তেমনিভাবে সমাজের গরিব কৃষক শ্রেণি ও নিপীড়িত মানুষের পাশে ছিলেন। 'গোশায়ে আফিয়াত' উপন্যাসে লেখক কৃষকদের উপর জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের চিত্র অংকন করেছেন। এই উপন্যাসে তিনি ভারতের গ্রামীণ জীবন ও কৃষকদের অনুভূতি এবং তাদের উপর নির্যাতনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। প্রেমচাঁদ এই উপন্যাসে গ্রামীণ জীবন ও কৃষকদের জীবনের প্রতিচ্ছবি বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রামবালাস শর্মার উদ্বৃতি দিয়ে ড. ইউসুফ সারমাসত লিখেছেন-

"گوشۂ عافیت" کسانوں کی زندگی کارزمیہ ہے۔اس میں اس زندگی کاایک پہلونہیں دکھایاگیاہے وہ ایک کشادہ ندی کی طرح ہے۔جس میں ندی کی دھاراکے ساتھ آس پاس کے نالوں کاپانی جڑسے اکھڑے ہوئے پرانے کھوکھلے پیڑوں اور سروں اور کھیتوں کی گھانس پات بھی بہتادکھائی دیتاہے۔"[১৪]

প্রেমচাঁদের এই উপন্যাসে প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র পাঠকের সামনে এসে যায়। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইংরেজদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হওয়া ও নীরবে অত্যাচার সহ্য করার কারণেই কৃষকরা নির্যাতিত ও অবহেলিত। শাসকশ্রেণি বিভিন্নভাবে কৃষকদের নিঃস্ব ও সর্বশান্ত করছে। মূলত প্রেমচাঁদ ভারতবর্ষের তৎকালীন অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।[১৫]

সমাজে উচ্চবৃত্ত ও নিম্নবৃত্তের মধ্যে তফাৎ সৃষ্টি করা হয়। প্রেমচাঁদ ময়দানে আমল উপন্যাসে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মাধ্যমে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অবহেলিত হয় তা তুলে ধরেছেন। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দিতে চায় না। কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশের প্রবল ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। সনাতন হিন্দু ধর্মের অন্তরালে মন্দিরের ঠাকুর ও ভক্তদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এ উপন্যাসে ড. শান্তিকুমার চরিত্রের মাধ্যমে প্রেমচাঁদ বুঝিয়েছেন যে, সমাজে নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও অধিকার আছে। ভগবান কারো ব্যক্তিগত নয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও ভগবানের পূজা-আর্চনা করার অধিকার আছে। যে কোন মন্দিরে তাদের প্রবেশের অধিকার রয়েছে।[১৬] প্রেমচাঁদের ভাষায় শান্তিকুমার বলেছেন-

"آپ لوگوں نے ہاتھ کیوں بند کر لئے لگائے خوب کس کس کر۔اور جوتوں سے کیا ہوتا ہے۔۔۔اور تم دھرم کو ناپاک کرنے والو تم سب بیٹھ جاؤ اور جتنے جوتے کھاسکو کھاؤ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ یہاں سیٹھ مہاجنوں کے بھگوان رہتے ہیں۔۔۔یہ بھگوان جوہرات کے زیور پہنتے ہیں، موھن بھوگ ملائی کھاتی ہیں۔"[১৭]

ড. শান্তিকুমার এর চরিত্রের মাধ্যমে প্রেমচাঁদ চির অবহেলিত ভারতের নিম্নবর্ণের হিন্দুজাতির অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়েছিলেন।

গ্রামগুলোর দৃশ্য প্রেমচাঁদের ছোটগল্পের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তার আগে সাহিত্যে গ্রামের উল্লেখ ছিল না এবং কেবল শহুরে জীবন উপস্থাপিত হয়েছিল। তিনি গ্রামে বড় হয়েছেন। তার বেশিরভাগ ছোটগল্পে গ্রামের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি গ্রামীণ সমাজকে তার ছোটগল্পের বিষয় তৈরি করে সমাজ ও সাহিত্যে অবদান রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে আজিম আলশান সিদ্দিকী বলেছেন,

"انہوں نے دیہی معاشرے کو اپنے افسانوں کا موضوع بنا کر ادب اور سماج دونوں ہی کی خدمت انجام دی ہے۔اور بھی ختم نہ ہونے والے موضوعات کی طرف افسانے کی توجہ دلا کر اس کا دامن تنوع اور دلکشی سے بھر دیا ہے اور اسے ایسے فطری اور جاندار زبان بھی عطا کی ہے جو اپنے سرچشموں سے قریب تر ہے"۔[১৮]

গ্রামে বর্ণিত উপাদানসমূহ তার ছোটগল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন, *بڑی گھر کی بیٹی* (বড়ে ঘর কি বেটি), *وفا کی دیوی* (ওফা কি দেবী), *بڑے بھائی صاحب* (বড়ে ভাই সাহেব), *گلی ڈنڈا* (গুলি ডান্ডা), *رام نیلا* (রাম নীলা), *زیور کا ڈبہ* (জেবর কা ডিব্বা), *پوس کی رات* (পুস কি রাত), *عیدگاہ* (ঈদগাহ) ইত্যাদি ছোটগল্পগুলোতে গ্রামবাসীর বসবাস, তাদের ধারণা ও বিশ্বাস চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রেমচাঁদের পরে উর্দু গদ্য সাহিত্যে সমাজের বাস্তব চিত্র যিনি তুলে ধরেছেন তিনি হলেন কৃষণচন্দ্র। কৃষণচন্দ্র শোষিত, নিপীড়িত মানুষের পক্ষে, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠণবৃত্তির বিরুদ্ধে আজীবন এক অক্লান্ত সৈনিকের মতো নিজের লেখনীকে ব্যবহার করেছেন। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, নির্যাতিত মানুষের সরব কণ্ঠস্বরের অপর নাম কৃষণচন্দ্র। ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিদ্বেষ ও দাঙ্গার ভয়াবহতা, কৃষকদের দুর্দশা, শ্রমিকের অসহায়ত্ব ও সংগ্রাম, নর-নারীর প্রেম, কামনা বাসনা সবই ফুটে উঠেছে তার উপন্যাসে। শ্রেণি সংগ্রাম, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষণ, নিরাপত্তা, গণতন্ত্র এবং নারীবাদ ছিল তার প্রিয় বিষয়। তার কল্পকাহিনীতে সামাজিক বাস্তবতার কিছু রূপ রয়েছে। কৃষণচন্দ্রের প্রতিটি গল্পের একটি মোড় নিয়ে নিজস্ব গল্প থাকে। তিনি জীবনের দৈনন্দিন প্রক্রিয়াগুলো ও ঘটনাগুলো এবং সামাজিক উপাদানগুলো অনুসন্ধান করেন।

ভারতীয় নারীর উপর নিপীড়নের গল্প তিনি তার গদ্য সাহিত্যে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে নারীদের মর্যাদার বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তাদের দুর্দশার জন্য সমাজের অবক্ষয়িত ব্যবস্থাকে দোষারোপ করেছেন। সমাজে নারীদের অবস্থান দেখে তার সহানুভূতির উদয় হয় এবং সমাজ থেকে নারী নির্যাতন দূরীকরণে তিনি তার গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যের আলোকে মাহনুর যামিনী বেগম লিখেন-

"کرشن چندر نے اپنے دل میں پائی جانے والی عورت کے اس احترام اور اس سے اس قدر شدید عقیدت کے باعث ہندوستان میں عورت کی سماجی بدحالی کی مختلف صورتوں کا مطالعہ کیاان پر نئے نئے زاویوں سے روشنی ڈالی ہے اور انجانے حقائق کو واضح کیاہے تاکہ عوام میں عورت سے متعلق مسائل کو نئے نئے طریقوں سے حل کرنے کا شعور پیداہواور اس سلسلے میں کامیاب کوشش کی جائے۔انہوں نے ممبئ آنے کے بعد فلمی دنیامیں داخل ہو کر کے مسائل کو قریب سے دیکھا تھااور اس کے علاوہ بھی ہندوستانی سماج میں جہاں کہی کھوٹ نظر آیاانھونے اس کے قریب ہو کراس کو جاننے اور پہنچاننے کی کوشش کی تھی۔"[১৯]

কৃষণচন্দ্রের একটি সামাজিক ও নারী ভিত্তিক উপন্যাস হল- *ایک عورت ہزار دیوانے* (এক আওরাত হাজার দিওয়ানে)। এই উপন্যাসের মাধ্যমে লেখক বুঝাতে চেয়েছেন সমাজে নারীদের অবস্থান অত্যন্ত নিম্নস্তরে। কৃষণচন্দ্র এই উপন্যাসে এমন এক নারীর কথা উল্লেখ করেছেন যে হুসেন খানার কেল্লায় ছিল, যেখানে নাচ-গান করে তাকে পুরুষদের মনোরঞ্জন করতে হতো। তার ইচ্ছা না থাকলেও সমাজ তাকে এ পথ বেছে নিতে বাধ্য করেছিল। লেখক এ উপন্যাসের ম্যাধমে এমন সমাজকে ধিক্কার জানিয়েছেন।

কৃষণচন্দ্র তার উপন্যাসের মাধ্যমে নারীদের পরিস্থিতির পাশাপাশি সমাজের গবির কৃষকদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরেছেন। তার এ ধরনের একটি জনপ্রিয় ও অন্যতম উপন্যাস হল- *طوفان کی کلیاں* (তুফান কি কালিয়া)। এই উপন্যাসে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, জমিদাররা তাদের নিজের স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য গরিব কৃষকদের জুলুম ও অত্যাচার চালাত, যা সমাজে অহরহ চলছে। সমাজে গরিব কৃষকদের ও মেহনতী মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য কৃষণচন্দ্র লেখনীর মাধ্যমে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন।

কৃষণচন্দ্রের পর রাজেন্দ্র সিং বেদী উর্দু গদ্য সাহিত্যে সমাজ সংস্কারক, কিংবদন্তি ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন। তিনি তার সামাজিক জীবন থেকে গদ্য সাহিত্য রচনার জন্য উপাদান পেয়েছেন এবং সততা ও আন্তরিকতার সাথে সামাজিক দুর্দশা উপস্থাপন করেছেন। তিনি বহু ঘরোয়া সমস্যা এবং সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি তার গদ্য সাহিত্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। অন্যান্য ছোটগল্পকারের মতো বেদির ছোটগল্পে সমাজের নারী শ্রেণি বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। তিনি তার ছোটগল্পের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। তার কোন কোন ছোটগল্পে নারীদেরকে শান্তভাবে এবং কিছু কিছু ছোটগল্পে নারীদের সংগ্রামী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আবার কতক ছোটগল্পে নারীদেরকে রোমান্টিক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসঙ্গে ওকার আজীম লিখেছেন,

"اردو کے بہت سے دوسرے افسانہ نگاروں کی طرح بیدی کے افسانوں میں بھی بہت سی جگہ عورت نظر آتی ہے۔ لیکن ان کے یہاں دوایک موقعوں کو چھوڑ کر عورت صرف رومان کا دوسرا نام نہیں۔ عورت کے تصور کے ساتھ رومان جو قدرتی جذبہ موجود ہے اس کا احساس بیدی کو بھی شدت سے ہے"۔[২০]

রাজেন্দ্র সিং বেদীর ছোটগল্প اپنے دکھ مجھے دے دو (আপনে দুখ মুঝে দে দো) এর নায়িকা 'ইন্দো' گرہن (গ্রহন) ছোটগল্পের নায়িকা 'হোলি' পশ্চাৎপদ সমাজের এমন নারীকে প্রতিনিধিত্ব করে, যারা শ্বশুর বাড়িতে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে সমাজে নারীদের সামাজিক মর্যাদা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

রাজেন্দ্র সিং বেদীর পরে যে ঔপন্যাসিক সমাজের প্রচলিত কুসংস্কার দূর করার জন্য অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন তিনি হলেন রতন নাথ সরশার। তিনি তার উপন্যাসের মাধ্যমে সামাজিক ও নৈতিক প্রতিকার করার চেষ্টা করেছেন এবং তার উপন্যাসের মাধ্যমে মদ্যপানের নিন্দা করেছেন। তিনি লক্ষ্মৌতে বড় হওয়ার সুবাদে তার লেখনীর মাধ্যমে লক্ষ্মৌর সামাজিক পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। রতন নাথ সরশারের উপন্যাসে তখনকার সময়ের সমাজের রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ তুলে ধরেছেন যা এখনকার সমাজেও প্রচলিত রয়েছে। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে সমাজের পুরাতন রীতি-নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রেমপাল অশোক বলেছেন-

انھوں نے اپنی تحریروں کے ذریعہ ہمارے سماج کے پورانے، فرسودہ اور کہنہ رسم ورواج کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہے"۔[২১]

তার একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক উপন্যাস হলো- جام سرشار (জামে সরশার)। এই উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি মদ্য পানের নিন্দা করেছেন এবং নৈতিক প্রতিকার করার চেষ্টা করেছেন।

টীকা ও তথ্য নির্দেশ

১ পণ্ডিত ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত, *সুবহে ওয়াতন* (লক্ষ্ণৌঃ নামী প্রেস, ১৯৮৫ খ্রি.), পৃ. ৮৯ ।

২ *তদেব*, পৃ. ৯১ ।

৩ এম. জিব খান, *প্রফেসর জগন্নাথ আজাদ শাখছিয়্যাত অওর আদবী খেদমত* (নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড-জামিয়া নগর, ১৯৯৪ খ্রি.), পৃ. ৫০ ।

৪ ফেরাক গোরাখপুরী, *গুলবাঙ্গ* (এলাহাবাদঃ সাহিতীয়া কালাভুন, ১৯৬৭ খ্রি.), পৃ. ১৪১ ।

৫ আনন্দ নারায়ণ মোল্লা, *মেরি হাদিসে উমরে গ্রীজান*, (এলাহাবাদঃ ইণ্ডিয়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩ খ্রি.), পৃ. ১৩৮-১৩৯ ।

৬ সত্বীয়াপাল আনন্দ, *ওয়াক্ত লা ওয়াক্ত* (দিল্লীঃ প্রিন্স আফিট প্রিন্টার্স, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৬০ ।

৭ ড. আই-এ আবদুল্লাহ, *সত্বীয়াপাল আনন্দ কী নজম নিগারী* (দিল্লীঃ পাবলিশার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাসট্রিজ, ২০০৮ খ্রি.) পৃ. ৩৭ ।

৮ সত্বীয়াপাল আনন্দ, *মুঝে না কর বিদা* (দিল্লীঃ হায়দার প্রেস কলিমারান, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৭০ ।

৯ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ* (ঢাকাঃ আবিষ্কার, ২০১৪ খ্রি.), পৃ. ৪৪-৪৫ ।

১০ মোহাম্মদ আকবর উদ্দিন সিদ্দীকী, *প্রেমচাঁদ অওর উনকী আফসানা নিগারী* (হায়দ্রাবাদঃ তিলসানীন উশমানীয়াবাগ আমা, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৯ ।

১১ মুন্সী প্রেমচাঁদ, *বাজারে হুসন* (লাহোরঃ দারুল এশায়াত পাঞ্জাব, ১৯২২ খ্রি.), পৃ. ১৫-১৬ ।

১২ সৈয়দ ওকার আজীম, *হামারে আফসানা নিগার* (রামপুরঃ সাউলাত পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৩৫ খ্রি.), পৃ. ১০৫ ।

১৩ ড. ওয়াজেদ কোরেশী, *প্রেমচাঁদ কে আফসানোঁ মে হাকীকত কা আমল*, (নয়াদিল্লীঃ মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০০৩ খ্রি.) পৃ. ১০৩-১০৪ ।

১৪ ড. ইউসুফ সারমাসত, *প্রেমচাঁদ কী নাবেল নিগারী* (হায়দ্রাবাদঃ আলিয়াস ট্রিট্রেস পাবলিশার, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৬৩ ।

১৫ ড. মোঃ রেজাউল করিম, *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাসঃ বিষয় ও শিল্পরূপ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭-৪৮ ।

১৬ *তদেব*, পৃ. ১৪৬ ।

১৭ মুন্সী প্রেমচাঁদ, *ময়দানে আমল*, (দিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া, ১৯৪৩ খ্রি.), পৃ. ২৪৭-২৪৮ ।

১৮ আজীম আলশান সিদ্দিকী, *আফসানা নিগার প্রেমচাঁদ তানক্বীদী ও সমাজী মুহাকুমা* (দিল্লীঃ এডুকেশনাল পাবলিসিং হাউস, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ১৫৪ ।

১৯ http://www.urdulinks.com/urj/?p=1598.

২০ ওকার আজীম, *নয়া আফসানা* (আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, (১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ৯৯ ।

২১ প্রেমপাল অশোক, *রতন নাথ সরশার হায়াত, শাখছিয়্যাত অওর কারনামে* (দিল্লীঃ তারাক্কি উর্দু ব্যুরো, ২০০০ খ্রি.), ৫৯ ।

উপসংহার

উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে অমুসলিম কবি সাহিত্যিকদের অবদান অনস্বীকার্য। তারা তাদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাদের কাব্য ও গদ্য সাহিত্যে ছিল আধুনিকতার ছোঁয়া। তারা যেমন কল্পনানির্ভর সাহিত্য রচনা করেছেন, তেমনি মানুষের বাস্তব জীবনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবিও তাদের সাহিত্যকর্মে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গজল কাব্য সাহিত্যের মধ্যে একটি জনপ্রিয় শাখা। গজলে অমুসলিম কবিদের অবদান ছিল অতুলনীয়। গজলে যেসব অমুসলিম কবি ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত, জগন্নাথ আজাদ, ফেরাক গোরাখপুরী, তিলোকচাঁদ মাহরুম, আনন্দ নারায়ণ মোল্লা প্রমুখ। উল্লিখিত অমুসলিম কবিগণ নজমেও বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন এবং নজমকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। কাব্য সাহিত্যের মছনবী শাখাতে অমুসলিম কবিদের অবদানও কম নয়। অমুসলিম কবিগণ কাব্য সাহিত্যের মারছিয়াতেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। মারছিয়ার কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবিগণ হলেন- দিলগীর লক্ষ্মৌবী, জাহিন লক্ষ্মৌবী, নানক লক্ষ্মৌবী, রাজা উলফাত রায়, রাজা ধনপত রায়, গোপীনাত আমন প্রমুখ।

কাব্য সাহিত্যের উল্লিখিত শাখাগুলো ছাড়াও অমুসলিম কবিগণ না'ত শাখাতেও বিশেষ অবদান রেখেছেন। না'ত হচ্ছে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসা সম্বলিত কবিতা। আমরা অনেকে মনে করি আল্লাহ এবং মহানবী (সা.) এর প্রশংসা শুধু মুসলমানরা করে থাকেন। কিন্তু অমুসলিমরাও যে মহানবী (সা.) এর প্রশংসা বা তার সম্পর্কে লিখতে পারেন তা অকল্পনীয়। উর্দু কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, না'তেও অমুসলিম কবিরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। এ শাখায় যেসব অমুসলিম কবিগণ অবদান রেখেছেন তারা হলেন- অশোক কুমার, কিরণ প্রকাশ, বাবু তোতারাম আখতার, বখশী শুরী লাল আখতার, সুচরণ দাস, হরী চাঁদ আখতার, পণ্ডিত কুন্দন সিং, গীরসরণ লাল, মুন্সী প্রভু লাল গৌড়, হাকীম তারলুক নাথ, দরশন সিং, রামপ্রতাপ, পণ্ডিত রঘুনাথ সাহাই, ড. অঞ্জনা সান্ধীর, রাজেস কুমার, দেবীদয়াল, ড. রমেশ প্রসাদ, সাধুরাম আরজু, হাকীম সরণ নাথ, রাধা ক্রিশন, ভাগোয়ানদাস, শিব প্রসাদ, লাল মকন্দর লাল, বাসন নারায়ণ, পিয়ারে লাল, বালুনাত কুমার, সুরুজ নারায়ণ, ভাগোবান দাস শাবাব ললিত, ইন্দোরজিত শর্মা প্রমুখ।

উপন্যাস গদ্য সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। এ শিল্পের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের রীতি-নীতি ও চালচলনের প্রতিচ্ছবি পূর্ণরূপে সমাজে দৃশ্যমান হয়। মুসলমান ঔপন্যাসিক ডেপুটি নাজির আহমেদ উপন্যাসের জনক হলেও আধুনিকতা ও বাস্তবতায় পূর্ণতা লাভ করে মুন্সী প্রেমচাঁদের মাধ্যমে। তার ধারাবাহিকতায় যে যে অমুসলিম সাহিত্যিকগণ উপন্যাসে অবদান রেখেছেন তারা হলেন- কৃষণচন্দ্র, রাজেন্দ্রসিং বেদি, রতন নাথ সরশার, উপেন্দ্র নাথ অশোক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উল্লিখিত অমুসলিম সাহিত্যিকগণ উপন্যাসে অশেষ অবদান রেখেছেন। তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন এবং সমাজের নানান অসঙ্গতি তুলে ধরে সেগুলো সমাধানের আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তারা উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধের মাধ্যমে তৎকালীন ভারতের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থার পূর্ণাঙ্গ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে নারীদের প্রতি নির্মম, কঠোর ও নির্দয়তার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করেছেন এবং সমাজে নারীদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার দিক নির্দেশনাও দিয়েছেন। তারা ভারতবর্ষের গরিব কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবর্ণের হিন্দু, মুসলিম এবং অতি সাধারণ মানুষকে তাদের গদ্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু করেছেন।

অমুসলিম কবি সাহিত্যিকরা তাদের সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। তারা উর্দু সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। তাদের সাহিত্যকর্ম পরবর্তীকালে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীতে উর্দু সাহিত্য যতদিন টিকে থাকবে ততদিন অমুসলিম কবি সাহিত্যিকরা চিরভাস্বর ও স্বমহিমায় মহিমান্বিত হয়ে থাকবেন।

গ্রন্থপঞ্জি

উর্দুগ্রন্থ

যাইদী, ড. খুশহাল — *মুরাসসায়ে* নয়াদিল্লীঃ ইদারায়ে বখশে খিযরে রাহ, তা.বি.।

নাকবী, নুরুল ইসলাম — *তারিখে আদবে উর্দু*, আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০৪ খ্রি.)।

বশীর, এ. — *সহীফায়ে আদব*, আলীগড়ঃ আনোয়ার বুক ডিপো, ১৯৯৭ খ্রি.।

বেগম, আবিদা — *ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কী আদবী খেদমাত*, লক্ষ্মৌঃ নিসরাত পাবলিকেশন, ১৯৮৩ খ্রি.

জুনায়দী, আজিমুল হক — *উর্দু আদব কী তারিখ*, আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউজ, ১৯৯৪ খ্রি.।

সৈয়দ, ড. ইজাজ হুসাইন — *মুখতাছার তারিখে আদবে উর্দু*, দিল্লীঃ উর্দু কতাবঘর, ১৯৬৪ খ্রি.।

হালী, মাওলানা আলতাফ হুসাইন — *দীওয়ানে হালী*, দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ১৯৯৭ খ্রি.।

কাসেমী, আবুল কালাম — *ফেরাক গোরাখপুরী*, নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯৭ খ্রি.।

কাতীল, ড. মুহাম্মদ আব্দুল হাফিজ — *মি'য়ারে গজল*, হায়দ্রাবাদঃ আঞ্জুমানে তারাক্কি তা'লীমে উর্দু, ১৯৬১ খ্রি.।

আহমদ, ড. শেখ আকীল — *গজল কা উবুরী দওর*, দিল্লীঃ সাকি বুক ডিপো, উর্দু বাজার, ১৯৯৬ খ্রি.।

নাবিল, আজীজ — *পণ্ডিত ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত শাখছিয়্যাত অওর ফন*, নয়াদিল্লীঃ গ্রীন পাপিজ, ২০১৮ খ্রি.।

ব্রেলবী, ড. ইবাদত — *জাদীদ শায়েরী*, লাহোরঃ উর্দু দুনিয়া, ১৯৬১ খ্রি.।

রেজা, কালিদাশ গুপ্তা — *চাকবাস্ত অওর বাকিয়াতে চাকবাস্ত*, বোম্বেঃ বিমল পাবলিকেশন্স, ১৯৭৯ খ্রি.।

আহমেদ, ড. আফজাল — *চাকবাস্ত হায়াত অওর আদবী খেদমত*, লক্ষৌঃ সারফরাজ কওমী প্রেস, ১৯৭৫ খ্রি.।

কুমার, সঞ্জয় — *গজলিয়াতে চাকবাস্ত কা ফিকরী ও ফন্নী মুতালি'আ*, এলাহাবাদঃ ইদারা নয়া সফর, ২০১২ খ্রি.।

আঞ্জুম, খালিক — *জগন্নাথ আজাদ হায়াত অওর আদবী খেদমত*, নয়াদিল্লীঃ মাহরুম মেমোরিয়াল লিটারেরী সোসাইটি, ১৯৯৩ খ্রি.।

আহমেদ, হামিদা সুলতান — *জগন্নাথ আজাদ অওর উসকি শায়েরী*, নয়াদিল্লীঃ আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু হিন্দ, ১৯৯১ খ্রি. ।

সৈয়দা, ড. জাফর — *ফেরাক গোরাখপুরী*, নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯৬ খ্রি. ।

ফাতমী, আলী আহমদ — *শায়ের দানেশওর ফেরাক গোরাখপুরী*, নয়াদিল্লীঃ এম. আর পাবলিকেশন্স, ২০০৭ খ্রি. ।

কাসেমী, আবুল কালাম — *শায়েরী কি তানক্বিদ*, আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০১ খ্রি. ।

নাবিল, আজীজ — *ফেরাক গোরাখপুরী শাখছিয়্যাত, শায়েরী অওর শানাখত*, নয়াদিল্লীঃ হামদী প্রিন্ট জামিয়া নগর, ২০১৪ খ্রি. ।

সাঈদি, মাখমুর — *ফেরাক গোরাখপুরী জাত ও সিফাত*, দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ১৯৯৮ খ্রি. ।

আব্দুল ওয়াহিদ, ড. — জাদীদ *শু'আরায়ে উর্দু*, লাহোরঃ ফিরোজ এন্ড সন্স লিমিটেড, তা. বি. ।

আনছারী, ড. মুহাম্মদ ইউসুফ — *তিলোকচাঁদ মাহরুম হায়াত অওর শায়েরী*, মহারাষ্ট্রঃ উর্দু একাডেমি, ১৯৮৩ খ্রি. ।

বাহজাদী, কামিল — *তিলোকচাঁদ মাহরুম এক মুতালি'আ*, নয়াদিল্লীঃ মাহরুম মেমোরিয়াল লিটারেরী সোসাইটি, ১৯৯৯ খ্রি.

নাভোবী, রামলাল — *তিলোকচাঁদ মাহরুম*, নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯২ খ্রি. ।

মাহলী, শাহেদ — *আনন্দ নারায়ণ মোল্লা শায়ের অওর দানেশওর*, নয়াদিল্লীঃ গালিব ইন্সটিটিউট, ১৯৯৫ খ্রি. ।

মেহতা দরদ, ড. জগদীশ — *উর্দু কে হিন্দু শু'আরা*, ১ম খণ্ড, দিল্লীঃ হাকীকত বিয়ানি পাবলিশার্স, ১৯৭২ খ্রি. ।

” ” — *উর্দুকে নান মুসলিম শু'আরা অওর আদীব*, নয়াদিল্লীঃ হাকীকত বিয়ানী পাবলিশার্স, ১৯৮১ খ্রি. ।

(যাকী), মাওঃ আবূ সুফ্য়ান — *ফরহাঙ্গে জাদীদ*, ঢাকাঃ রশিদিয়া লাইব্রেরী, চক সার্কুলার, ১৯৯৮ খ্রি ।

মেহের, মুন্সী সুরজ নারায়ণ — *কালামে মেহের*, দিল্লী ও রাওয়ালপিণ্ডিঃ সাবেক ইসাসটাট ইস্ট্যাক্ট মাদারাস হালকায়ে, তা. বি. ।

মেরীঠী, নুর আহমদ — *বাহার যমা বাহার যবা*, করাচীঃ ইদারায়ে ফিকরে নো, ১৯৯৬ খ্রি. ।

আব্দুল হাকীম, মোহাম্মদ — *গোপাল মিত্তল এক মুতালি'আ*, দিল্লীঃ নাজেস বুক সেন্টার, ১৯৭৭ খ্রি. ।

জিয়া উদ্দিন, ড.	*গোপাল মিত্তল শাখছ অওর শায়ের*, নয়াদিল্লীঃ ইদারায়ে ফিকরে জাদীদ, ২০০৫ খ্রি. ।
রাম, মালিক	*জিয়া ফতেহ আবাদী শাখছ অওর শায়ির*, নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৭৭ খ্রি. ।
জগন্নাথ আজাদ	*জোহর বাজনুরী চন্দর প্রকাশ*, এলাহাবাদঃ তাজ অফসেট প্রেস, ১৯৮৬ খ্রি. ।
” ”	*সিতারোঁ সে জাররোঁ তক*, লাহোরঃ মাকতুবায়ে এলম ও দানশ, ১৯৯২ খ্রি. ।
” ”	*ওয়াতন মে আজনবী*, নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৬৪ খ্রি. ।
” ”	*নুয়ায়ে পেরেশান*, লাহোরঃ মাকতুবায়ে এলম ও দানশ, ১৯৬১ খ্রি. ।
” ”	*উর্দু*, দিল্লীঃ মাকতুবায়ে কসরে উর্দু, ১৯৫১ খ্রি. ।
” ”	*বেকরান*, দিল্লীঃ কিতাব ঘর, ১৯৪৯ খ্রি. ।
” ”	*মাতেম নেহরু*, নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৬৫ খ্রি. ।
” ”	*আবুল কালাম আজাদ*, লক্ষ্মৌঃ ইদারাহ ফুরুগে উর্দু, তা. বি. ।
হুসাইন, সৈয়দ আমজাদ	*গায়রে মুসলিম মারছিয়া নিগার*, লক্ষ্মৌঃ ইস্টাই লাইন প্রিন্টার্স, ১৯৯৫ খ্রি. ।
কাশ্মিরী, প্রফেসর আকবর হায়দারী	*হিন্দু মারছিয়া গো শু‘আরা*, নয়াদিল্লীঃ সাহেদ পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি. ।
চাকবাস্ত, পণ্ডিত ব্রজ নারায়ণ	*সুবহে ওয়াতন*, লক্ষ্মৌঃ নামী প্রেস, ১৯৮৫ খ্রি. ।
ওয়াকফ, মোহাম্মদ আইয়ুব	*জগন্নাথ আজাদ এক মুতালি‘আ*, দিল্লীঃ ইলমী মজলিস, ১৯৮০ খ্রি. ।
পালবী, আতাউল্লাহ	*উর্দু কে হিন্দু মছনবী নিগার*, নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ২০১২ খ্রি. ।
গোরাখপুরী, ফেরাক	*ধরতী কি করোট, এলাহাবাদঃ সাহিত্য কালাভুন, ১৯৬৬ খ্রি. ।*
” ”	*গুলবাঙ্গ*, এলাহাবাদঃ সাহিত্য কালাভুন, ১৯৬৭ খ্রি. ।
” ”	*রূহে কায়েনাত, এলাহাবাদঃ আইওয়ানে ইশায়াত, তা. বি. ।*
মাহরুম, তিলোকচাঁদ	*বাচোঁ কি দুনিয়া*, নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৬৪ খ্রি. ।
” ”	*গঞ্জে মা‘আনি*, লাহোরঃ আতরচাঁদ কাপুড় এণ্ড সন্স

পাবলিশার্স, ১৯৩২ খ্রি. ।

” ” *নৈরাঙ্গে মা'আনি*, দিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৬০ খ্রি. ।

” ” *কারওয়ানে ওয়াতন*, নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৬০ খ্রি. ।

মোল্লা, আনন্দ নারায়ণ *মেরি হাদিসে উমরে গ্রীজান*, এলাহাবাদঃ ইণ্ডিয়া প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩ খ্রি. ।

আবদুল্লাহ, ড. আই-এ *সত্বীয়াপাল আনন্দ কি নজম নিগারি*, দিল্লীঃ পাবলিশার্স এ্যাণ্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, ২০০৮ খ্রি. ।

আনন্দ, সত্বীয়াপাল *ওয়াক্ত লা ওয়াক্ত*, দিল্লীঃ প্রিন্স অফসেট প্রিন্টার্স, ১৯৯৩ খ্রি. ।

” ” *মুঝে না কর বিদা*, নয়াদিল্লীঃ ইসতেয়ারে পাবলিকেশন্স, ২০০৫ খ্রি. ।

” ” *লাহু বোলতা হ্যা*, নয়াদিল্লীঃ আসিন অফসেট প্রিন্টার্স, ১৯৯৭ খ্রি. ।

” ” *তথাগত নজমী*, দিল্লীঃ পাবলিশার্স এ্যাণ্ড এডভারটাইভার্স, ২০১৫ খ্রি. ।

খাতুন, সাজ্ঞিদা *বিসুবি সাদী কে উর্দু মুসন্নেফীন*, আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০৪ খ্রি. ।

আহমেদ, মোহাম্মদ জামিল *উর্দু শায়েরী কি মুখতাছার তারিখ*, লক্ষ্ণৌঃ নওল কিশোর, ১৯৪১ খ্রি. ।

আর রায়না *পণ্ডিত মেলারাম অফা হায়াত ও খেদমত*, নয়াদিল্লীঃ এনসেস অফসেট প্রিন্টার্স, ২০১১ খ্রি. ।

বাদকি, দিপক *উর্দু কে গায়রে মুসলিম আফসানা নিগার*, শ্রীনগরঃ মীজান পাবলিশার্স এণ্ড ডিসট্রিবিউটার্স, ২০১৭ খ্রি. ।

” ” *কেদারনাথ শর্মা কে সিধি সাদি কাহানিয়া অসরি শু'য়ুর*, শ্রীনগরঃ মিজান পাবলিশার্স, ২০০৮ খ্রি. ।

রিজভী, সেলিম হামিদ *উর্দু আদব কী তারাক্কি মে ভুপাল কা হিস্‌সা* (ভুপালঃ বাবুল ইলম পারলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি. ।

নিগার, সুম্বুল *উর্দু শায়েরী কা তানক্বীদী মুতালি'আ*, আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯৫ খ্রি. ।

পণ্ডিত দয়াশংকর, নাসিম *মছনবী গুলজারে নাসিম*, লক্ষ্ণৌঃ উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমি, ১৯৯৫ খ্রি. ।

রফিক, সৈয়দ *হিন্দুয়োঁ মে উর্দু*, ১ম খণ্ড, লক্ষ্ণৌঃ নাসিম বুক ডিপো,

তা. বি. ।

শ্রীভাস্টু, গুনপত সাহায়ে — *উর্দু শায়েরী কে ইর্তেকা মে হিন্দুঁ শু'আরা কা হিস্‌সা*, এলাহাবাদঃ ইসরার কারিমী প্রেস, ১৯৬৯ খ্রি. ।

বারক, মুন্সী জাওলা প্রসাদ — *মছনবী বাহার*, লক্ষ্ণৌঃ নওল কিশোর, ১৯১১ খ্রি. ।

লক্ষ্ণৌবী, ইশরাত — *হিন্দু শু'আরা*, লক্ষ্ণৌঃ নামী প্রেস, ১৯৩১ খ্রি. ।

বারক, শিয়াম সুন্দর — *সালকে মারওবিদ*, লক্ষ্ণৌঃ নওল কিশোর, ১৯২২ খ্রি. ।

উদ্দিন, ফয়েজ — *তাজকিরায়ে হিন্দু শু'আরায়ে বিহার*, বিহারঃ ন্যাশনাল বুক সেন্টার, ১৯৬২ খ্রি. ।

আদীব, সৈয়দ লতিফ হুসেইন — *চান্দ শু'আরায়ে বারেলী*, লক্ষ্ণৌঃ মারকীয আদব উর্দু, ১৯৭৬ খ্রি. ।

আব্দুস শুকর — *দওরে জাদীদ মে চান্দ মুন্তাখাব হিন্দু শু'আরা*, লক্ষ্ণৌঃ কিতাব খানা, ১৯৪৩ খ্রি. ।

হাবীব জিয়া — *মহারাজা স্যার কিশন প্রসাদ শাদঃ হায়াত অওর আদবী খেদমত*, হায়দ্রাবাদঃ উর্দু একাডেমি, ১৯৭৮ খ্রি. ।

জীন, গীয়ানচাঁদ — *উর্দু মছনবী শিমালী হিন্দ মে*, আলীগড়ঃ আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, ১৯৬৯ খ্রি. ।

তারজি, আব্দুল মান্নান — *না'ত গোয়ানে গায়রে মুসলিম*, নয়াদিল্লীঃ বুক স্টোর প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮ খ্রি. ।

হাসমী, নাসির উদ্দিন — *দাকানী হিন্দু অওর উর্দু*, হায়দ্রাবাদঃ স্টেশন রোড, তা.বি. ।

ইবরত, মুন্সী গোরাখ প্রসাদ — *হুসনে ফিতরত, লক্ষ্ণৌঃ উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি. ।*

ওয়ারেনডী, আখতার — *বিহার মে উর্দু জবান ও আদব কা ইর্তেকা*, পাটনাঃ লাইবুল লেথু প্রেস, ১৯৫৭ খ্রি. ।

জায়দী, আলী জাওয়াদ — *উত্তর প্রদেশ মে উর্দু মারছিয়া নিগারী*, লক্ষ্ণৌঃ ইউনাইটেড বালাক প্রিন্টার্স, ২০০৩ খ্রি. ।

লক্ষ্ণৌবী, মীর্জা দিলগীর — *কুল্লিয়াতে মারছিয়া দিলগীর*, ১ম খণ্ড, লক্ষ্ণৌঃ মুন্সী নওল কিশোর, ১৮৮৮ খ্রি. ।

কাজমী, সৈয়দ আশুর — *উর্দু মারছিয়া কা সফর*, দিল্লীঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০৬ খ্রি. ।

আখতার, আজীম — *বিসুবী সাদী কে শু'আরায়ে দিল্লী*, ১ম খণ্ড, দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ২০০৫ খ্রি. ।

হুসাইনী, আলী আব্বাস — *উর্দু মারছিয়া*, লক্ষ্ণৌঃ উর্দু পাবলিশার্স, ১৯৭৩ খ্রি. ।

কৌসারী, দিলুরাম — *হিন্দু কী না'ত*, দিল্লীঃ খাজা হাসান নিজামী, ১৯৩৭ খ্রি. ।

লালজোয়ান, মুন্নী — *আয়না বাহুর*, কলকাতাঃ স্টার আর্ট প্রেস, তা. বি. ।

তোরাবী, ইরফান — *ছাবের সেকুয়াবাদী কে মারছিয়া অওর ছালাম*, কাশ্মিরঃ তোরাবী পাবলিকেশন্স, ২০০৮ খ্রি. ।

জলীল, জলীলুর রহমান — *বোরহানপুর কে আহাম মারছিয়া নিগার*, মুম্বাইঃ আল কমাল উর্দু ফাউন্ডেশন, ২০০৩ খ্রি. ।

আজাদ, ড. আসলাম — *উর্দু নাবেল আজাদি কে বা'দ*, নয়াদিল্লীঃ সীমনাথ প্রকাশন, তা. বি. ।

বুখারি, সাহিল — *উর্দু নাবেল নিগারি* (দিল্লীঃ আলহামরা পাবলিশার্স, ১৯৭২ খ্রি.), পৃ. ১১ ।

সুরুর, আলে আহমেদ — *তানক্বীদী ইশারে, লক্ষ্ণৌঃ ইদারায়ে ফুরুগে উর্দু, ১৯৬৪ খ্রি. ।*

ইবনে কানুল, প্রফেসর — *উর্দু আফসানা*, দিল্লীঃ কিতাবি দুনিয়া, ২০১১ খ্রি. ।

রইস, ড. কমর — *প্রেমচাঁদ শাখছিয়্যাত অওর কারনামে*, আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৩ খ্রি. ।

” ” — *প্রেমচাঁদ কা তানক্বীদী মুতালি'আ বাহাইসিয়াত নাবেল নিগার*, দিল্লীঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০৪ খ্রি. ।

” ” — *রতন নাথ সরশার*, নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৮২ খ্রি. ।

” ” — *বারক বারক*, শ্রীনগরঃ মিজান পাবলিশার্স, ২০০৯ খ্রি. ।

সারমাসত, ড. ইউসুফ — *প্রেমচাঁদ কি নাবেল নিগারি*, হায়দ্রাবাদঃ আলিয়াস ট্রিট্রেস পাবলিশার্স বুক, ১৯৮৪ খ্রি. ।

জাফরী, সরদার — *তারাক্কি পছন্দ আদব*, আলীগড়ঃ আঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু হিন্দ, ১৯৫৭ খ্রি. ।

প্রেমচাঁদ, মুন্সী — *বাজারে-হুসন*, দিল্লীঃ নিউ তাজ অফস পোস্ট, ১৯৫৬ খ্রি. ।

” ” — *গোশায়ে আফিয়াত*, প্রথম খণ্ড, দিল্লীঃ ইদারায়ে ফরুগে উর্দু, তা.বি. ।

” ” — *চৌগান হাস্তি*, প্রথম খণ্ড, লাহোরঃ দারুল আশায়াত পাঞ্জাব, ১৯৩৬ খ্রি. ।

” ” — *চৌগান হাস্তি*, ২য় খণ্ড, দিল্লীঃ আদবি মারকিয, তা. বি. ।

” ” — *বেওয়া*, দিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিডেট, ১৯৫৫ খ্রি. ।

” ” — *গবন*, ১ম খণ্ড, লাহোরঃ লাজপাতরায়ে ইন্ডাসট্রিজ, ১৯৩৯ খ্রি. ।

” ” — *ময়দানে আমল*, দিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া, ১৯৪৩ খ্রি. ।

” ” *ইন্তেখাবে আফসানা*, লক্ষ্মৌঃ উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমি, ১৯৯২ খ্রি. ।

” ” *সুজ ওয়াতন*, এলাহাবাদঃ তাহজীব নো পাবলিকেশনার, পৃ. ১৯৮০ খ্রি. ।

সৈয়দ, মুহাম্মদ আজিম *প্রেমচাঁদ কা ফন্নী ও ফিকরি মুতালি'আ*, দিল্লীঃ উত্তর প্রদেশ উর্দু একাডেমি, ১৯৮৪ খ্রি. ।

আফরাহিম, সগির *উর্দু আফসানা তারাক্কি পছন্দ তাহরিক সে ক্বাবল*, আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৯১ খ্রি. ।

রেজা, জাফর *প্রেমচাঁদ অওর তা'মির এ ফন*, এলাহাবাদঃ সাবিস্তার এশাহাগঞ্জ, ১৯৯৯ খ্রি. ।

সিদ্দিকী, ড. জহির আলী *আফসানে কে মি'মার*, দিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৯২ খ্রি. ।

বিধাভান, জগদীশ চন্দ্র *কৃষণ চন্দ্র শাখছিয়্যাত অওর ফন*, নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৯৩ খ্রি. ।

খুল্লার, কে কে *উর্দু নাবেল কা নিগার খানা*, নয়াদিল্লীঃ সীমানাত প্রকাশন, ১৯৮৩ খ্রি. ।

হায়াত ইফতেখার এম. এ. *কৃষণ চন্দ্র কে নাবেলোঁ মে তারাক্কি পছন্দি*, লক্ষ্মৌঃ নাসিম বুক ডিপো, ১৯৮২ খ্রি. ।

ওকার আজীম *দাস্তান সে আফসানে তক*, আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০৩ খ্রি. ।

ফারুকী, ড. মুহাম্মদ আহসান *উদু নাবেল কি তানক্বীদী তারিখ*, লক্ষ্মৌঃ ইদারায়ে ফুরুগে উর্দু, ১৯৬২ খ্রি ।

আহমেদ, আজীজ *তারাক্কি পছন্দ আদব*, দিল্লীঃ চমনবুক ডিপো, উর্দু বাজার, তা. বি. ।

কৃষণচন্দ্র *শিকাস্ত*, দিল্লীঃ মাতবুআ দিল্লী প্রিন্টিং রাকস, তা. বি. ।

” ” *তোফান কী কালিয়া* (বোম্বাইঃ বুক হাউস, ১৯৫০ খ্রি.), 'পেশ লফজ'

” ” *এক আওরাত হাজার দিওয়ানে*, দিল্লীঃ সিরালা বিসুবী সাদি, ১৯৬০ খ্রি. ।

” ” *দিল কি দাদিয়া সোগায়ি*, নয়াদিল্লীঃ বিসুবি সাদী দরিয়াগঞ্জ, ১৯৭৭ খ্রি. ।

” ” *হাম ওহাশী হ্যায়*, বোম্বেঃ কানব পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৪৯ খ্রি. ।

” ” *উলঝী লাড়কি কালে বাল*, হায়দ্রাবাদঃ আদবী টেস্টবুক ডিপো, ১৯৭০ খ্রি. ।

” ” *তালসিম খেয়াল*, দিল্লীঃ আরাভেলী পাবলিশার্স, ২০০৮ খ্রি. ।

” ” *আনদাতা*, দিল্লীঃ এশিয়া পাবলিশার্স, ১৯৯২ খ্রি. ।

” ” *নজারে*, লাহোরঃ কুতুবখানা আদবী দুনিয়া, ১৯৪০ খ্রি. ।

” ” *জিন্দেগী কে মোড় পর*, দিল্লীঃ এশিয়া পাবলিশার্স, ১৯৭৫ খ্রি. ।

জারিন, সালহা *উর্দু নাবেল কা সমাজি অওর সিয়াসি মুতালি'আ*, আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ২০০০ খ্রি. ।

আজমী, খলিলুর রহমান *উর্দু মে তারাক্কি পছন্দ আদবী তাহরিক*, আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৪ খ্রি. ।

মেহজাবিন, ড. *কৃষণচন্দ্র কি নাবেল নিগারি অওর নিসায়ি কিরদার*, নয়াদিল্লীঃ মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০০৮ খ্রি. ।

অশোক, প্রেমপাল *সরশার এক মুতালি'আ*, দিল্লীঃ আজাদ কিতাব ঘর, ১৯৬৪ খ্রি. ।

” ” *রতন নাথ সরশার হায়াত, শাখছিয়্যাত অওর কারনামে*, দিল্লীঃ তারাক্কি উর্দু ব্যুরো, ২০০০ খ্রি. ।

হুসাইন, ড. সৈয়দ লতিফ *রতন নাথ সরশার কি নাবেল নিগারি*, করাচীঃ আঞ্জুমান তারাক্কি উর্দু, ১৯৬১ খ্রি. ।

মুরতাজী, সৈয়দ সাফী *হামারে নসর নিগার, লক্ষ্মৌঃ নাসিম বুক ডিপো, ১৯৭৪ খ্রি. ।*

লক্ষ্মৌবী, রতন নাথ সরশার *ফাসানায়ে* আজাদ,নয়াদিল্লীঃ তারাক্কি উর্দু ব্যুরো, ১৯৮৬ খ্রি. ।

” ” *জামে সরশার, করাচীঃ মাকতুবায়ে আসলুব, ১৯৬১ খ্রি. ।*

” ” *সায়রে কোহসার*, ১ম খণ্ড, লক্ষ্মৌঃ মুন্সী নওল কিশোর, ১৯৩৪ খ্রি. ।

” ” *কামিনী*, লক্ষ্মৌঃ নাসিম সাজটপো, তা. বি. ।

” ” *তুফান বেতামিযি*, ১ম খণ্ড, লক্ষ্মৌঃ মাতবুআ শাম আউধ, তা. বি. ।

আলবী, ওয়ারেশ *রাজেন্দ্র সিং বেদি, দিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৮৯ খ্রি. ।*

আশরাফী, প্রফেসর ওহাব *রাজেন্দ্র সিং বেদি কি আফসানা নিগারি*, দিল্লীঃ এডুকেশনাল পাবলিসিং হাউস, ২০০১ খ্রি. ।

গীয়ানচাঁদ, প্রফেসর *উপেন্দ্র নাথ অশোক*, দিল্লীঃ এডুকেশনাল বুক হাউস,

২০০ খ্রি. ।

” ” *রামলাল মেরী নজর মে*, লক্ষ্মৌঃ মাহনামা নয়া দুর, ১৯৯৬ খ্রি. ।

চন্দন, গুরবচন *জমনাদাস আখতার শাখছিয়্যাত অওর আদবি ও সাহাফতি খেদমত*, দিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৯৬ খ্রি. ।

নরায়ণ, প্রফেসর গোপীচাঁদ *বালুনাথ সিং কে বেহতেরিন আফসানে*, দিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ১৯৯৫ খ্রি. ।

” ” *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ১৯৯৬ খ্রি. ।

” ” *উর্দু আফসানা রেওয়ায়াত অওর মাসায়েল*, দিল্লীঃ এডুকেশনাল পাবলিসিং হাউস, ২০১৩ খ্রি. ।

” ” *হিন্দুস্তান কী তাহরিক আজাদি অওর উর্দু শায়েরী*, নয়াদিল্লীঃ 'ফুরুগে উর্দু জবান, ২০০৩ খ্রি. ।

” ” *ফেরাক গোরাখপুরী শায়ের নক্কাদ, দানেশওর*, নয়াদিল্লীঃ সাহিত্য একাডেমি, ২০০৮ খ্রি. ।

” ” *হিন্দুস্তান কে উর্দু মুসন্নেফীন অওর শু'আরা*, দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ১৯৯৬ খ্রি. ।

নাকবী, ইমাম মর্তুজা *উর্দু আদব মে শিখোঁ কা হিস্‌সা*, দিল্লীঃ কোহিনুর প্রেস, ১৯৭০ খ্রি. ।

আবিদ, কৃষণ গোপাল *বুন্দ অওর সমুন্দর*, দিল্লীঃ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯৬৫ খ্রি. ।

নুরশাহ *জম্মু কাশ্মির কে উর্দু আফসানা নিগার*, কাশ্মিরঃ মিজান পাবলিশার্স, ২০১১ খ্রি. ।

আরা, নাসিম *উর্দু মুখতাছার আফসানে কা ইর্তেকা*, এলাহাবাদঃ তাজ অফসেট প্রেস, ১৯৮৫ খ্রি. ।

সাগর, রমানন্দ *অওর ইনসান মর গিয়া*, বোম্বেঃ নো হিন্দ পাবলিশার্স লিমিডেট, ১৯৪৮ খ্রি. ।

সরোরী, প্রফেসর আব্দুল কাদের *কাশ্মির মে উর্দু*, শ্রীনগরঃ জম্মু ইন্ড কাশ্মির একাডেমি, ১৯৮৪ খ্রি. ।

সেলিম, মাজহার *সুরেন্দর প্রকাশ শাখছিয়্যাত অওর ফন*, মুম্বাইঃ তাকমিল পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি. ।

দিলীপসিং *দিল দরিয়া, নয়াদিল্লীঃ শানে হিন্দ পাবলিকেশন্স, ১৯৯২ খ্রি. ।*

হুসেইন, মীর্জা জাফর *বিসুবি সাদী কে বা'জ লাক্ষৌবী আদিব*, লক্ষ্মৌঃ উত্তর

প্রদেশ উর্দু একাডেমি, ১৯৭৮ খ্রি. ।

আফাক, জহীর — *রাম লাল কী আফসানা নিগারী*, নয়াদিল্লীঃ শানে হিন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯২ খ্রি. ।

রুবানী, আবু জহীর — *জোগিন্দর পাল কি আফসানা নিগারি*, দিল্লীঃ এডুকেশনাল পাবলিসিং হাউস, ২০১৫ খ্রি. ।

বিক্রম, নন্দ কিশোর — *হানস রাজ রাহবার কে আফসানে*, দিল্লীঃ সঞ্জু অফসেট প্রিন্টিংস, ২০১৩ খ্রি. ।

হুসাইন, ড. মোহাম্মদ শাহেদ — *ড্রামা ফন অওর রেওয়ায়াত*, দিল্লীঃ এডুকেশনাল পাবলিসিং, ১৯৯৪ খ্রি. ।

সাবেহ, ড. শাহনাজ — *উর্দু ড্রামা আজাদি কে বা'দ*, লক্ষৌঃ নসরত পাবলিশার্স, হায়দারী মার্কেট আমিন আবাদ, ২০০৩ খ্রি. ।

উদ্দীন, ড. জহুর — *হাকিকত নিগারি অওর উর্দু ড্রামা*, দিল্লীঃ সীমানাত প্রকাশন, ১৯৮৪ খ্রি. ।

অশোক, উপেন্দ্র নাথ — *তোলিয়ে*, এলাহাবাদঃ নয়া ইদারা, ১৯৭৯ খ্রি. ।

” ” — *পড়োসন কা কোট, এলাহাবাদঃ নয়া ইদারা, ১৯৮৫ খ্রি. ।*

বেদি, রাজেন্দ্রসিং — *সাত খেল, নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে লিমিটেড, ১৯৮১ খ্রি. ।*

” ” — *বেজান চীজেঁ, লাহোর: পাঁচদরিয়া নিসবত রোড, ১৯৪৩ খ্রি. ।*

সিং, দিলীপ — *মোম কী গুড়িয়া*, নয়াদিল্লীঃ শানে হিন্দ পাবলিকেশন্স, ১৯৯২ খ্রি. ।

ললিত, ড. শাবাব — *কলম কারিশ্মে*, নয়াদিল্লীঃ মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০১৩ খ্রি. ।

ফাতেমা নাসির, ড. ফেরদোসী — *মুখতাছার আফসানা কা ফন্নী তাজজিয়া*, দিল্লীঃ আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, ১৯৭৫ খ্রি. ।

জমশেদপুরী, ড. আসলাম — *উর্দু আফসানা তা'বিদ ও তানক্বিদ*, নয়াদিল্লীঃ মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০০৬ খ্রি. ।

” ” — *তারাক্কি পছন্দ উর্দু আফসানা অওর চান্দ আহাম আফসানা নিগার*, দিল্লীঃ মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০০২ খ্রি. ।

রেহানা খান, ড. নিগহাত — *উর্দু মুখতাছার আফসানাঃ ফন্নী ও তেকনিকী মুতালি'আ*, দিল্লীঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৮৬ খ্রি. ।

মিত্তল, প্রেম গোপাল — *প্রেমচাঁদ কে সো আফসানে*, নয়াদিল্লীঃ মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০০৮ খ্রি. ।

কুরেশী, ড. ওয়াজেদ — *প্রেমচাঁদ কে আফসানোঁ মে হাকীকত কা আমল*, নয়াদিল্লীঃ মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ২০০৩ খ্রি. ।

সাদিক, ড. — *তারাক্কি পছন্দ তাহরিক অওর উর্দু আফসানা*,দিল্লীঃ উর্দু মজলিস, ১৯৮১ খ্রি. ।

শাহীন, ফারজানা — *উর্দু কে নুমায়েন্দাহ আফসানা নিগার*, কলকাতাঃ ডায়মন্ড আর্ট প্রেস, ২০০৯ খ্রি. ।

আজমি, ড. শফিক — *কৃষণচন্দ্র কি আফসানা নিগারি*, গোরাখপুরঃ ইনসিয়েট প্রেস, ১৯৯০ খ্রি. ।

মানজার, শাহজাদ — *কৃষণচন্দ্র কে দাস বেহতেরিন আফসানে*, দিল্লীঃ বুক কর্পোরেশন, ২০০৪ খ্রি. ।

আজীম, ওকার — *নয়া আফসানা*, আলীগড়ঃ এডুকশনাল বুক হাউস, ১৯৮২ খ্রি. ।

হুসেন, ড. মোহাম্মদ — *কৃষ্ণচন্দ্র নাম্বার শায়ির শুমার* ৩-৪, বোম্বেঃ কাসরুল আদব, ১৯৭৭ খ্রি. ।

আসকরী, মুহাম্মদ হুসাইন — *কৃষণচন্দ্র নাম্বার শায়ের শুমারা* ৩-৪, বোম্বেঃ কাসরুল আদব, ১৯৬৭ খ্রি. ।

বেদি, রাজেন্দ্র সিং — *আপনে দুখ মুঝে দে দো*, নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৯৭ খ্রি. ।

” ” — *গ্রহণ*, লাহোরঃ মাকতুবায়ে উর্দু, তা.বি. ।

সিদ্দিকী, আকবর উদ্দিন — *প্রেমচাঁদ অওর উন কি আফসানা নিগারি*, হায়দ্রাবাদঃ আঞ্জুমানে তিলসানীন উসমানীয়াবাগ, ২০০৩ খ্রি. ।

নাদবী, হামিদুল্লাহ — *উর্দু কে চান্দ নামওয়ার আদীব অওর শায়ের*, দিল্লীঃ মডার্ণ পাবলিসিং হাউস, ১৯৯৫ খ্রি. ।

খান্না, ভারতচাঁদ — *তেরে নিমকাশ*, হায়দ্রাবাদঃ জিন্দা দেলানে, ১৯৭২ খ্রি. ।

নিরোলা, শামশীর সিং — *জালে*, দিল্লীঃ বারকী প্রেস, তা.বি. ।

বার্মা, বিলরাজ — *ইয়াদোঁ কে ঝারোকে*, দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, তা.বি. ।

মেহদি, প্রফেসর সুগরা — *উর্দু আদব মে দিল্লী কী খাতুন কা হিস্‌সা*, দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ২০০৬ খ্রি. ।

টালা, মানিক — *গুনাহ কা রেস্তা*, আলীগড়ঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড, ১৯৭৪ খ্রি. ।

আখতার, আজীম — *বিসুবি সাদী কে শু'আরায়ে দিল্লী*, ২য় খণ্ড, দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, তা. বি. ।

সিং, অমর — *তৈয়ারি*, দিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিডিটেড, ১৯৮০ খ্রি. ।

গোস্বামী, সাবিত্রী — *দরদ কে ফাসলে, পুনেঃ আসবাক পাবলিকেশন্স, ২০১৪ খ্রি. ।*

সুজ, নরেন্দ্রনাথ	*আফক কে উস পর*, নয়াদিল্লীঃ আনিস অফসেট প্রিন্টার্স, ১৯৯৯ খ্রি. ।
হুদা, সরোয়ারুল	বিলরাজ *মিনরা কা এক না তামাম সফর*, দিল্লীঃ আরশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৫ খ্রি. ।
সুরী, বিজয়	*এক নাও কাগজ কি*, নায়াদিল্লীঃ অজয় পাবলিশার্স, ১৯৬৫ খ্রি. ।
বখশ, বিলরাজ	*এক বুন্দ জিন্দেগী*, জম্মু ও কাশ্মিরঃ আওশীন পাবলিসিং হাউস, ২০১৪ খ্রি. ।
কোরেশী, ইমারান	*বাংগাল মে উর্দু আফসানা আগাজ তা হাল*, ১ম খণ্ড, আসানসোলঃ তানবীর বুকডিপো, ২০১৩ খ্রি. ।
সিং, দিলীপ	*গোশে মে কফস কে*, নয়াদিল্লীঃ নয়ী আওয়াজ, ১৯৯২ খ্রি. ।
নুরী, ফাহিম উদ্দিন	*ফনে মাজমুন নিগারি*, দিল্লীঃ আল ইমান বুকডিপো, তা. বি. ।
দেহলবী, আল্লামা আখলাক	*মাজমুন নিগারি*, দিল্লীঃ আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, ১৯৬৮ খ্রি. ।
কাদরী, ড. সৈয়দ আহমদ	*উর্দু সাহাফত বিহার মে*, বিহারঃ মাকতুবায়ে গোশীয়া, ২০০৩ খ্রি. ।
খোরশেদ, আব্দুস সালাম	*ফনে সাহাফত*, করাচীঃ আঞ্জুমানে তারাক্কি উর্দু, ১৯৬৪ খ্রি. ।
নদোবী, নূরুল ইসলাম	*রেহনুমায়ে সাহাফাত*, পাটনাঃ প্রিন্ট মিডিয়া, ২০১২ খ্রি ।
দেহলবী, আনওয়ার আলী	*উর্দু সাহাফাত*, দিল্লীঃ উর্দু একাডেমি, ২০০০ খ্রি. ।
ভট্টাচার্য, শান্তি রঞ্জন	*বাঙ্গাল মে উর্দু সাহাফাত কী তারিখ*, কলকাতাঃ মাগরেবি বাঙ্গাল উর্দু একাডেমি, ২০০৩ খ্রি. ।
মাসবাহী, ড. আফজাল	*উর্দু সাহাফাত আজাদি কে বা'দ*, দিল্লীঃ আরশিয়া পাবলিকেশন্স, ২০১৩ খ্রি. ।
জাফরী, ড. সৈয়দ আখতার	*আগ্রা মে উর্দু সাহাফাত*, আগ্রাঃ মীর্জা গালিব রিসার্চ একাডেমি, ২০১৪ খ্রি. ।
খান, এম. জিব	*প্রফেসর জগন্নাথ আজাদ শাখছিয়্যাত অওর আদবী খেদমত*, নয়াদিল্লীঃ মাকতুবায়ে জামিয়া লিমিটেড-জামিয়া নগর, ১৯৯৪ খ্রি. ।
আজীম, সৈয়দ ওকার	*হামারে আফসানা নিগার*, রামপুরঃ সাউলাত পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৩৫ খ্রি. ।
সিদ্দিকী, আজীম আলশান	*আফসানা নিগার প্রেমচাঁদ তানক্বীদী ও সমাজী মুহাকুমা*, দিল্লীঃ এডুকেশনাল পাবলিসিং হাউস, ২০০৬ খ্রি. ।
	ইন্তেখাবে মাঞ্জুমাত, ২য় খণ্ড, লক্ষ্মৌঃ উত্তর প্রেস উর্দু একাডেমি, ১৯৯৭ খ্রি. ।

বাংলাগ্রন্থ

অনীক মাহমুদ, *বাংলা কথা সাহিত্যে শওকত ওসমান*, রাজশাহীঃ ইউরেকা বুক হাউস, ১৯৯৫ খ্রি. ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, *সাহিত্যে ছোটগল্প*, কলিকাতাঃ ডি.এম লাইব্রেরী, ১৩৭৪ বাং. ।

গুপ্ত, প্রদীপ দাশ *প্রেমচাঁদ শত বার্ষিকী সংকলন*, কলিকাতাঃ অন্বেষা, ১৯৮২ খ্রি. ।

ইংরেজিগ্রন্থ ও লিংক

১. E. M Forster, *Aspects of the novel* (London: 1962), p. 34.
২. William Henry Hudson, *A Introduction truth study of Literature* (london: Grorge G. Harrapand, Co. Ltd. 1949), p. 236.
৩. Urduchannel.in/firaq-ki-infradiat-abdulbari-qasmi/
৪. rekhta.org/poets/suraj-narayan-mehr/profile? lang-ur
৫. Pervezahmedazmi.blogspot.com/20/3/03/chakbast-ke-kalaam-me-manzar-o-jazbat-19.htm/
৬. www.jahahe-urdu.com/chakbast-patiiot-urdu-poet/
৭. Urdunotes.com/lesson/masnavi-gulzar-e-naseemkhulasa-in-Urdu/
৮. https://www.mukaalma.com/90293/
৯. hamariweb.com/articles/72442
১০. http://www.punjnud.com/viewpage.aspx?Book ID=4423&BookpageID=113321& BookpageTitle=Fasana%20Azad
১১. Urdulinks.com/Urj/?P=3263
১২. www.sheroadab.org/20/8/4/07/blog-past-19. html
১৩. Urdunotes com/lesson/munshi-premchand-ki-afsana-nigari-in Urdu
১৪. dawnnews. tv/news/1053525
১৫. WWW.qaumiawaz.com/literature/rad-story-Jamun-ka-ped-which-is-now-excluded-from-icse-syllabus
১৬. http://urdufiction.com/mazamin.detail?zid=OTM=
১৭. Urdulinks.com/Urj//?p=1768
১৮. bn.wikipedia.org/wiki/প্রবন্ধ
১৯. britannica.com/art/essay
২০. bn.wikipedia.org/wiki/সংবাদ
২১. bn.wikipedia.rog/wiki/journalism
২২. http://www.urdulinks.com/urj/?p=1598

পত্রিকা

অরণী, আখতার *শায়ের কৃষণ চন্দ্র নাম্বার*, বোম্বেঃ কাসরুল আদব, ১৯৬৭ খ্রি. ।

বিবাক, হারুন বি এ. গুলশান খান্না নাম্বার ০৫৯, আগ্রাঃ সাব্বির সাতীর কম্পাউন্ড, ২০১১ খ্রি. ।

জাফরী, সৈয়দ জামির চাহার সোঃ অনিল ঠাকুর নাম্বার ২০, রাওয়ালপিন্ডিঃ ফয়জুল ইসলাম প্রিন্টিং প্রেস, ২০১১ খ্রি. ।

সিং, রতন *চাহার সো নাম্বার*-১৯, রাওয়ালপিন্ডিঃ ফজল ইসলাম প্রিন্ট, ২০১০ খ্রি. ।

বেগ, মীর্জা হামিদ *শায়ের কে হাম আছর উর্দু আদব নাম্বার শায়ির* (৯৭-৯৮), আলীগড়ঃ এডুকেশনাল বুক হাউস, ১৯৭৬ খ্রি. ।

থিসিস

করিম, ড. মোঃ রেজাউল *মুন্সী প্রেমচাঁদের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ*, ঢাকাঃ আবিষ্কার, ২০১৪ খ্রি. ।

উদ্দীন, ড. মোঃ নাসির *আলতাফ হুসাইন হালীঃ উর্দু সাহিত্যে তাঁর অবদান*, পিএইচ.ডি থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১ খ্রি. ।

উর্দু সাহিত্যে অমুসলিমদের অবদান

(CONTRIBUTION OF NON-MUSLIMS IN URDU LITERATURE)

সারসংক্ষেপ

উর্দু একটি জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত ভাষা। তবে অনেকে মনে করেন উর্দু কেবল মুসলমানদের ভাষা। আসলে তা সত্য নয়, ভাষার কোন ধর্ম নেই। সব ভাষায় সকল ধর্মের মানুষ কথা বলতে, লিখতে ও জ্ঞান চর্চা করতে পারে। যেমন আরবি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মাতৃভাষা হতে পারে না। সংস্কৃত বিশ্বজুড়ে হিন্দুদের ভাষা হতে পারে না। কোন ভাষার উপর কোন ধর্মের একচেটিয়া কোন অধিকার নাই। কোন ভাষার উন্নতি হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো তার সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা। উর্দু সাহিত্যে মুসলমানরা যেমন অবদান রেখেছেন অমুসলিমরা তেমনি অবদান রাখার চেষ্টা করেছেন। উর্দু কবিতা হোক বা গদ্য, সমালোচনা বা গবেষণা, রসিকতা সাহিত্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে অমুসলিম লেখকরা জড়িত রয়েছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের পাশাপাশি উর্দু সাহিত্যের উন্নতি, বিকাশ, অগ্রগতি এবং প্রচারে হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লোকেরাও বিশেষ অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতার আগে উর্দু ছিল অমুসলিমদের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর চিন্তাভাবনা ও মনের ভাব প্রকাশের সৃজনশীল মাধ্যম। কবিতা বা গদ্যই হোক, সমস্ত অমুসলিম লেখকদের দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। যাদের সৃজনশীল প্রচেষ্টা উপেক্ষা করা যায় না। তারা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেছেন।

গজল উর্দু কাব্যসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় শাখা। এই শাখায় যে অমুসলিম কবি বিশেষ অবদান রেখেছেন তিনি হলেন- ব্রজ নারায়ণ চাকবাস্ত। তিনি উর্দু কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে একজন জাতীয় কবি। তিনি উর্দু গজলে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তিনি ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম গজল রচনা শুরু করেন যা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল।তারপর থেকে তিনি একটানা বহু উৎকৃষ্ট গজল রচনা করেন। তার গজলের বিষয়বস্তু ছিল বেশির ভাগই দেশপ্রেম। তিনি দেশকে ছাড়া কোন কিছুই ভাবতে পারতেন

না। দেশের মাটি ও মানুষ সবই তার কাছে আপনজন। সে কারণে তিনি দেশকে নিয়ে অনেক গজল রচনা করেছেন।

অধ্যাপক জগন্নাথ আজাদ অন্যতম সম্মানিত বিশেষজ্ঞ হলেও তিনি একজন সুপরিচিত গজলকার। জগন্নাথ আজাদ অতি অল্প সময়ের মধ্যে গজলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। জগন্নাথ আজাদ যে সময়ে গজল লিখতে শুরু করেন, সে সময় শুধু রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল না সাহিত্যের অবস্থানও বর্তমান ছিল। ওই সময়ে কবিগণ সমাজের বাস্তব চিত্র ও দুঃখের বিষয়ে গজল রচনা করতেন। আজাদ এ বিষয়ে কিছু একমত ছিলেন; কিন্তু তার গজলে প্রেমের বিষয়টি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত হয়েছে।

উপরে আলোচিত কবিগণ ছাড়া আরো অনেক অমুসলিম কবি ছিলেন, যারা উর্দু গজলে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। তারা হলেন- আনন্দ নারায়ণ মোল্লা, পণ্ডিত মেলা রাম ওফা, সুরুজ নারায়ণ মেহের, তিলোকচাঁদ মাহরুম, পারভেজ প্রকাশ নাথ, বেইতাব আলীপুরী রমানন্দ, ফেরাকী দরিয়াবাদী, জাযব পণ্ডিত বাখুন্দর রাও, জোশ বাদীউনী রাধারমন, জাওহার বাজনূরী চন্দর প্রকাশ, সাহেব হোসিয়ারপুরী ওম প্রকাশ, ছাবের আবুহরী সরদার রাম, শয়দা ইবনালুবী বেনারসী দাস, ক্রিষনলাল মোহন, নানক লক্ষ্ণৌবী প্রমুখ।

ফেরাক গোরাখপুরীর কবিতা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। কারণ তার পিতা ছিলেন একজন কবি। শৈশবকাল থেকে তিনি কবিতা মেজাজে ছিলেন। তবে ফেরাক ১৯১৮ খ্রি. থেকে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে নজম লিখা শুরু করেন। তিনি অসীম জ্ঞান সৃষ্টিকারী কবিতার কবিদের মধ্যে অনন্য হিসেবে গণ্য হন। ফেরাক গোরাখপুরী গজল বাদে কবিতার আরেকটি শাখায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন তা হলো নজম। এই শাখায় ফেরাক গজলের মতই সুপরিচিত হন। ফেরাক প্রেমমূলক, প্রাকৃতিক দৃশ্য, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক এবং জীবনীমূলক বিষয়ে কবিতা লিখেছেন।

তিলোকচাঁদ মাহরুম উর্দু সাহিত্যের দুনিয়ায় নিজের জায়গা তৈরি করেছেন কবিতার মাধ্যমে। মাহরুম প্রকৃতপক্ষে একজন নজমের কবি। মাহরুম কবিতার জন্য পুরো

পৃথিবীতে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার খ্যাতি ও সম্মান কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করেছে। তিনি আখলাকী, সামাজিক, রাজনৈতিক, মাজহাবী, দেশ, জাতীয় এবং বাচ্চাদের বিষয়ে কবিতা রচনা করেছেন। মাহরুম সৌন্দর্য সন্ধানী একজন কবি। তার লিখায় সৌন্দর্য একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উর্দু নজমে দৃশ্যের বর্ণনা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপর অনেক সংবেদনশীল। তিনি গ্রামে বাস করতেন, তাই তার কাছে চিত্রের বর্ণনা খুব সহজেই আসে। তার বেশিরভাগ নজমই প্রাকৃতিক দৃশ্য বা চিত্রাবলীর উপর চিত্রায়িত হয়েছে।

উপরে উল্লেখিত কবিগণ ছাড়া উর্দু নজমে সে সকল অমুসলিম কবিগণ অসামান্য অবদান রেখেছেন, তারা হলেন- ফেরাক গোরাখপুরী, আনন্দ নারায়ণ মোল্লা, সত্বীয়াপাল আনন্দ, ব্রজ মোহন দাতাতারিয়া কাইফী, চৌধুরী জগত মোহন রাওয়ান, পণ্ডিত মেলা রাম ওফা, পণ্ডিত বদরীনাথ সুদর্শন, সুরজ নারায়ণ মেহের প্রমুখ।

মছনবী কাব্যসাহিত্যে বহু সংখ্যক অমুসলিম কবি অসাধারণ অবদান রেখেছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন- পণ্ডিত দয়া শংকর নাসিম। তার আসল নাম পণ্ডিত দয়া শংকর এবং উপাধি নাম নাসিম। তার পিতার নাম পণ্ডিত গংগা পরশাদ কোল যিনি লক্ষ্মৌতে বসবাস করতেন। তিনি ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি گلزار نسیم(গুলজারে নাসিম) মছনবীটি রচনা করে বিখ্যাত হয়েছেন। 'গুলজারে নাসিম' মছনবী পণ্ডিত দয়াশংকর নাসিমের একটি প্রেমের কবিতা। এই কবিতার মূল গল্পটি ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে এজাতুল্লাহ বাঙ্গালী ফারসি ভাষায় 'কাসন গুল বাকাওলী' নামে তৈরি করেছিলেন। তৃতীয় বারের মতো পণ্ডিত দয়াশংকর নাসিম উর্দু কবিতাটি পরিবেশন করেছিলেন এবং ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে এটি 'গুলাজারে নাসিম' মছনবী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন।

উপরে আলোচনা করা হয়েছে এমন কবি ছাড়া মছনবী সাহিত্যে যারা অশেষ অবদান রেখেছেন তারা হলেন- আশফাত পণ্ডিত অমরনাথ, আশোক প্রেমপাল দেহলবী, আমীর মুন্সী জাওলা শঙ্কর, ইনতেজার মুন্সী পুরাণচাঁদ, আঞ্জুম মুন্সী গীরধারী লাল, মুন্সী সুরজ

বখশ, বারক মুন্সী জাওলা প্রসাদ, শিয়াম সুন্দরলাল, বাশাশ মুন্সী দেবী প্রসাদ, বাহার মুন্সী বাঙ্গে বিহারী লাল, বেইতাব মুন্সী জোগীশর নাথ, বেদাল মুন্সী বাহারী লাল, মুন্সী গুণ্ডদয়াল, মুন্সী রাম সাহায়ে, জিগর শিয়াম মোহনলাল, জিনু চন্দ্রকা প্রসাদ, জোহার রায়ে জোহার সিং, মুন্সী বামন লাল, চমন মুন্সী রাং লাল, চমন মুন্সী সাদী লাল লক্ষ্ণৌ, চমন মুন্সী সীতাপ্রসাদ, হাযীন মুন্সী গোপাল, হায়বত পণ্ডিত আজুধী প্রসাদ, খর্দ মুন্সী রাজা রাম, খাস্তা মুন্সী জয়নাল, মুন্সী জগন্নাথ লাল খোশতার, বাবু আমর সিং খুশগু, লালা ভাজুয়াল সিং বাহাদুর, মুন্সী শংকর দাস, দৌলত সিং, বিলাজী তাবক যারাহ, বালুয়ান সিং বাহাদুর, মুন্সী ভাগোনাথ রায় রাহাত, মুন্সী হুব লাল, সারী মাতকাশী গহর, মুন্সী জগোয়াল দয়াল, মুন্সী ললাত প্রসাদ, অমরাও সিং মায়েল, লালা সারী ক্রিষণ, লাল ইবনী প্রসাদ, গোলাব সিং, পণ্ডিত দীনানাথ, মুন্সী লালা জিসবন্ড় রায়, মৌলচাঁদ নেহাল, মুন্সী বাসেসুর প্রসাদ, মেহের দরগা প্রসাদ, জানকী প্রসাদ, মুন্সী নেহাল চাঁদ নেহাল, মুন্সী মনিয়ালাল, মুন্সী খীম নারায়ণ রন্দ,মুন্সী জগৎ মোহন লাল, মুন্সী দেবী প্রসাদ, মুন্সী ইকবাল বারমা, পণ্ডিত রতন নাথ সরশার, মুন্সী খুশী লাল, মুন্সী রামরায়, মুন্সী ভায়ানী প্রসাদ, মুন্সী বাসাওন লাল সাদা, পণ্ডিত পীম নারায়ণ শাকর, পণ্ডিত শিবনাথ কোল, লাঝমন দাস শায়েক, সালিক রাম সালিক, মুন্সী কন্দন লাল শর্মা, মুন্সী বানোয়ারা লাল, মুন্সী লালতা প্রসাদ, মুন্সী লাঝমী নারায়ণ, মুন্সী কানিহা লাল, মুন্সী ছোটাম লাল তারা, মুন্সী দেবী প্রসাদ আবদ, বাবু নোল সিং আজীজ, মুন্সী রাম প্রসাদ, মুন্সী রহকীর প্রসাদ, লালা খোদাবখশ, মুন্সী ভোলানাথ ফারগ, মুন্সী শংকর দয়াল, মুন্সী গোবিন্দ প্রসাদ, মুন্সী প্রভুদয়াল, মুন্সী জোহার লাল প্রমুখ।

দিলগীর লক্ষ্ণৌবী তার সময়ের একজন বিখ্যাত মারছিয়ার কবি। দিলগীর লক্ষ্ণৌবী এর আসল নাম লালা নগুলাল এবং তার উপাধি তারব। তার বাবার নাম ছিল মুন্সী রাসওয়া রাম। তিনি ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৬৯ বছর বয়সে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্ণৌতে মৃত্যুবরণ করেন। দিলগীর কারবালার শাহাদাত ছাড়াও মুসলিম, ইমাম হুসেন, হযরত আলী, জনাবা ফাতেমা জোহরা (রা.), রাসুলুল্লাহ (সা.), জনাবা সাকিনা

প্রমুখের অবস্থার বিষয়বস্তু নিয়ে মারছিয়া লিখেছেন। দিলগীর ঐ সময়ের বিখ্যাত মারছিয়া কবি ছিলেন। তার সমসাময়িক কবিদের চেয়ে তার কথাটি আর্তনাদে অতুলনীয় শক্তি ছিল এবং তিনি ছিলেন শোকের প্রধান।

গোপীনাথ আমন একজন বড় মাপের মারছিয়ার কবি ছিলেন। তিনি ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর লক্ষ্মৌর এক পাড়া ঘোশ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম জনাব মাহাদি প্রসাদ। যিনি উর্দু ও ফারসিতে কবিতা আবৃত্তি করতেন। তিনি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। আমন এর বাড়িতে সাহিত্যের পরিবেশ ছিল, যাতে তিনি ছোটবেলা থেকেই কবিতা আবৃত্তি করতে পেরেছিলেন। তার রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। চিন্তার প্রক্রিয়াটি তাকে হোসেন ধর্মের ভক্ত করে তুলেছিল। তার অন্তরে মহাবিশ্বের শিক্ষক হযরত আলী এবং আলীর পরিবারের জন্য ভক্তির মোমবাতি জ্বালানো হয়েছিল।

যেসব অমুসলিম কবিগণ মারছিয়া লিখেছেন তাদের মধ্যে দুইজন কবির মারছিয়া আলোচিত হয়েছে। বাকী অমুসলিম মারছিয়া কবিগণ হলেন- জাহিন লক্ষ্মৌয়ী, রাজা উলফাত রায়, রাজাধনপত রায়, গোপীনাথ আমল লক্ষ্মৌয়ী, দিলু রাম, রূপকুমারী, নানক লক্ষ্মৌবী, মুন্নীলাল জোয়ান, ফেরাকী দরিয়াবাদী, ছাবের সেকুয়াবাদী, নাথুনী লাল ওহাসী, লাল রাম প্রসাদ, কানুয়ার সীন মবতার, রাজা গীরধারী প্রসাদ, মহারাজা চান্দুলাল শাদান, লালতা প্রসাদ শাদ, রায়ে সাধুনাথ বালী, কাশেশ্বর প্রসাদ মনোয়ার, মহারাজা বালুয়ান সিং, সোয়ামী প্রসাদ, মাখন, জগন্নাথ আজাদ, ফেরাক গোরাখপুরী, তিলোকচাঁদ মাহরুম প্রমুখ।

উর্দু গদ্যসাহিত্যে প্রেমচাঁদের স্থান অনেক উর্ধ্বে। তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে উর্দু গদ্যসাহিত্যে চির স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি একাধারে উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, অনুবাদ, প্রবন্ধ, পত্রসাহিত্য দাপটের সাথে লিখে উর্দু গদ্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি একজন কলম সৈনিকের স্বাক্ষর রেখেছেন। মুন্সী প্রমচাঁদের প্রকৃত নাম ধনপত রায়;

কিন্তু উপন্যাস ও ছোটগল্পের জগতে তিনি প্রেমচাঁদ নামে পরিচিত। তিনি সাহিত্যের মধ্যে দরিদ্র মানুষের কথা বলার চেষ্টা করেছেন। তিনি তার সাহিত্য জীবনে ১৫টি উপন্যাস রচনা করেছেন।তার সাহিত্যে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক জাগরণের প্রতিচ্ছবি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে ভারতের অবহেলিত শোষিত মানুষের জীবনের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

উর্দু উপন্যাসের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন সরশার। সরশারের উপন্যাসের বিষয় লক্ষ্মৌর ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম অভিজাত শ্রেণি, ক্ষয়শীল সমাজে বিশৃঙ্ক্ষলা, বিলাসিতা, ভীরুতা, জড়তা ও তার পাশপাশি অন্তপুরের সম্ভ্রান্ত নারীদের চারিত্রিক গাম্ভীর্য, স্বামী প্রবণতা ও ঐতিহ্য পরায়ণতা। মুসলিম অন্তপুরের বেগম, সেখানকার দাসী বাদী, বাইরের পতিতা, চুড়ি বিক্রেতা, ধাত্রী, পুরুষদের মধ্যে নবাব, তোষামোদকারী, পণ্ডিত, লুচ্চা, চোর, আফিমখোর এসব বিচিত্র চরিত্রের মানুষ তার উপন্যাসে উপজীব্য বিষয়।

উপরোল্লেখিত ঔপন্যাসিক ছাড়া কৃষণচন্দ্র, রাজেন্দ্র সিং বেদি, উপেন্দ্র নাথ অশোক, জমনা দাস আখতার, বালুনাত সিং, কৃষণ গোপাল আবিদ, ঠাকুর পুঞ্ছি, মহেন্দ্র নাথ, নর সিং দাস নার্গিস, পণ্ডিত বদরীনাথ সুদর্শন, রমানন্দ সাগর, কাশ্মিরী লাল জাকির, তেজ বাহাদুর ভান, মালিক রাম আনন্দ, বিজয় সুরী, জ্যোতিশ্বর পথক, আনন্দ লেহের, দীপক কানুয়াল, দত্ত ভারতী, মোদন মোহন শর্মা, ডক্টর নরেশ, আশা প্রভাত, শরণ কুমার বার্মা, নন্দ কিশোর বিক্রম, সুরেন্দর প্রকাশ, শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্য ,সত্বীয়াপাল আনন্দ, দিলীপ সিং, গুলশান খান্না ,পুষ্করনাথ, অনিল ঠাকুর, কিরণ কাশ্মিরী, জতীন্দ্র বিল্লু, ডা. কেওয়াল ধীর, অমর মাল মুহী, সুব্রত লাল ব্রাক্ষ্মণ, পণ্ডিত কিশণ প্রসাদ কোল, গোবিন্দ প্রসাদ আফতাব, মজলূম কেথালুবী, শংকর স্বরূপ ভাটনাগীর, রামলাল, এম. এম রাজেন্দ, জোগিন্দরপাল, এম কে মেহতাব, রতন সিং, মোহন ইয়াবার, রামকুমার আবরুল, তাজুর সামরি, প্রেমনাথ পর দেশী, হানস রাজ রাহবার প্রমুখ অমুসলিম সাহিত্যিকগণ সার্থক উর্দু উপন্যাস রচনা করেন।

উর্দু গদ্য সাহিত্যে উপেন্দ্র নাথ অশোক একজন অনন্য সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক। তিনি উপন্যাস ও ছোটগল্পে অসামান্য অবদান রেখে উর্দু গদ্য সাহিত্যকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে যৎসামান্য ভূমিকা পালন করেছেন। উর্দু নাটকেও তার অবদান কম নয়। তিনি অনেকগুলো নাটক লিখে উর্দু গদ্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

করতার সিং দাগল ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে ১ মার্চ পাঞ্জাবের রাওয়ালপিন্ডিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ২৪ জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন। তার পিতার নাম জীবন সিং দাগল এবং মাতার নাম সতবন্ড় কেরি। প্রাথমিক শিক্ষা তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে করেছিলেন এবং পাঞ্জাব বিশ্বদ্যিালয় থেকে এম. এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তারপর তিনি অল ইন্ডিয়ার রেডিওতে চাকরি পেয়েছিলেন। সেখানে তিনি পাঞ্জাবি ও অন্যান্য ভাষায় প্রোগ্রাম চালিয়ে যান এবং সে সুবাদে অনেক নাটকও লিখেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় মোট সাতটি নাটক লিখেছেন।

এ ছাড়া অন্যান্য অমুসলিম নাট্য সাহিত্যিকদের মধ্যে ড. স্যামুয়েল, ব্রজ মোহন দাতাতারিয়া কাইফী, পণ্ডিত কিশন প্রসাদ কোল, পণ্ডিত বদরীনাথ সুদর্শন, গোবিন্দ প্রসাদ আফতাব, প্রেমনাথ পরদেশী,তাজুর সামরি, শংকর স্বরূপ ভাটনাগীর, রেতী সরণ শর্মা, বিজয় সুমন সুসান, রামকুমার আবরুল, কুমার পাশী, বীরেন্দ্র পাটোয়ারী, উপি শাকির, কুলদ্বীপ রানা, সোমনাথ যাতশী, দিলীপ সিং, অনিল ঠাকুর, জিডাসমী জামুর, দয়ানন্দ কাপুর, সরদারী লাল নাশতর, কাহন সিং জামাল, মনোহরী রায় জম্মুর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

কৃষণচন্দ্রকে উর্দু সাহিত্যের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বহুমুখী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হয় যিনি সৃজনশীল অন্তর্দৃষ্টি এবং কল্পনা দিয়ে কথাসাহিত্যের জগতকে আলোকিত করতে, উর্দু কথাসাহিত্যকে নতুন দিগন্ত থেকে রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। কৃষণচন্দ্র উর্দু ছোটগল্পের এমন একটি নাম যা

ছাড়া উর্দু ছোটগল্পের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কৃষণচন্দ্রকে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ছোটগল্পকার বলা হয়ে থাকে।

উর্দু গদ্য সাহিত্যে কিংবদন্তি ছোটগল্পকার হলেন রাজেন্দ্র সিং বেদি। তিনি তার সামাজিক জীবন থেকে কথাসাহিত্য রচনার জন্য তার উপাদান পেয়েছেন এবং সততা ও আন্তরিকতার সাথে সামাজিক চিত্র উপস্থাপন করেন। তিনি তার চারপাশের পরিবেশ থেকে আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ ঘটনাগুলো তার সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। নিষ্ঠুরতা, নৈতিক মূল্যবোধ লঙ্ঘন, অসততা এবং লালসা, বিনয়ী ও দরিদ্রের সরল জীবন, বহু ঘরোয়া সমস্যা, সামাজিক জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও শর্তসমূহ, যৌনতা ইত্যাদি তার গদ্য সাহিত্যের মূল উপজীব্য বিষয়।

উপরোল্লিখিত অমুসলিম ছোটগল্পকার ছাড়া উর্দু গদ্যসাহিত্যে ছোটগল্প লিখে যারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন তারা হলেন- উপেন্দ্র নাথ অশোক, পণ্ডিত বদরী নাথ সুদর্শন, গোপাল মিত্তল, দেবীন্দর সত্যরথী, প্রেমনাথ পরদেশী, হানস রাজ রাহবার, ধরম বীর, ভারত চাঁদ খান্না, প্রেমনাথ দর, শামশীর সিং নিরোলা,জমনা দাস আখতার, মহেন্দ্র নাথ, হিম্মত রায় শর্মা, আর্নিস্ট ডি ডী ন, হিরানন্দ সুজ, প্রকাশ পণ্ডিত, বিজয় সুমন সুসান, বিলরাজ বার্মা, সোমনাথ যাতশী, সরলা দেবী, ওম প্রকাশ লাগর, মানিক টালা, ওম কৃষণ রাহাত, বাশিশর প্রদীপ, করম চাঁদ ধীমান, হরচরণ চাওলা, নরেশ কুমার শাদ, খীম রাজ সাগর গুপ্ত, গরদিয়াল সিং আরিফ, বংশী নারদোশ, দেবেন্দ্র ইসসার, বলরাজ কোমল, রাজ কানুয়াল, অমর সিং, কনুর সেন, কিশোরী মনচিন্দা, বলদিব শান্ত, সুরেন্দর প্রকাশ, প্রম প্রকাশ কাহনবী, সাবিত্রী গোস্বামী, নরেন্দ্রনাথ সুজ, কৃষণ বেতাব , ইয়াশ সুরুজ, বেদ রাহী ,আমিশ কোল ,বলরাজ মিনরা, ব্রজ কোতিয়াল, কুমার পাশী, ড. ব্রজ প্রেমী, সতীশ বত্রা, সরদার সরণ সিং, কেদারনাথ শর্মা, বীরেন্দ্র পাটোয়ারী, বিজয় সুরী, মদন মোহন শর্মা, গীরধারী লাল খেয়াল, দিপক কানুল, রাজেন্দ্র বার্মা, উপি শাকির, হারবাঁস গঙ্গোত্রা, বিলরাজ বখশ, দিপক বাদকি, জসবন্ত মানহাস, ইন্দিরা শবনম, দেশ চিত্রাকর প্রমুখ।

উর্দু সাহিত্যে অমুসলিম কবি সাহিত্যিকদের অবদান ছিল অতুলনীয়। তারা তাদের লেখনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন এবং তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরেন। তারা গ্রামীণ ও নগর জীবন উভয় থেকে তাদের বিষয় নির্বাচন করেন এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের বিচরণ রয়েছে। তাদের লেখনীর মাধ্যমে তারা যেমন গ্রামের চিত্র চিত্রিত করেন, তেমনিভাবে নগরজীবনের চাকচিক্যও তুলে ধরেন। তারা সমাজের প্রতিটি দিক সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মভাবে দেখেন। সমাজের অনেক দিক রয়েছে যেগুলো তারা তাদের গদ্য ও কাব্য সাহিত্যে অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।